আচার্য্য-বাণী

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও পত্র-সংগ্রহ)

প্রথম খণ্ড

শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়, বি. এ.
লিখিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী সম্বলিত

—: প্রাপ্তিস্থান :—
বেঙ্গল পাবলিশিং কোম্পানী
৮/২ ভবানী দত্ত লেন
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭

: প্রকাশক :

শ্রীঅমলচন্দ্র ঘোষ

নিউ ব্যারাকপুর, মেন রোড (ইষ্ট)

পোঃ নিউ ব্যারাকপুর

২৪ পরগণা।

প্রিণ্টার—শ্রীভোলানাথ হাজরা

রূপবাণী প্রেস

৩১, বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রাতঃস্মরণীয়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে

হে দেব !

যাহাদের হিত সাধনের জন্য আপনি আপনার সর্ব্বস্ব নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন, আপনার সমগ্র জীবন যাহাদের ঐকান্তিক মঙ্গল চিন্তায় সমাহিত ছিল, যাহাদিগের কল্যাণ কামনায় দধীচির ন্যায় আত্মবিসর্জ্জনে আপনি পরাঙ্মুখ হন নাই,

আপনার সেই অতি প্রিয়, অতি আপনার

বঙ্গের যুবকগণকে

আপনারই লেখা

এই "প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও পত্র-সংগ্রহ"

তাদেরই সমৃদ্ধি-সাধনে

সানন্দে উৎসর্গ করিলাম

বিনীত—**প্রকাশক**

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

বাঙলার ছাত্র, বাঙলার শিক্ষক, বাঙলার চাষী, বাঙলার শিল্পী, বাঙলার স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলের হৃদয় জুড়িয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র গত অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া। দেশকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া দেশের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিতে হয়, কেমন করিয়া জাতির মস্তক হইতে কলঙ্কভার নামাইয়া তাহার নত মস্তক আবার উন্নত করিয়া দিতে হয়, এসবই ছিল তাঁহার দিনের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন। দেশের কল্যাণে তিনি দিয়াছিলেন নিজেকে বিলাইয়া তিল তিল করিয়া—তাঁহার ভোগবিলাস ছিল না, নিজেকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব দেশবাসীর সেবায় আহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার দেবোপম চরিত্র, বিলাসহীন, অনাড়ম্বর সরল জীবন, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, অতুলনীয় ছাত্র প্রীতি অক্লান্ত জনসেবার আদর্শ জগতে বিরল। অলস কর্ম্মবিমুখ উদ্যমহীন বাঙলার যুবককে জাতীয়তার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কোন্ পথে কিরূপে অগ্রসর হইলে জাতি তাহার শ্রেয়োলাভে সক্ষম হইবে তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ নানা বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল লেখার ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া যে আদর্শ, যে ইঙ্গিত, যে পথ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না—ভুলিলে আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে। এই আত্মহত্যার সঙ্কট যাহাতে জাতির জীবনে ঘনীভূত না হয়, সে উদ্দেশ্যে আচার্য্যদেবের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, বক্তৃতা, ও পত্র, **যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই**, বহু শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া জাতির কল্যাণকামনায় তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে আমরা প্রকাশ করিলাম। জাতি যে দিন আচার্য্যদেব বা তাঁহার বাণী বিস্মৃত হইবে, সে দিনের দুর্দ্দশার চিত্র কল্পনা করিতেও ভয় হয়। আচার্য্যদেবের বাণী ঘরে ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবে এই আশায় আমরা **আচার্য্য-বাণী** প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি।

এই সকল লেখা সংগ্রহে ও সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার 'আচার্য-জীবনী' হইতে সঙ্কলিত আচার্য্যদেবের

একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সংযোজিত হইল। ইহাতে আচার্য্যদেবের জীবনের স্থূল পরিচয় সকলে পাইবেন।

রঘুনাথ দত্ত-এণ্ড সন্স লিঃ-এর শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে কিছু কাগজ পাওয়ায় এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। এইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
১৬ই জুন, ১৯৫৫

বিনীত—প্রকাশক

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

এই সংসারে প্রতিনিয়ত কত লোকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে, কিন্তু প্রায়ই কেহ 'সময়-সাগর তীরে স্বীয় 'পদাঙ্ক' অঙ্কিত করিয়া বরণীয়' হইতে পারে না। জলবুদ্বুদের পরিধির ন্যায় তাহাদের স্বল্প পরিসর জীবন অচিরে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। তবে আশার কথা এই যে, এই জন-সমুদ্রে স্থিরলক্ষ্য, জ্ঞানতপস্বী মহামানবের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হয়, ফলে মানবের রুদ্ধদৃষ্টি হয় সম্প্রসারিত, প্রাণে জাগে নূতন স্পন্দন, গতি হয় দুর্ব্বার। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এইরূপ এক মহামানব—যাঁহার আদর্শে, শিক্ষায় ও অনুপ্রেরণায় বাঙালী তাহার নষ্টসম্বিৎ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া চরিত্রে, সাধনায়, উদ্যমে ছুটিয়া চলিয়াছে বিশ্বের দরবারে স্থান গ্রহণ মানসে।

"জ্ঞানে এবং কর্ম্মে, প্রফুল্লচন্দ্র ছি:লেন খুব বড়। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশ-বিদেশে। বহু মৌলিক গবেষণা এবং হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস রচনা হ'চ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দান। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসা়ন বিভাগে তিনি ছিলেন সর্ব্বোচ্চ পদে আসীন। অধ্যাপনায় তাঁর যশঃ ছিল অতুলনীয়। তিনি যে জ্ঞানী ও কর্ম্মী রাসায়নিকদলের গঠন ও নিখিল ভারত রাসায়নিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার ফলে আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞান-সমাজে ভারতবাসীর সম্মান গেছে বেড়ে। বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ বলা হয় প্রয়োগ-প্রধান শাস্ত্র; কারণ শুধু জ্ঞানে নয়, ঐ জ্ঞানের ব্যবহারে বা প্রয়োগেই হচ্ছে বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে শুধু ধ্যান-ধারণায় আবদ্ধ করে রাখলে, মানুষের বহুবিধ কল্যাণের পথ যেত রুদ্ধ হয়ে। বিজ্ঞানীরা তাই জ্ঞানকে পরিণত করেন কর্ম্মে। এ না হ'লে বিজ্ঞানের অসাধারণ শক্তি বা প্রতিপত্তি যেত লোপ হয়ে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাই তাঁর জ্ঞানকে বিনিময় করেছিলেন ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন কর্ম্মে। তার ফলে গড়ে উঠেছে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল' নামে তাঁর সুবিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা। দেশের কল্যাণ ও গরীবের তরফ হতে আচার্য্য রায়ের এই কর্ম্মানুষ্ঠানের তুলনা নাই। এ ছাড়া, বাঙলার বহুবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন উদ্যোগী নেতা বা উৎসাহদাতা।

"জ্ঞানে ও কর্ম্মে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বড় ছিলেন না ; বড় হলেও তিনি আরো কিছু বেশি। তিনি ছিলেন মহৎ। সে মহত্ব ছিল তাঁর আত্মত্যাগে বা আত্মদানে। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ও অকৃপণ ভাবে দান করেছিলেন দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য, এতেই ছিল তাঁর মহত্বের মহামন্ত্র।" এই মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির জীবনকথা জাতির জীবন-সমস্যায় এক মৃত-সঞ্জীবনী ভেষজ।

কপোতাক্ষতীরে রাড়ুলি গ্রাম প্রফুল্লচন্দ্রের বাসস্থান। এই কপোতাক্ষতীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কবি সম্রাট মাইকেল মধুসূদন 'দুগ্ধস্রোতোরূপী' কপোতাক্ষকে চির অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। সাগরদাঁড়ি হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে রাড়ুলি গ্রাম অবস্থিত। প্রফুল্লচন্দ্র হইতে ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ রামপ্রসাদ রায় ; ইনি মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সরকারে কর্ম্ম করিতেন। সিরাজের পরাভবের পর ইনি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাড়ুলি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া বোধ হয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বাঙলা দেশের তামসযুগ বা 'Dark Age' বলা যাইতে পারে। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আরবী ও সংস্কৃত ভাষাও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। উচ্চ ইংরাজী জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী ও সুবিখ্যাত অধ্যাপক ক্যাপটেন রিচার্ডসন সাহেবের নিকট বহুদিন অধ্যয়ন করেন। শিক্ষার ফলে তাঁহার রুচি মার্জ্জিত হইয়াছিল ; তিনি পল্লীবাসীর সকল কুসংস্কার দূরে পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করিতেন, জাতিভেদ মানিতেন না, ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে অগ্রণী ছিলেন এবং স্ত্রী শিক্ষা-বিস্তারে সাধ্যমত যত্ন লইতেন। দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথম স্বীয় বাসভবনে একটি আদর্শ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন ; এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বীয় পত্নী ও ভগিনীকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক বৎসর সপরিবারে কলিকাতায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে ব্যয়বাহুল্য হওয়ায় তিনি ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাঁহার কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বিশেষ বিপন্ন করিয়া ফেলে। ফলে তাঁহার অনেক সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া যায়। হরিশ্চন্দ্র সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক

ছিলেন। সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠার অনেক কাহিনী দেশে ছড়াইয়া আছে।

কলিকাতা সমাজেও হরিশ্চন্দ্রের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি British Indian Association নামক জমিদার সভার সভ্য ছিলেন, এবং অনেক প্রধান ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, শিশিরকুমার ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি অনেক প্রধান ব্যক্তির নাম করা যায়।

১৩০২ সালের (ইং ১৮৯৫) ২৭শে বৈশাখ তারিখে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও গোপাল নামক পাঁচ ও ইন্দুমতী নাম্নী একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ গোপাল অল্প বয়সেই মারা যান।

১২৬৮ সালের ১৮ই শ্রাবণ তারিখে (ইং ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট) প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়।

হরিশ্চন্দ্র ভাড়াসিমলা গ্রামে নবকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কন্যা ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন। ভুবনমোহিনী যেমন অসামান্য রূপবতী, সেইরূপ অসামান্য গুণবতীও ছিলেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতি ও কোমল হৃদয় নিতান্ত পরকে আপন করিয়া লইত। উত্তরকালে প্রফুল্লচন্দ্র যে পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার দীক্ষা বাল্যকালেই তাঁহার মাতাপিতার নিকটেই হইয়াছিল। ১৩১১ সালে ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয়।

বাল্যকাল ও শিক্ষা

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লচন্দ্রের 'হাতে খড়ি' হয়। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া নলিনীকান্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই মধ্য ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করেন এবং জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র উক্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিবেন ইহাই হরিশ্চন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। কোন অভিভাবকের অধীনে কলিকাতায় রাখিয়া তাহাদিগের পড়ার বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বয়ং পুত্র ও পরিজনবর্গকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হরিশ্চন্দ্র নিজের পুত্রগণের পাঠের তত্ত্বাবধান করিতেন, অন্য কোন গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হইত না।

কলিকাতায় আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু স্কুলে এবং নলিনীকান্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে (বর্ত্তমান ৩য় মান) ভর্ত্তি হইয়া তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যানসেলার মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। উত্তর-কালে প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যয়ন ও আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ সংযত ও মিতাচারী হইয়াছিলেন এই সময়ে তিনি তদ্রূপ ছিলেন না। পাঠে অত্যাসক্তি নিবন্ধন প্রায় দিবারাত্র পুস্তক লইয়া থাকিতেন। সন্ধ্যারাত্রিতে নয়টার বেশি পড়িতেন না বটে, কিন্তু শেষ রাত্রিতে তিনটার সময় উঠিয়া পুস্তক পাঠ করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিলে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। একদিন উঠিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রদীপে তেল নাই এবং ঘরেও কোনরূপে তেল পাইবার উপায় নাই; তখন অনন্যোপায় হইয়া ফুলেল তেল প্রদীপে ঢালিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আহার সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ সংযম ছিল না। যাহা পাইতেন, নিজের খেয়ালে তাহাই আহার করিতেন। আহার সময়েরও কোনরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না, যতবার খুসী আহার করিতেন। শরীরের প্রতি এইরূপ অনিয়মিত অত্যাচারের ফলে বালক প্রফুল্লচন্দ্র শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়েন এবং দুরন্ত আমাশয়ের পীড়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি এইরূপে প্রায় দুই বৎসর ভুগিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহাকে বাটীতে বসিয়া থাকিতে হয়।

আহার ও অধ্যয়ন-রীতি সম্বন্ধে এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। পাঠ ও ভোজন বিষয়ে যে সংযম তাঁহার মহৎ চরিত্রের অংশ স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে সাধারণের আদর্শ-স্থানীয় করিয়াছে, তাহার বীজ এই সময়ে উপ্ত হইয়াছিল। যাহাকে বলে 'ঠেকিয়া শেখা' তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। আহারে অসংযত বালক রোগে পড়িয়াই একেবারেই সংযমী হইয়া উঠিলেন! অধ্যয়ন প্রণালী সম্বন্ধেও এই সময়ে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে। অসুখে পড়ার পর হইতে তিনি কদাচ শেষ রাত্রে পড়িতেন না, এবং রোগমুক্তির পর ইঁহাকে রাত্রি নয়টার পর পড়াশুনা করিতে কখনও দেখা যায় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা, রাসায়নিক গবেষণা ও লোকহিতসাধন এত বেশী যে, তাহাতে পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছে। রুগ্নদেহে এই অদ্ভুত সাফল্য-লাভের একমাত্র কারণ আত্মহারা হইয়া কার্য্যসম্পাদনের চেষ্টা। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জীবনের কৃতকার্য্যতার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"He believes in doing one thing at a time and doing that well"—একসময়ে একটিমাত্র

কাজে হাত দিবে এবং তাহাই সুসম্পন্ন করিবে—এই একনিষ্ঠাই তাঁহার জীবনের সফলতার কারণ।

প্রফুল্লচন্দ্র দ্বাদর্শ বর্ষ বয়সে পীড়িত হন এবং স্কুলের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক বিরহিত হইয়া প্রায় দুই বৎসর বাটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রফুল্ল-চন্দ্রের পিতার সুবৃহৎ লাইব্রেরীর কতকাংশ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। স্কুলের পড়ার কোন চাপ না থাকায় প্রফুল্লচন্দ্র গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই সকল পুস্তকপাঠে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রিয় ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চা ভিন্ন তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পাশ্চাত্য ভাষা-জ্ঞান উত্তরকালে তাঁহার বিলাতে শিক্ষা-লাভের পথ সুগম করিয়া দেয়।

রোগমুক্ত হইয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় এলবার্ট স্কুলে (Albert School) প্রবেশ করেন। তখন এই বিদ্যালয়ের সুনাম বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া গণিত হইত। সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী সেন তখন এই স্কুলের অধিনায়ক (Rector) ছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার ন্যায় ইংরাজী ভাষার শিক্ষক তখনকার দিনে বাস্তবিকই দুর্লভ ছিল। শুধু তখনকার দিনে কেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে সমস্ত বাঙালী শিক্ষক ইংরাজী ভাষার অধ্যাপনায় কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণবিহারী তাঁহাদিগের অন্যতম। এই বিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম শিক্ষকগণের সাহচর্য্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠেন; কালক্রমে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় এই শ্রদ্ধা হইতে আকর্ষণ জন্মে, এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন। এলবার্ট স্কুল হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন।

দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ তৎকালে মেট্রোপলিটান কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার নিকট পড়িতে পারার প্রলোভনেই প্রফুল্লচন্দ্র এই কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজে পড়িবার সময় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক স্যার জন এলিয়ট ও স্যার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লারের নিকট যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞান (Physics) ও রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) অধ্যয়ন করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, তিনি পুত্রগণকে বিলাত পাঠাইয়া তথায় সকলকে উচ্চশিক্ষা দিবেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার আর্থিক অবস্থা ক্ষীণ হইতে থাকায়, তিনি স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়েন। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার মনোভাব অনেকটা অবগত ছিলেন, তাই ধীরে ধীরে গিলক্রাইষ্ট (Gilchrist) বৃত্তি-পরীক্ষার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই প্রফুল্লচন্দ্র বিলাতযাত্রা করেন। বিলাতে গিয়া তিনি যখন বুঝিলেন, ভারতের মুক্তি ইংরাজী ভাষা বা ইতিহাসের ভিতর দিয়া আসিবে না, বিজ্ঞানশিক্ষার দ্বারাই তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে, তখনই তিনি তাঁহার প্রিয় সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চা ছাড়িয়া বিজ্ঞানশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক পি. জি. টেইট্ ও এস. সি. ব্রাউন সাহেবের নিকট পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের শিক্ষাগুণে প্রফুল্লচন্দ্র অতি শীঘ্রই বিজ্ঞানানুরক্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন।

কলেজের নির্দ্দিষ্টকালের পর তিনি খুব অল্প সময়ই পাঠে ব্যয় করিতেন। কিন্তু যেটুকু সময় পাঠে নিয়োগ করিতেন, তাহা গভীর মনোযোগের সহিতই করিতেন। নিয়মিত অধ্যয়নের ফলে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি. এস সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি 'Hope Prize' নামক সম্মানজনক পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। ঐ পুরস্কারের মূল্য পঞ্চাশ পাউণ্ড, অর্থাৎ তখনকার দিনে প্রায় সাতশত টাকা ছিল। ঐ বৃত্তিলব্ধ অর্থে তিনি আরও ছয় মাস কাল এডিনবরায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আরব্ধ রাসায়নিক গবেষণা শেষ করিতে পারিয়াছিলেন।

এই সময়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইবার আশায় তিনি 'India before and after the Mutiny' নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে বৃটিশ রাজনীতির অনেক ত্রুটির তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রবন্ধ হয়ত বা এই দোষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় তিনি পুরস্কার পান নাই বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ইহা অনেক

বিখ্যাত রাজনীতিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনেক সাময়িক পত্রে ইহার প্রশংসা করা হয়। এই পুস্তক ক্ষুদ্র হইলেও, ভারত সম্বন্ধে এত তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা অন্যত্র পাওয়া দুর্ঘট।

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং সামান্য বেতনে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পরবর্তী জুন মাস হইতে সহকারী অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। প্রফুল্লচন্দ্রের পুর্ব্বে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেহ ডি. এস-সি. পাশ করিয়া ভারতে আসিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হন নাই, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি এরূপ অবিচার করিবার কি কারণ জানা যায় নাই। অন্যত্র কর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার গবেষণার সুবিধা হইবে না মনে করিবাই তিনি হীনতার মধ্যেও এই পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ঈপ্সিত জ্ঞানানুশীলনের পথ এইরূপে বিঘ্নময় হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানপিপাসু চিত্ত সহজেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, এবং পরাধীনতার যে জ্বালা তিনি তখন অনুভব করিযাছিলেন তাহারই ফলে তিনি চাকরির প্রতি চিরজীবন ঘৃণা পোষণ করিতেন। এই সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পরিবাবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। জগদীশচন্দ্রকেও চাকরীর গ্লানি সহ্য করিতে হইযাছিল। বসুপত্নীর নিকট তিনি অম্বুজোচিত স্নেহ লাভ করিতেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের আজীবন সাধনাব ফল—তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস সঙ্কলন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাগারেই সম্ভাবিত হইয়াছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া ছাত্রগণের মনে বিজ্ঞানচর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করাই হইল তাঁহার প্রধান কাজ। সুকুমারমতি ছাত্রগণের মন অধিকার করিবার জন্য তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। প্রীতিকর রাসায়নিক তত্ত্বসকল উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাদিগের মনে রসায়ন-চর্চ্চার জন্য প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টা করিতেন। ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চ্চায় কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং ভারতের অবস্থা কত হীন তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেন। ভারতীয়েরা চেষ্টা করিলে যে ইউরোপের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে এরূপ ধারণা তাহাদের মনে জাগাইয়া তুলিতেন।

এই সময়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হইলেও হাতে কলমে কোন কাজ করিতে হইত না। কোন রকমে মুখস্থ করিয়াই পাশ করা যাইত। এদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগারও এরূপ উন্নত ছিল না যাহাতে তাঁহার নিজের

গবেষণা চলিতে পারে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেবরেটারীতে কাজ করিয়া আসিয়া কলিকাতার এই সামান্য যন্ত্রাগারে স্বাধীন গবেষণার কার্য্য চালান একরূপ অসম্ভব ছিল। কত ধৈর্য্যের সহিত যে তাঁহাকে এই সময়ে সত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বহু অপেক্ষা করিয়াও গবেষণার পথে কাহাকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কয়েকটি গবেষণাবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু এই বৃত্তি লইয়াও অনেকে এম. এ. পাশ করিয়া, সরকারী চাকরীতে বা ওকালতীর পথে প্রবেশ করিত, ইহাতে তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইতেন। বহু প্রতীক্ষা ও সাধনার পর ১৯১০ সাল হইতে তাঁহার বাসনা চরিতার্থতার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে যতীন্দ্রনাথ সেন, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, বিমানবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেঘনাথ সাহা প্রভৃতি কৃতি ছাত্র আসিয়া তাঁহার পদতলে সমবেত হইলেন। তাঁহাদিগের মৌলিক প্রবন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রের স্তম্ভ পূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙালী মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার সাক্ষ্য জগতে প্রচারিত হইল—প্রফুল্লচন্দ্র আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিলেন। হিন্দু রসায়নী বিদ্যার ইতিহাস সঙ্কলনকালে বাঙালীর জড়ত্ব সম্বন্ধে যে হতাশভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় আশার সঙ্গীত গাহিতে হইল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে কার্য্যারম্ভ করিবার পর, প্রফুল্লচন্দ্র পিতৃঋণের জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। নিজ অসাধারণ মিতব্যয়িতার ফলে তিনি তিন বৎসরে প্রায় ৪০০০৲ টাকা পিতৃঋণ পরিশোধ করেন, এবং কলিকাতায় নিজ খরচা বাদে ৮০০৲ শত টাকা বাঁচাইয়া তাহা দ্বারা ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পত্তন করেন। এই সময়ে ইনি ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে থাকিতেন। এইস্থানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্ম হয়। মাণিকতলায় কারখানা স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বাড়ীতেই আফিস ও কারখানা উভয়ই ছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য অনেক জিনিষের পরীক্ষা এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগারেই হইত।

১৮৯৫ সাল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রধান স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর তাঁহার গবেষণার ফলস্বরূপ Mercurous Nitrite আবিষ্কৃত হয়। ইহাই সর্ব্বপ্রধান

ও সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার। এই বৎসরই গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি (Sulphuric Acid Plant) সংস্থাপিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কশের কার্য্যারম্ভ হয়। আবার এই বৎসরেই তাঁহার স্নেহময় পিতার মৃত্যু হইল। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী হাসিকান্না, সুখদুঃখ, হর্ষ ও বিষাদের সংঘাতে তাঁহার প্রকৃতি এক অনির্ব্বচনীয়ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হিন্দু রসায়নীবিদ্যার ইতিহাসের প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতে রসায়নীবিদ্যার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই তিনি শ্রমসাধ্য এই ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক বিভাগের উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ইউরোপের প্রধান প্রধান যন্ত্রাগার পরিদর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর প্রধান প্রধান যন্ত্রাগার দেখিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাহার ফলে ১৯১২ সাল হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে রাসায়নিক যন্ত্রাগারের প্রসার ও বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ইউরোপ প্রবাসকালে প্রফুল্লচন্দ্র যখন যেখানে গিয়াছিলেন, তথায় বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি এখন হিন্দু-রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা বলিয়াও সর্ব্বত্র সম্মানিত। তাঁহার আদর্শ চরিত্র ইয়োরোপীয়গণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না, তাই ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহু অনুষ্ঠানে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের কার্য্যকালে মিঃ পেডলার (পরে স্যার), মিঃ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, মিঃ ষ্টেপলটন ও মিঃ কানিংহাম রসায়ন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১০ সালে কানিংহামের মৃত্যুর পর প্রফুল্লচন্দ্রের উপর প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের ভার দেওয়া হয়, এবং অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তিনি প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিতেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে চারিজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তন্মধ্যে পরলোকগত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রধান। এই সম্মেলনে তাঁহারা বিশেষ যোগতার সহিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ছাত্রগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ সর্ব্বাধিকারীকে এল এল.-ডি. এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি. এস-সি. ডিগ্রী প্রদান করেন। এই বৎসর গভর্ণমেণ্টও প্রফুল্লচন্দ্রকে সি. আই. ই. উপাধি প্রদান ক রয়াছিলেন।

এই সময়ে স্যার টি. পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় স্যার আশুতোষের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের সূচনা হয়। প্রফুল্লচন্দ্র বিলাতে থাকিতেই আশুতোষ তাঁহাকে পত্রদ্বারা এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁহাকে বিজ্ঞান কলেজের ভার লইবার জন্য আহ্বান করেন। ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের নবনির্ম্মিত ভবনের কাজ আরম্ভ হয়। বাঙলা সরকারের অনুমতি লইয়া ১৯১৬ সালে প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। ১৯১৮ সালে তিনি সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ভারতীয় রাসায়নিক গবেষকগণকে লইয়া তিনি এক সঙ্ঘ গড়িয়াছিলেন; যাহার ফলে বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মরত গবেষকগণ পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গবেষণার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ভারতীয় রাসায়নিক গণের লিখিত প্রবন্ধের পরিমাণ এত বাড়িয়া চলে যে, ভারতের প্রেরিত প্রবন্ধ অনেক সময় ইউরোপ বা আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কাগজে স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না। ইহাতে গবেষকগণের অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি 'ভারতীয় রসায়ন সমিতি' গড়িয়া গিয়াছেন, যাহার ফল হইবে সুদূরপ্রসারী। ভারতীয় রাসায়নিকগণ এক্ষণে স্বপ্রধানভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ নিজ গবেষণা চালাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকেই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া মনে করিতেন।

'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরানাং পুণ্যলক্ষণম্।' প্রফুল্লচন্দ্রের পুত্র ছিল না। তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন—তাহাদের দুঃখে তিনি দুঃখিত, সুখে সুখী এবং গৌরবে গৌরব বোধ করিতেন। ছাত্র-গঠন কার্য্যে তিনি নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রণালী, ন্যায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সময়ানুবর্ত্তন, তাঁহার ছাত্রগণের সম্মুখে মানবজীবনের মহত্তর আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান

দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। বস্তু-জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহান্বিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।"

"উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক—তিনি বললেন আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্ম বিসর্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবী শক্তি। আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজেই স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।"

১৮৯২ সালে সামান্য মূলধনে বেঙ্গল কেমিক্যালের পত্তন হয়। দশ বৎসর চলার পর ১৯০২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধনে ইহাকে লিমিটেড্ কোম্পানিতে পরিণত করা হয়। অনেকবার মূলধন বৃদ্ধির পর বর্তমানে ইহার মূলধন দাঁড়াইয়াছে বাইশ লক্ষ টাকায়। এই কোম্পানির অধিকাংশ কর্ম্মী বাঙ্গালী। কর্ম্মীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এতদ্ব্যতীত কাঁচা ও তৈরী মালের কারবারে ৭।৮ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। সুতরাং বেঙ্গল কেমিক্যালের আয় হইতে এই দশহাজার লোকের পরিবারের প্রায় এক লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইয়াছে। যিনি নিজেকে সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন তাঁহারই অনুকম্পায় আজ এই লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার বেতন ও বোনাসে বৎসরে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা আয় করেন।

বিজ্ঞান প্রয়োগপ্রধান শাস্ত্র। বিজ্ঞানের শিক্ষা কার্য্যে পরিণত না করিয়া মাত্র অধ্যাপনায় ইহার কোন সার্থকতা নাই। প্রফুল্লচন্দ্র ইহা অনুভব করিয়াই অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে রসায়নের প্রয়োগশালা বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়িয়া

তুলিবার চেষ্টা করেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ভিন্ন অন্য বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি পরিচালক, উৎসাহদাতা বা পরামর্শদাতারূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯২১ সালে খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রফুল্লচন্দ্র জানিতে পারিয়া দুর্গতদিগের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। সরকারী কর্ম্মচারীরা দুর্ভিক্ষ স্বীকার করিতে চাহেন নাই, একারণ তাঁহাদিগের সহিত প্রফুল্লচন্দ্রকে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহারই চেষ্টা ফলবতী হইল। দেশের লোক তাঁহার আহ্বানে অপ্রত্যাশিতভাবে সাড়া দিল। সাধারণের অর্থানুকুল্যে তিনি স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্যে দুর্ভিক্ষের ক্লেশ নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই খুলনা দুর্ভিক্ষেই কুটীর শিল্প হিসাবে চরকা ও খদ্দর প্রচলনের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হন। ইহার পর আসিল ১৯২৩ সালের উত্তরবঙ্গের বন্যা। এই বন্যায় প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মতৎপরতা ও সংগঠন ক্ষমতা দেখিয়া দেশবাসী স্তম্ভিত হইয়াছিল। দুর্গতদের দুঃখনিবারণে তাঁহার আহ্বানকে লোকে দেবতার আহ্বান বলিয়া মনে করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাপ্রকারের সাহায্য তিনি পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার 'সঙ্কটত্রাণ সমিতি' স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্ভিক্ষে ও প্লাবনে দুঃস্থদিগের সাহায্যে তাঁহার তৎপরতা ও ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে 'Doctor of Floods' বলিতেন। উত্তরবঙ্গ প্লাবনের প্রাথমিক অবস্থা দূরীভূত হইলে লোকের দ্বিতীয় আয়ের পন্থা স্বরূপ সেই অঞ্চলে চরকা ও খদ্দর কুটীর শিল্প হিসাবে প্রচলিত করেন। এই চরকা ও খদ্দর প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতময় ভ্রমণ করিয়াছেন এবং লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন।

১৯২১ সালে তাঁহার ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া দিতে চাহেন। কিন্তু ইহাতে বিজ্ঞান কলেজের কাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে মনে করিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। তিনি আরও ১৫ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন; সর্ত্ত ছিল তিনি কোন পারিশ্রমিক নিবেন না, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের টাকা বিজ্ঞানের উন্নতিতে ব্যয় করিবেন। এইরূপে তাঁহার প্রায় একলক্ষ আশি হাজার টাকা তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও দুই দফায় তিনি ছাত্রগণের গবেষণাবৃত্তি স্থাপনের জন্য নিজের সঞ্চয় হইতে কুড়ি হাজার টাকা মোট দুইলক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল হইতেও তিনি কোন পাথেয় গ্রহণ করিতেন না।

শিক্ষাবিস্তারেও তাঁহার দান এবং চেষ্টা অসীম। নিজের গ্রামের স্কুলটির জন্য তিনি কয়েক হাজার টাকা দিয়াছিলেন। বাগেরহাট কলেজ স্থাপনে তাঁহার সাহায্য ও উৎসাহ দেশবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চরকা ও খদ্দর প্রচলন সংস্রবে তাঁহাকে বহুবার ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। এই সব ভ্রমণের ব্যয় নিজেই করিতেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি লাহোর, আলিগড়, এলাহাবাদ, নাগপুর, মাদ্রাজ, বরোদা, হায়দারাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে Extension lecture দিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর বিজ্ঞান পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এখানে অনেকবার যাইতে হইত বলিয়া পাথেয় খরচা নিতেন। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিকাল হইতে তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাঙলা মায়ের প্রতি তাঁহার কি অসীম দরদ ছিল তাহা সামান্য একটি ঘটনা হইতে জানা যায়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহাকে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ভারগ্রহণে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"My dear Malabyaji, poor Bengal cannot afford to spare Prof. Ray"—হতভাগ্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র 'রায়' কে ছাড়িয়া দিতে পারে না।

বাঙালীকে কর্ম্মঠ, নিরলস, দৃঢ়চরিত্র ও ব্যবসায়ে উন্মুখ করিবার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙালী চরিত্রের দুর্ব্বলতা তাঁহার প্রাণে বড়ই বাজিত। দানই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম; তাঁহার কাছে কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি না বলিতে পারিতেন না। বাঙালী কেহ ব্যবসায় করিয়া দুই পয়সা রোজগার করিতেছে শুনিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন। নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। তবুও কেহ ব্যবসা করিবে শুনিলে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইতেন। এইরূপে তাঁহার দশলক্ষের অধিক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। কোন কোন ব্যবসাদারের জন্য ব্যাঙ্কে জামিন হইয়া সমস্ত দেনা নিজে পরিশোধ করিয়াছেন।

নিজ পল্লীকে তিনি অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অবকাশ পাইলেই রাড়ুলি-কাটিপাড়ায় ছুটিতেন। মাইকেলের ন্যায় কপোতাক্ষকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। গ্রামবাসীদিগের জন্য তিনি সকল রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বিশেষ না মিশিলেও দেশের সকল আন্দোলনেরই সহিত যোগ রাখিতেন। মহাত্মাজীর তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না-গ্রহণ না বর্জ্জন'

নীতিকে তিনি পছন্দ করেন নাই। তিনি ইহার বিরুদ্ধে Nationalist Party-তে যোগ দিয়াছিলেন। বাংলা দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে আইনের দ্বারা কণ্টকিত করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং,' তাঁহার ন্যায় সর্ব্বত্যাগী অনাসক্ত লোক বাঙলায় আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহার অনুপম দেবচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন একজন বাস্তবিক 'সাধু'।

১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে যিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মর্ত্তধামে আসিয়াছিলেন, ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে (বাংলা ১৩৫১ সালের ৩রা আষাঢ়) তিনি সকলকে কাঁদাইয়া নিজে হাসিতে হাসিতে অমরধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন—তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়

আচার্য্য-বাণী

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আজ পঞ্চদশ অধিবেশন। এই অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতির পদে বরণ করিয়া সুবিচার কি অবিচার করিয়াছেন, তাহা আপনারাই বলিতে পারেন। আমার কিন্তু মনে হয়, এটা অবিচার করাই হইয়াছে। আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র—আপনাদের সভাপতি স্যার মন্মথনাথ এক সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বোচ্চ আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যখন বাঙলা-সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষদের পাণ্ডা—'সাহিত্যবন্ধু' নলিনীরঞ্জনকে লইয়া আমাকে পাকড়াও করিলেন, তখন স্যার মন্মথনাথের বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কেমন একটা সন্দেহ হয়। বয়স এখন আমার সাতাত্তর, শরীর ভাল নয়, বাৰ্দ্ধক্যজনিত জরা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা,—এই সমস্ত অকাট্য কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও তাঁহাদের কেহ নিরস্ত হইলেন না। মন্মথনাথ নিরস্ত হন তো, নাছোড়-বান্দা নলিনী পণ্ডিত ছাড়েন না। কি করি, অগত্যা আমাকে স্বীকার করিতেই হইল। বিশেষতঃ জীবন-সন্ধ্যায় এতগুলি প্রবাসী ভাই-ভগিনীর একত্র সমাবেশ দেখিবার সৌভাগ্য আর বোধ হয় আমার হইবে না। আমার আরও একটি দুর্ব্বলতা আছে, কেহ ছাত্র পরিচয় দিয়া উপস্থিত হইলে, তাহার অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতে পারি না।

উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজসাহীতে যখন আমাকে সভাপতি করা হয়, তখন আমি বলিয়াছিলাম—"আমি একপ্রকার বন্দীভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত হইয়াছি।"—আজও আমার সেই অবস্থা। তবে তখন আমার বয়স ছিল আটচল্লিশ, আজ সাতাত্তর। পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তি ও সামর্থ্য অনেক কমিয়াছে। সুতরাং গোড়াতেই বলিয়া রাখি—আমার উপর এই গুরুভার চাপাইয়া, আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন তাহা জানি না। তবে আপনাদের সমবেত সাহচর্য্য ও সহায়তা লাভ করিব, এই ভরসায় এ-গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহস পাইয়াছি।

সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-

প্রদান ও পরিচয়ের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য কাশীমবাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কাশীমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অনুষ্ঠান হয়। তারপর এই প্রকার সম্মেলনের উপকারিতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের ও প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সৃষ্টি। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন ও প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন এখনও অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাঙলা-সাহিত্য গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেক উন্নতি করিয়াছে, এই সম্মেলনগুলি সেই উন্নতির সহায়ক। প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষভাবে গবেষণা চলিতেছে এবং পঠন-পাঠন ও আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ডক্টর শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা 'Calcutta Oriental Series' ও 'হৃষীকেশ সিরিজের' প্রবর্ত্তন করিয়া বহু অর্থব্যয়ে গুরু সাহিত্যের (Serious Literature) অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। 'ধনবিজ্ঞানের রূপান্তর', 'পাখীর কথা', 'Pet Birds of Bengal', প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শেষোক্ত সিরিজেরই অন্তর্গত।

জাতীয় সাহিত্যই জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। জাতির মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক—জাতীয় সাহিত্য। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের, জাতির সমাজ বিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা পাই।

যে সময়ে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, হাতেলেখা পুঁথির মধ্যে নানা গ্রন্থ ও প্রবাদ বাক্যাদি বিরাজ করিত, সেই অতীত যুগের নানা বিবরণও আমরা আমাদের সাহিত্যের ভিতরেই দেখিতে পাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর লেখা রামাই পণ্ডিতের রচিত 'শিবের গান'-এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, বাঙলার চিরন্তন অন্নবস্ত্র-সমস্যার সমাধানের কি সুন্দর উপদেশ রহিয়াছে :—

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি (১) চষ চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরী কাঁদাএ (২) লইব ভূম খানি।
আরসা (৩) হইলে যেন ছিচএ (৪) দিব পানী॥
আর সব কিষাণ কাঁদিব মাথে হাত দিয়া।
পরম ইচ্ছায় ধান্য আনিব দাই আ (৫)॥

ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা (৬) বাঘের ছড় (৭)॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী নগরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হ্যাল্‌হেড সাহেব-লিখিত একখানি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফষ্টার সাহেব ইংরাজী-বাঙলা অভিধান প্রকাশ করেন। ইহার প্রকাশক ফেরিস এণ্ড কোং। তাহার পর শ্রীরামপুরে কেরি, মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতির চেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল, এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত পাঁচখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়:—

১। কেরী সাহেবের অভিধান
২। হিতোপদেশ
৩। বত্রিশ সিংহাসন
৪। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র
৫। কাশীদাসী মহাভারত।

এই সমস্ত মহানুভব খৃষ্টান মিশনরিদিগের চেষ্টা ও যত্নে নানাবিধ গ্রন্থ শ্রীরামপুর যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণে প্রকাশিত হইল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদেরই দ্বারা 'দিগ্‌-দর্শন' এবং 'সমাচার-দর্পণ' বাহির হয়। প্রথমখানি মাসিক পত্র ও দ্বিতীয়খানি দৈনিক সংবাদ পত্র। তারপর তাঁহাদের চেষ্টায় বহু বাংলা-গ্রন্থ শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ (কোন কোন মতে ১৮২৪) হইতে বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি বাঙলায় প্রথম প্রকাশিত হইতে থাকে। ইয়েটস্ (Yates) সাহেবের পদার্থ বিদ্যা-সারের ১ম সংস্করণ ১৮২৫ (১৮২৪) খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে W. Pearce নামক একজন ইংরাজ, J. Lawson-রচিত প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক একখানি ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র মিত্র (ইনি হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন, পরে ঐ কলেজের অধ্যাপক হন) বাঙলায় 'পশ্বাবলী' নাম দিয়া খণ্ডে খণ্ডে পশুদিগের

১। তুহ্মি—তুমি। ২। পুখরী কাঁদাএ—পুকুরের পাড়ে। ৩। আরসা—তুষ। ৪। ছিচএ—ছেঁচিয়া। ৫। দাইআ—কাটিয়া। ৬। কেওদা—কেন্দুয়া বা কেঁউদা—ব্যাঘ্র-বিশেষ। ৭। ছড়—চর্ম্ম।

বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯।৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার অনেক গুলি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিত্র মহাশয় 'পক্ষীর বিবরণ' নামক পক্ষিতত্ত্ববিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য। আশা করি, সুবিখ্যাত বিহঙ্গমতত্ত্ববিদ্ ডক্টর শ্রীমান্ সত্যচরণ লাহা এই গ্রন্থখানি তাঁহার 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। পরবর্ত্তী কালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" (১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদিত "রহস্য-সন্দর্ভে" পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রাণিতত্ত্ব ও পক্ষিতত্ত্ব বিষয়ক এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি দেখিবার যোগ্য।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজারের মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইংরাজী ও বাঙলা এই উভয় ভাষায় 'Introduction to the Arts and Sciences' নামক ১২২ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা ইংরাজীর অনুবাদ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে Chemistry বা 'কিমিয়া বিদ্যাসার' প্রকাশিত হয়। ইহার গ্রন্থকার J. Mac. পুস্তকখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এবং ইংরাজী ও বাঙলায় লিখিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে "বস্তুবিচার" (Natural Theology Illustrated) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর ডাক্তার কানাইলাল দে প্রণীত 'পদার্থ-বিজ্ঞান' নামে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক এবং রসায়ন-বিজ্ঞান' নামক রসায়ন সম্বন্ধীয় একখানি সুবৃহৎ পুস্তক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে শেষোক্ত এই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দেই এচ. ই. রস্কো প্রণীত 'রসায়ন-সূত্র' (A Primer of Chemistry) প্রকাশিত হয়। আরও কতকগুলি বিজ্ঞান-সম্পর্কিত পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম এবং তাহাদের প্রকাশকালের পরিচয় পরিশিষ্টে প্রদান করিলাম।

বিজ্ঞানের মুখপত্র ইংরাজী Nature পত্রিকার বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রতি সপ্তাহে কত নব নব বিষয়ে কত সুন্দর সুন্দর পুস্তক বাহির হইতেছে! বাঙলায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার কোন পুস্তক বাহির হয় না বলিলেই চলে।

মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সুকুমারমতি বালকগণের জন্য লিখিত আমার 'প্রাণি-বিজ্ঞান' ও ১৯০৬ সালে লিখিত 'নব্য রসায়নী-বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' পুস্তক দুইখানি লিখিতে গিয়া আমি এই অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি। এই অসুবিধা

লক্ষ্য করিয়া শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহচর্য্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি রসায়নের পরিভাষা-প্রণয়নে ব্রতী হই। তৎপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে পরিভাষা সঙ্কলনে বিভিন্ন বিভাগের সুধিবৃন্দ আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই।

পরিভাষা সঙ্কলনে আমাদের দেশে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। আমাদের দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা সমস্ত প্রদেশে একই পরিভাষা চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে, এমন কি—একই প্রদেশের বিভিন্ন লেখককে একই পরিভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারে। এখানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান! সকল প্রদেশে একই পরিভাষা না চলিলে ইহার একটা সাধারণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব। বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভয়সিয়ার নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর ফরাসী বিজ্ঞান পরিষৎ (French Academy of Sciences) যখন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের পরিভাষা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমগ্র ইউরোপ তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত যখন অম্লজান, উদজান প্রভৃতি পরিভাষা সৃষ্টি করিলেন, অমনি বাঙলা ভাষার অপর গ্রন্থকারগণ তাহার প্রতিশব্দ দিয়া জলজান, বারিজান প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন।

এইরূপে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন করিলে গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃপক্ষে কোনও বিশিষ্ট ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মানিয়া না চলিলে এই দুরূহ সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নহে।

পরিভাষা-সম্পর্কে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। পরিভাষা কেবল তৈরী করিলেই হইবে না, তাহাকে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়া চালাইতে হইবে। গত দশ বৎসর হইতে অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার পৃষ্ঠপোষকতায় "আর্থিক উন্নতি" বাহির করিতেছেন। ইহার মধ্যে অর্থনীতি-সম্বন্ধে অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। তাঁহার প্রণীত "ধনবিজ্ঞান" প্রভৃতি গ্রন্থেও এ প্রচেষ্টা চলিতেছে। নরেন্দ্রনাথ ও বিনয়কুমারের মিলনে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। এ সব পত্রিকা ও গ্রন্থের প্রকৃত [illegible] এদেশে হয় না, ইহা দুঃখের বিষয়।

সুখের বিষয় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গীয়

সাহিত্য-পরিষদ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় যে পরিভাষা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যে সর্ব্বানুমোদিত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবে এ বিশ্বাসও নিঃসন্দেহে পোষণ করা চলে। আমি আশা করি যে, প্রবাসী বাঙালী-সাহিত্যিক সুধিবৃন্দ এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবেন। অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের পুত্রপৌত্রগণ বিদেশীয় ভাষার মুখাপেক্ষী না হইয়া বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নব নব তথ্য পাঠ ও প্রচার করিয়া দেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবেন। বাঙলা সাহিত্যের সেই গৌরবময় স্বর্ণযুগ দেখিয়া যাইবার শুভমুহূর্ত্ত হয়ত আমার জীবনে আর আসিবে না।

অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী শিক্ষকতা কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে যে সময় পাইয়াছি, সে সময় আমি বাঙালীর জীবন-সমস্যার আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছি। অস্বীকার করিব না—এ আলোচনার ফলে নিরাশা ও দুঃখে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে—তাই পত্র হইতে পত্রান্তরে নানা প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় আমি বাঙলার আসন্ন সঙ্কট সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। জীবন-সন্ধ্যায় আজ আমার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অস্তিত্বের বিনিময়ে বাঙালী সংস্কৃতির গৌরবে আত্মহারা! হায় বাঙালি, তোমার 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' সম্বন্ধে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াও কি তোমার জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারিলাম না?

আপন প্রদেশে বাঙালী সন্তানের যে সব সমস্যা—তাহাদের প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দেরও সমস্যা ঠিক তাহাই—বরঞ্চ আরও অনেক বেশী। তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের শিক্ষার সমস্যা আছে—ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন আবেষ্টনে জীবন ধারণ করিবার সমস্যা আছে। তাই আমি মুখ্যতঃ সাধারণভাবে সমগ্র বাঙালীজাতির কথা লইয়াই আলোচনা করিতেছি।

১৯০৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আহূত হইয়া আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিলেন, এবং পুণ্য ইউরোপখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই কোপার্‌নিকাস্, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। ১৯০২ সালে প্রকাশিত আমার হিন্দুরসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসে "ভারতে বিজ্ঞান-সাধনা-স্পৃহার অবনতি" শীর্ষক অধ্যায়েও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

১৮৭০ সালে পিতার সহিত আমি প্রথম পল্লীভূমি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসি। প্রায় সেই সময়ই জাপানের নব জাগরণ হইল। মাত্র ৬৭ বৎসরের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-উপশাখায় জাপান যে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র ফলিত-বিজ্ঞানের দুই একটি স্থূল উদাহরণই যথেষ্ট হইবে। আজ জাপান আমাদের এই ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর কুচো লোহা ও কাঁচা লোহা বা Wrought Iron কিনিয়া তাহা হইতে ইস্পাত তৈয়ারী করিতেছে এবং সেই ইস্পাত হইতে বিবিধ যন্ত্রপাতি, কামান, বন্দুক, রণতরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিতেছে ও দেশ-বিদেশে বিক্রয় করিয়া রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। সম্প্রতি ঢাকা অঞ্চলে একটি কাপড়ের কলের উদ্বোধন করিতে গিয়া দেখিলাম, জাপান হইতে আনীত টাকু (Spindle) ইত্যাদি যন্ত্রে কারখানা আরম্ভ করা হইয়াছে। জাপান আজ বাইসিকেল, নানাবিধ খেলনা, বিবিধ ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া শুধু নিজেদের অভাব পূরণ করিতেছে তাহাই নহে—পরন্তু দেশ-বিদেশে চালান দিয়া পৃথিবীর বাজার প্রায় হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে। আমার নিকট জাপান হইতে প্রেরিত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে দেখি, আলকাতরা-সঞ্জাত বিবিধ রঞ্জন পদার্থ, বিবিধ ঔষধ ও সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি ব্যবসায়েও জাপান যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। জাপান আজ নিজের প্রয়োজন মত উড়োজাহাজ তৈয়ারী করিতেছে—বিস্ফোরক তৈয়ারী করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। নিরীহ ভারতবাসী আমরা দূরে থাকিয়াও কবিবর হেমচন্দ্রের 'অসভ্য জাপানের' উড়োজাহাজ ও মারণবাষ্পের ভয়ে আতঙ্কিত! কিন্তু আমরা ইউরোপের শাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছি রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে; জাপানের অন্যূন ৭০ বৎসর পূর্ব্বে! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজ্ঞান পড়াইবার জন্য পরীক্ষাগার রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বিভিন্ন কলেজকে বাধ্য করিয়াছেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত কত পরীক্ষাগারই (Laboratory) না সৃষ্টি হইয়াছে! কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষা তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ করিবার জন্য! কোন প্রকারেই ইহার কোন ফল দেখা যায় না। সত্য বটে দু'চার জন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এতদিনে মাত্র পঁয়ত্রিশ জনও জন্মিল না। এতটুকু দেশ সুইডেন, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক কতনা বৈজ্ঞানিকের জন্মভূমি। একা সুইডেনে Linnae, Berzelius, Scheele ও Arrhenius প্রভৃতি কত মনীষীই না জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

দুই-একটি ছাড়া অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে, তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-গৃহে সেগুলি কোন মতে লিখিয়া পরীক্ষা পাশ করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র। এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ৬ হাজার ছেলে আই, এস্-সি, ২ হাজার ছাত্র বি. এস্-সি. ও ৪০০ ছেলে এম্. এস-সি, পরীক্ষা দেয় — ইহাদের মধ্যে শতকরা কেন, হাজার করা একজনও পরবর্ত্তীকালে বিজ্ঞান আলোচনা করে কি না সন্দেহ। বাঙালীর চিত্তবৃত্তির এই নিদারুণ দৈন্যই আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্বন্ধেই এ কথা সত্য তাহা নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও ইহার সত্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। জটিল অর্থ নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নে বোম্বাইবাসীদের মধ্যে পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, ডেভিড সেসুন এবং মাড়োয়ারী সমাজ হইতে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা প্রভৃতি স্ব স্ব প্রতিভার যোগ্য পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু হায়! বাঙালীর প্রতিভার যোগ্য অবদান এক্ষেত্রে কোথায়? ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন—"What Bengal thinks to-day the whole of India thinks to-morrow."—"বাঙালীর আজিকার চিন্তাধারা কাল সমগ্র ভারত অনুসরণ করিবেই।" প্রসঙ্গতঃ তিনি যে কয়জন কৃতী বাঙালীর নাম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমকক্ষ সেদিন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। আজ দিনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—"তে হি নো দিবসা গতাঃ"।

বাঙালীর এই শোচনীয় জীবন-সমস্যায় প্রবাসী বাঙালীরও দায়িত্ব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কলিকাতা-প্রবাসী মাড়োয়ারীগণ পরস্পর সহানুভূতি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা ব্যবসার বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। প্রবাসী বাঙালী তাঁহাদের অপেক্ষা শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াও আজ জীবন-সমস্যায় পরাভূত হইতেছেন। তাঁহাদের না গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যবসার ক্ষেত্র, না গড়িয়া উঠিয়াছে উপার্জ্জনের কোন স্থায়ী পথ। আদিম প্রবাসী বাঙালীগণ সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন—নিঃসংশয়ে বলিব শিক্ষা তাঁহাদের ছিল—ছিল না দূরদৃষ্টি। পূর্ব্বপুরুষগণের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাঁহাদের প্রবাসী বংশধরদেরই করিতে হইবে। বাঙালীর এই দুঃসময়ের জন্য প্রবাসী ভ্রাতাদের দায়িত্ব কত বেশী। সমাজের শিক্ষাগ্রগণ্য সম্প্রদায় প্রবাসে লইয়া আসিলেন দেশের মাটির সম্পূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতি। দেশ হইতে দূরে আসিয়াও তাহার সংস্কারে তাঁহারা কোন চেষ্টাই দেখাইলেন না!

এখনও যদি প্রবাসী বাঙালীগণ এ ত্রুটি সংশোধন না করেন, এ কলঙ্কমোচনে অবহিত না হন—তবে বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

অনেকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই—অর্থের অভাবেই বাঙালী ব্যবসার ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না—আমি একথা বিশ্বাস করি না। রেল খুলিবার পূর্ব্বে রাজপুতনার মরুভূমি হইতে অশিক্ষিত যে সব মাড়োয়ারী পদব্রজে বাঙলা দেশে প্রবাস-জীবন যাপন করিতে আসিয়াছিল, দিনান্তে সামান্য ছাতুদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বংশধরদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—বিরাট ব্যবসাক্ষেত্র ও প্রভূত অর্থ।

পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙ্গালী বাঙ্গালীর একমাত্র জীবনোপায—চাকরী বা ওকালতী করিতে বাঙ্গালার বাহিরে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা একটি বিষম ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ভুলের ফসলই হইতেছে—তাঁহাদের প্রবাসী বংশধরদের ভীষণ জীবন সমস্যা। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, চিরকালই চাকরী, ওকালতী বা ডাক্তারী ব্যবসা অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ জীবন কাটাইতে পারিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের সকল দিকেই নব-জাগরণের উন্মেষ হইল। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতে আরম্ভ করিয়া, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পাঞ্জাব-প্রদেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্প্রতি আমি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সগর্ব্বে বলিতেছেন যে, ইহা পাঁচটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জননী। ইহা ছাড়াও, আজ অনেক নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বোধ হয় সর্ব্বাধিক প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ই এ বিষয়ে সকলের উপর টেক্কা দিতেছে; অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় কারখানাসুলভ পদ্ধতিতে গ্রাজুয়েট প্রস্তুত করিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে রাশি রাশি যে সকল গ্রাজুয়েট সৃষ্ট হইতেছেন, তাঁহারাও সকলেই বাঙালীর ন্যায় চাকরি ও ওকালতীর পথ বাছিয়া লইতেছেন। প্রবাসী বাঙালীরা এতদিন পর্য্যন্ত বড বড় চাকরি, ডাক্তারী, ওকালতী প্রভৃতি একচেটিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া তত্তৎ প্রদেশবাসীদের মনে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে, এবং ঐ-সকল স্থানে বাঙালী-বিতাড়নের চেষ্টা চলিতেছে, ফলে আজ আর সেখানে বাঙালীদের কোন স্থান নাই।

আমার আত্মচরিতে অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, একমাত্র বাঙলা হইতে অ-বাঙালীগণ (ইউরোপীয়গণ বাদে) প্রতিমাসে ১০ কোটি টাকা অর্থাৎ বৎসরে ১২০ কোটি টাকা রোজগার করিয়া নিজ নিজ প্রদেশে পাঠায়। দুই একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। সারণ জেলায় সদর এক ছাপরা পোষ্টাফিসেই শ্রমজীবীরা বাঙলা ও আসাম হইতে (প্রধানতঃ বাঙলা হইতেই) ৫।৭।১০ টাকা হিসাবে মনিঅর্ডার-যোগে বৎসরে এক কোটি টাকা পাঠাইয়া থাকে। ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সমস্ত বাঙলা ও আসাম হইতে কেবল শ্রমজীবীরা নিজ নিজ প্রদেশে ৬ হইতে ৮ কোটি টাকা পাঠায় ; কিন্তু একটি বাঙালী বিহারে অথবা অন্য কোন প্রদেশে ৫০ বা ৬০ টাকার একটি চাকরি পাইলে সংবাদপত্রে ও ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙালীর শ্রমবিমুখতা, অপটুতা, ও আলস্যই ইহার একমাত্র কারণ। কলিকাতা সহরে ভৃত্য, পাচক, মুটে, মজুর, গাড়োয়ান, মোটর ও লরীচালক, জল, গ্যাস, ড্রেন ও বিজলী বাতির মিস্ত্রী সমস্তই অ-বাঙালী। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত সহস্র সহস্র কুলী মজুর প্রতিমাসে ১৫ হইতে ২০ টাকা উপায় করে। আমরা প্রতি গৃহস্থ জানিয়া-শুনিয়া তাহাদিগকে পাচক ও ভৃত্য অথবা বাগানের মালী নিযুক্ত করিতে বাধ্য হই। আমরা এমনিই অকর্ম্মণ্য যে, নদীবহুল বাঙলা দেশের পারঘাটাগুলি পর্য্যন্ত অ-বাঙালীদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে।

বাঙালী বোম্বাই ও আমেদাবাদকে প্রতি বৎসর ১২ কোটি টাকা পরিধেয় বস্ত্র বাবদ দিয়া থাকে। দুইএকটি ব্যতীত বাঙালীর কোন জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানই নাই—যাহা লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং বোম্বাই, লাহোর ও মাদ্রাজস্থ বীমা কোম্পানীগুলি এই প্রকারে অন্যূন ২।৩ কোটি টাকা বাঙলা হইতে আদায় করে। ছোটনাগপুর ও বিহারের জঙ্গলগুলি—সবই অবাঙালী অধিকৃত। সমস্ত বনজাত দ্রব্য, যথা—হরীতকী, বয়ড়া, কুচলে, গালা প্রভৃতি এবং খনিজ পদার্থ, যথা—অভ্র, কয়লার কিয়দংশ সমস্তই অবাঙালীর অধিকৃত। অন্যান্য খনিজ দ্রব্য এবং কয়লা ব্যবসায়েরও বাকী অংশ ইউরোপীয়গণের হাতে। আমি একবার জব্বলপুরের পথে গণ্ডিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেখানে একজন ভাটিয়া আমাকে চিনিলেন। তিনি সেখানে কি করেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সেখানে তাঁহাদের বিড়ির কারখানা আছে। তিনি দেখাইলেন সেখানে যে গাঁটবন্দী গেন্দুয়া

পাতা রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা ওখানকার জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রকার কারখানা হইতে ব্যবসায়িগণ কেহ কেহ বৎসরে অন্যূন লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করেন।

বাংলায় অর্থাৎ হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে এতদিন ইউরোপীয় পরিচালিত ৭০।৭৫টি পাটের কল ছিল। এখন মাড়োয়ারিগণ তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ইহারই মধ্যে ৮।১০টি পাটের কল স্থাপন করিয়াছেন। হুকুমচাঁদ মিল ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র পৃথিবীতে বৃহত্তম।

প্রবাসী বাঙালীর সমক্ষে আর একটি জটিল সমস্যা উপস্থিত। ভিন্ন প্রদেশের বিরাট জনসমুদ্রে—তাঁহারা মুষ্টিমেয় মাত্র। ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া তাঁহারা চলিতে চান। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এই প্রকারে তাঁহারা ঐ সব প্রদেশেব লোক হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। ফলে সামাজিক আচার ব্যবহার ও উৎসবাদিতে পরস্পর সহানুভূতির কোনই স্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না।

লম্বার্ডরা যখন ইংলণ্ডে যাইযা বাস করে, তখন তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সঙ্গে লইয়া গিযাছিল। লণ্ডন সহরের লম্বার্ড ষ্ট্রীট এখনও তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবের স্মৃতি বহন করিতেছে। আল্‌ভার অত্যাচারের ফলে ফ্লেমিশেরা ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিয়াছিল। ইহারাই পশম ব্যবসায়ে উন্নত প্রণালীর প্রবর্ত্তন করে। হিউগেনটস্‌রাও ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য-গঠনে এইরূপে সহায়তা করিয়াছে। ফ্রান্স যখন ধর্ম্মান্ধতার বশবর্ত্তী হইযা "এডিক্ট অব ন্যান্টিস" প্রত্যাহার করে, তখন তাহাব প্রায় ৪০ হাজার 'হিউগেনট' অধিবাসী নিকটবর্ত্তী প্রোটেষ্টাণ্ট দেশসমূহে গিয়া আশ্রয় নেয়। ঐ সব দেশে তাহারা তাহাদের বীরত্ব, সাহস ও কর্ম্মকুশলতাব অবদান বহন করিয়া লইযা গিয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যে ঐ সব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জন হেনরী ও কার্ডিন্যাল নিউম্যান এই দুই কৃতি ভ্রাতা উক্ত বংশজাত, সম্ভবতঃ হিব্রু রক্তও এই বংশে ছিল। তাঁহাদের মাতা হিউগেনট-বংশীয়।

যে সমস্ত বিদেশী ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইযাছে, ইংলণ্ডের দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত। ইংলণ্ড তাহার এই উদার নীতির জন্য যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইংলণ্ড বহু ইহুদীকে তাহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই মিশ্রণের ফলে ইংরাজজাতির বহু উন্নতি হইয়াছে। বেঞ্জামিন

ডিজরেলি (লর্ড বিকনস্‌ফিল্ড), জর্জ্জ জেয়াকিম গশেন, এডুইন মণ্টেগু, স্যামুয়েল হারবার্ট, রুফার আইজ্যাকস্‌ (লর্ড রেডিং) এবং ধনকুবের রথচাইল্ডের বংশধর কেহ কেহ ইংরাজজাতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং রাজনীতিক-রূপে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্যই সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। ইংলণ্ডে অনিষ্টকর জাতিভেদপ্রথা না থাকার জন্য, ইঁহারা দুই এক পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের ফলে ইংরাজ জাতিভুক্তই হইয়াছিলেন; পক্ষান্তরে বাঙলাদেশে ঐশ্বর্য্যশালী অ-বাঙালী ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, বাঙালী জাতির সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ধনী মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা (ভাটিয়া) ধর্ম্মে হিন্দু, তাহারা গঙ্গাস্নান করে এবং কালী-মন্দিরে পূজা দেয়, গোমাতাকেও পবিত্র মনে করে, কিন্তু তবু বাঙালীদের সহিত তাহাদের ব্যবধান বিস্তর। উভয়ের মধ্যে যেন দুর্ভেদ্য 'চীনা প্রাচীর' বর্ত্তমান।

আমার বক্তব্য এই যে, জাতিভেদ বাঙালীর বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। যদি বাঙালী ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিবাহের প্রথা থাকিত তবে উভয়ের মিশ্রণের ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক হইত, যাহাদের মধ্যে উভয় জাতির গুণই বর্ত্তমান থাকিত। একজন বিড়লা যদি কোন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিত, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানেরা একের ব্যবসা-বুদ্ধি এবং অন্যের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক লাভ করিত। গোয়েঙ্কার কন্যার সঙ্গে বসুর ছেলের বিবাহ হইলে, তাহাদের সন্তানের মধ্যে উভয় জাতির গুণই থাকিত। প্রসিদ্ধ ব্যবহার-শাস্ত্রবিৎ স্যার হেনরি মেইন বলিয়াছেন যে মানবজাতির সামাজিক প্রথাসমূহের মধ্যে জাতিভেদের মত এমন অনিষ্টকর কুপ্রথা আর নাই। তাঁহার এই কথা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। বিবাহের প্রথা দূরে থাকুক, পরস্পরের মধ্যে আহার-ব্যবহারও নাই।

আমার আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত এই কয়টি কথা বলিয়া আমি আপনাদের দৃষ্টি জাতিভেদ ও প্রাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাই মাত্র। অনেকে হয়ত বলিবেন, যদি এই প্রকারে আমরা একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যাই, তাহা হইলে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ত' চলিয়া গেল! এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নহে। আমরা যদি প্রত্যেক জাতি ও উপজাতি স্ব-স্ব-বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লইয়া চলিতে থাকি, তবে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইব? এরূপ হইলে নিখিল ভারতীয় জাতি কোন দিনই গঠিত হইবে না। আমরা যখন বিদেশে যাই—সুদূর প্রাচ্য বা প্রতীচ্য যেখানেই হউক—তখন আমাদের

একমাত্র পরিচয় আমরা হিন্দুস্থানী বা ভারতবাসী। বিদেশবাসীরা ভাবিতেও পাবে না যে, হিন্দু বা মুসলমান, বাঙালী বা বিহারী, কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি বা উপজাতির অস্তিত্ব আছে!

এই সমস্যা একমাত্র প্রবাসী বাঙালী বা মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সমস্যা নহে। ইহা নিখিল ভারতীয় সমস্যা। প্রবাসী আপনারা—ইহা সমাধানের উপায় ভাবিয়া দেখিবেন, ইহাই আমার বক্তব্য।

একুশ বৎসর পূর্ব্বে এই পাটনা সহরে,—অতীতের কীর্ত্তি-বিভূষিতা পাটলিপুত্র নগরীতে—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'পূর্ণেন্দু'-কিরণোদ্ভাসিত সে সম্মেলন,—মনীষী ও মনস্বী আশুতোষের উদাত্ত বাণী-মুখরিত সে সম্মেলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গীতি-ঝঙ্কৃত সে সম্মেলন—সার্থক ও ধন্য হইয়াছিল। আজ তাঁহারা নাই, কিন্তু প্রবাসী বাঙালী-জীবনের সমস্যাগুলি ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা বাঙালীর কৃষ্টি, সাহিত্য, অন্নসমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কোনরূপ সমাধানে উপস্থিত হইতে পারিলেই প্রবাসী বাঙালীর এই সম্মেলনের পূর্ণ সার্থকতা হইবে।

স্যার আশুতোষ এইখানেই উদাত্ত স্বরে বঙ্গ-সাহিত্যের যে 'ভবিষ্যৎ বাণী' প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে। আজ বাঙলা ভাষা শিক্ষার বাহন, বাঙলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষায় স্বীয় গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছে। পুত্রই পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী; উত্তরাধিকার-সূত্রে পুত্র কেবল যে পিতার বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যে পুত্র পিতার কার্য্য, চিন্তা ও ভাবধারার অধিকার লাভ করে—সেই পুত্রই পিতার উপযুক্ত পুত্র। স্যার আশুতোষ কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাব উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ তাহার স্বাধ্যায় গাহিয়া বাঙলা-ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্যার আশুতোষের সেই উদাত্ত বাণী আমাদিগকে আজও মনে রাখিতে হইবে—"মায়ের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বহু কোটি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে, তবে ঐ সংকল্পিত সৌধের ভিত্তি মাত্র প্রোথন হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে, কঠোর কার্য্যে, যিনি যতটুকু পারেন সাহায্য করুন। মায়ের মন্দির গঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য-পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই! যিনি

যাহা পারেন, লইয়া আসুন ও মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিব।"

"বাঙালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এতদিনে বঙ্গ-সন্তান বুঝিতে পারিয়াছে। তাই বাঙালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তি ইহা বিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইবে। জাতীয় জীবন-গঠনের মূলমন্ত্র হইল—জাতীয় সাহিত্য-নির্ম্মাণের স্পৃহা।"

আজ আপনারাও মাতৃযজ্ঞের এই মণ্ডপে, এই সারস্বত-সম্মেলন-বাসরে এই মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করুন। বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানে সকলে বদ্ধপরিকর হউন।

আজ মাতৃভাষার এই যজ্ঞ-বেদীমূলে বসিয়া, আসুন আমরা সমবেত কণ্ঠে গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া বলি—

"আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য,
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

বিজ্ঞান গ্রন্থপঞ্জী

(সাহিত্যবন্ধু শ্রীমান্ মলিনী রঞ্জন পণ্ডিত এই গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। সময়ের অল্পতাবশতঃ এই তালিকা সম্পূর্ণ হয় নাই এবং ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকাও সম্ভব।)

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ—ইয়েটস্ কৃত পদার্থ-বিদ্যা-সার
(ঐ—১৮৩৪ খৃঃ, ২য় সংস্করণ)
১৮২৮ „ —ডবলিউ পিয়ার্স অনূদিত জে, লসনের প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক-গ্রন্থ।
১৮৩৩ „ —মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কৃত
Introduction to the Arts & Sciences

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ। পাটনা—২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে—ইউরোপীয় বিজ্ঞান-অনুবাদ-সমিতি (European Science Translating Society) অধ্যাপক উইল্‌সন, জে সাদারল্যাণ্ড প্রভৃতি 'বিজ্ঞান-সেবধি' নামে অতিশয় প্রয়োজনীয় অনুবাদমালা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় সুধীবৃন্দ অনুবাদমালা প্রণয়নে উৎসাহ দান করেন; কিন্তু ব্যাপকভাবে দেশের জনসাধারণের সমর্থনের অভাবে মাত্র ১৫ খণ্ড পুস্তক বাহির করিবার পর এই গ্রন্থমালার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সম্বন্ধীয় খণ্ডগুলি বাহির হইয়াছিল। (১) জ্যোতির্বিজ্ঞান, (২) জলবিজ্ঞান, (৩) গতিবিজ্ঞান, (৪) আলোকবিজ্ঞান ও (৫) বাষ্পবিজ্ঞান।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ—জে. ম্যাক্ কৃত Chemistry বা কিমিয়া-বিদ্যা-সার।

১৮৩৪-৪০ —রামচন্দ্র মিত্র কৃত পশ্বাবলী।

১৮৩৫ " —ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত দ্রব্যগুণতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক।

১৮৩৮ " —রামচন্দ্র মিত্র কৃত জ্ঞানোদয়।

১৮৪৪ " —রামচন্দ্র মিত্র কৃত পক্ষীর বিবরণ।

১৮৪৫ " —বস্তুবিচার (Natural Theology—Illustrated)।

১৮৪৭ " —পি সি. মিত্র কৃত পদার্থ-বিদ্যা।

১৮৪৯ " —রাধাবল্লভ দাস কৃত মনস্তত্ত্বসারসংগ্রহ (Phrenology)।

১৮৫২ " —ভুবন চন্দ্র মিত্র কৃত কৌতুক-তরঙ্গিনী।

(২য় সংস্করণ, ১৮৫২, ৩য় সং, ১৮৫৬; ৪র্থ সং, ১৮৭৩; ৫ম সং, ১৮৭৭)

১৮৫৩ " অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত চারুপাঠ ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ, পরে ৩য় ভাগ (পুস্তকাকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে পুস্তক তিনখানির অনেক প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়)

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, পদার্থ-বিদ্যা (পুস্তক দুইখানির প্রকাশ-সাল পাই নাই)।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ—ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার অনূদিত উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা।

১৮৬১ " —চণ্ডীচরণ দে কৃত প্রাণিতত্ত্বসার, ১ম ভাগ।

১৮৭২ " —প্রিয়নাথ সেন কৃত রসায়ন-সার-সংগ্রহ।

১৮৭৪ " —রায় বাহাদুর ডাক্তার কানাইলাল দে-কৃত পদার্থ-বিজ্ঞান, ১ম ভাগ

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ—রায় বাহাদুর ডাক্তার কানাই লাল দে কৃত রসায়ন-বিজ্ঞান
(১৮৭৭, ২য় সংস্করণ ও ১৮৮৪, ৩য় সং)

„ „ —এচ. ই. রস্কো কৃত রসায়ন-সূত্র।

১৮৭৬ „ —মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত পদার্থ-দর্শন।

„ „ — ঐ কৃত রসায়ন (এই খৃষ্টাব্দেই ২য় সংস্করণ বাহির হয়)

১৮৭৭ „ —রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী কৃত রসায়ন-শিক্ষা (২য় সং, ১৮৭৮)।

১৮৭৮ „ —মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত পদার্থ-বিদ্যা

„ „ —যাদবচন্দ্র বসু কৃত রসায়ন।

„ „ —বিপিনবিহারী দাস কৃত রসায়ন।

১৮৮৬ „ —ভুবনচন্দ্র বসাক কৃত রসায়ন-চিকিৎসা।

১৮৯৩ „ —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃত পদার্থ-বিদ্যা।

১৮৯৭ „ —রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু কৃত রসায়ন সূত্র।

„ „ —হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম।

১৯০৩ „ —প্রফুল্লচন্দ্র রায় কৃত প্রাণিবিজ্ঞান।

১৯০৪ „ —নিবারণচন্দ্র রায় চৌধুরী কৃত রসায়ন-পরিচয়।

১৯০৬ „ —প্রফুল্লচন্দ্র রায় কৃত নব্য রসায়নবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি।

১৯১২ „ —প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় সঙ্কলিত রাসায়নিক পরিভাষা।

১৯৩৩ „ —বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।)

১৯৩৭ „ —জ্ঞানেন্দ্র ভাদুড়ী সংগৃহীত বাংলা-পরিভাষার গ্রন্থপঞ্জী।

[আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীমান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কলিত) একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সুবিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।]

এগুলি ব্যতীত বিজ্ঞানাচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রকৃতি, মায়া-পুরী প্রভৃতি এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেখক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের আচার্য্য বসুর আবিষ্কার, প্রাকৃতিকী, গ্রহনক্ষত্র, প্রকৃতি-পরিচয়, গাছ-পালা, পোকা-মাকড় ইত্যাদি বিজ্ঞানসাহিত্যের অপূর্ব্ব রত্ন।

বাঙালী যুবকের শ্রমবিমুখতা

[মন্তব্য—"শ্রমের মর্য্যাদা ও বাঙালীর বিমুখতা" প্রবন্ধে আচার্য্যদেব কলেজে-পড়া ছেলেরা পানের বরোজে বাপখুড়োর সাহায্য করে না এবং পানের ব্যবসায়ে বারুজীবী ছেলেরা মনোযোগী নয় এরূপ লেখায় তাহার প্রতিবাদ হয়। ইহার উত্তর আচার্য্যদেব দেন। প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৪০—সম্পাদক]

বাগেরহাট কলেজ সংস্থাপন অবধি আমি বছরে অন্যূন একবার সেখানে যাই, এবং একজন সম্ভ্রান্ত, আত্মচেষ্টায় কৃতী বারুজীবী গৃহস্থের বাড়ীতে অবস্থিতি করি। এই কলেজটি প্রধানতঃ বারুজীবী সম্প্রদায়ের কয়েকজন কৃতবিদ্য স্বদেশহিতৈষী স্থানীয় নেতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমি দেখিয়া অবাক্ হইতেছি যে, দশানি (বাগেরহাটের সন্নিকটস্থ গ্রাম) ও অন্যান্য অঞ্চলের যাঁহারা কলেজে একবার অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের কপাল পুড়িয়াছে—তাঁহারা একুল-ওকুল দুই কুলই হারাইয়াছেন।

পানের ব্যবসা করিয়া অনেকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু সেই অর্থ তাঁহারা জমিদারীতে নিয়োজিত করিয়াছেন কিনা ইহা অবান্তর কথা। প্রায়ই আমি দেখি যে, আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যবসা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন তাঁহারা সেই অর্থ মহাজনী, তেজারতি বা জমিতে ইন্‌ভেষ্ট করেন। আবার তেজারতি করিলে ভূসম্পত্তি হাঁটিয়া আসিয়া করতলস্থ হয়।

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম দৌলতপুর অঞ্চলে বারুজীবী সন্তানগণ স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াও শ্রমের মর্য্যাদাবোধ বজায় রাখিয়াছেন। অবশ্য সেখানে পানের ব্যাধিতে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, তাহা আমার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বেঙ্গল রিলিফ কামটির অর্থাৎ খাদিপ্রতিষ্ঠানের আত্রাইতে যে স্থায়ী আশ্রম আছে, সেখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া আসিলাম। ইহার সন্নিকটস্থ বাসুদেবপুর নামক ষ্টেশন হইতেও পাঁচসাত গাড়ী (wagon load) বোঝাই পান B. N. W. Ry. via কাটিহার দিয়া বিহার ও পশ্চিম অঞ্চলে যায়। সে অঞ্চলের ব্যাপারীরা বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। সুতরাং পানের ব্যবসা যে একেবারে লাভজনক নহে, তাহা ভাবিবার কারণ নাই। মোটকথা, আমার বক্তব্য এই যে, স্থান বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু একবার যদি বাবাজীরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন—কলেজের ধাপ মাড়াইলে ত কথাই নাই, তাহা হইলে ঐ কেরাণীগিরি অর্থাৎ 'বাবু'-শ্রেণীভুক্ত হইয়া

আজীবন vegetate করেন। ইহার উত্তর শ্রমের মর্য্যাদা ও আত্মোন্নতি বিষয়ক আরও ধারাবাহিক প্রবন্ধে দিবার সঙ্কল্প রহিল।

কলেজে-শিক্ষিত কেন, সামান্য রকম ইংরেজী অক্ষরজ্ঞানের পর 'স্পেলিং বুক' অধ্যয়ন করিলেই বাঙালী যে পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া চাকরির জন্য লালায়িত হয়, ইহা যাঁহারা রাজনারায়ণ বসু কৃত 'সেকাল ও একাল' পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পাঠাশালায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত কি-না শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা এ বিষয়ে রাজা রাধাকান্ত দেবের মত আহ্বান করেন। তিনি এই মর্ম্মের কথা বলেন—

"নূতন প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে সামান্য কিছু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার যে বিধান করা হইয়াছিল তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তিনি বলেন যে, ঐ প্রকার শিক্ষা পাইয়া কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের বালকেরা স্ব স্ব জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরদিগের অফিসে কেরাণীগিরি চাকরির জন্য উমেদারী করিয়া বেড়ায় এবং অধিকাংশই চাকরি না পাইয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।"

স্যার্ জন কামিং ১৯০৮ সালে 'Report on Industries in Bengal' পুস্তকের একস্থানে বলিতেছেন যে, বাঙালী ছুতার প্রায়ই কমিয়া আসিতেছে; কারণ তাহাদের ছেলেপিলেরা স্কুলে পড়ে এবং পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে ঘৃণা বোধ করে। কাজেই চীনে ছুতোরেরা ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে।

পানের সঙ্গে সুপারীর ব্যবসায় যে কত সুদূরপ্রসারী তাহা আমার আত্মচরিত (৪৪৭ পৃঃ) হইতে দুইচার ছত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিব।

বাগেরহাট বারুজীবী সম্প্রদায় যে কেবল পানের ব্যবসা করেন তাহা নহে, সুপারীর ব্যাপারী হইয়াও অনেকে বেশ দু-পয়সা রোজগার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে নারাজ। বারুজীবী শ্রীমানেরা যদি কূপমণ্ডুক হইয়া কেবল গ্রামের ভিতর না থাকিয়া একটুখানি আশপাশে গিয়া চোখ মেলিয়া দেখেন, তাহা হইলে যে, তাঁহাদের এক প্রকার বাড়ীর দুয়ার হইতেই বিদেশী অশিক্ষিত ব্যাপারীরা কি প্রকারে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিয়া লয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাগেরহাট ও বরিশাল ভৌগোলিক হিসাবে এক বলিলেও হয়।

"The export of betel-nut to Rangoon and Calcutta is the mono-

poly of Burmese, Chinese, and Bombay merchants all of whom have their agents at Patarhat drawing fat' salaries from Rs. 100 and upwards per month. They live with their families and the place in the exporting season bears the semblance of a Burmese town. Not far from the steamer ghat are the bounderies of each merchant within which hundreds of maunds of betel-nut are dried up daily or kept in stock ready for putting into sacks before exportation. Like the Jute-business in the Eastern Districts of Bengal this trade in betel-nut is important in as much as the total export varies from thirty to forty lacs a year. But unfortunately for the people, the bulk of the profits derived from the trade of betel-nut goes into the pocket of the middlemen."

জ্যাক (বরিশালের কলেক্টর) বলিয়াছেন—এ-অঞ্চল হইতে সত্তর পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সুপারী রপ্তানি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সিঙ্গাপুর হইতে ভারতবর্ষে বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকার সুপারী আমদানি হয়। সে উপলক্ষে আমি লিখিয়াছি—

"If the college-bred youngman would only increase the yield of betel-nut by new plantation upon improved scientific method........they could earn several additional lacs. But as Mr. Jack pathetically remarks, The Bhadralog class of Barisal have as yet displayed no versatality or adaptability."

এই যে সত্তর পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সুপারীর ব্যবসা, middleman হিসাবে চীনে ও গুজরাটিরা (ভাটিয়া) অন্যূন শতকরা দশ টাকা পরিমাণ মুনফা ধরিলে স্বচ্ছন্দে সাত আট লাখ টাকা রোজগার করে।

হায় বাঙালী যুবক, তথাকথিত 'বিদ্যার্জ্জনের' দোহাই দিয়া তুমি অর্থনীতি-ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ এবং কেবল পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছ।

বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয়

রামমোহন হলের সম্পাদক চারুবাবু বিজ্ঞানের অধ্যাপক, আমার সমব্যবসায়ী। তাই পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া আমাকেই বক্তৃতা দানে প্রথম আহ্বান করিয়াছেন। বক্তৃতার যে পঞ্জী তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার নামই সর্ব্বাগ্রে দেখিতেছি।

বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় বিষয়ে কিছু বলিব। গত ২০ বৎসর এই বিষয়টি আমার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে।

অন্নসমস্তায় বাঙালীর জীবন আজ মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় শুধু মাড়োয়ারী নয় সকল অবাঙালীর নিকট বাঙালী পরাজিত হইতেছে।

৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে সকল কার্য্যে রাজসরকারের দপ্তরখানায় ও ব্যবসায়ের হৌসে সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ স্থান বাঙালী অধিকার করিয়া থাকিত। বাঙালী বুদ্ধিমান, বাঙালী চতুর ইহাই শুনিতে পাই। কিন্তু যত চতুর, তত ফতুর। তাই ধন-সম্পদে বাঙালী আজ ফতুর হইয়াছে।

সেদিন এক ভদ্রলোক—আমার নাকি তিনি ছাত্র—এই দাবীতে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ছেলেটি তিনবার বি. এস্-সি. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে। পরীক্ষকমণ্ডলীকে বলিয়া কহিয়া যাহাতে তাহার পাশের ব্যবস্থা করিতে পারি, এইজন্যই তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাই নাকি তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার একমাত্র উপায়! দেখা যায় ইহাই প্রত্যেক বাঙালী ছাত্রের আদর্শ। ছাত্রদের আশা I. C. S., B. C. S., উকীল, ডাক্তার হইবে—আশা অমনি ধাপে ধাপে নামে। কিন্তু কয়জনের পদ খালি হয়, কয়জনেরই বা প্রয়োজন?

আলিপুরে ৮০০ উকীল, তবু বৎসর বৎসর সেখানে কত নূতন উকীল ভর্ত্তি হয়। জেলা বা মহকুমার সর্ব্বত্রই এইরূপ।

ছোট্ট ঘর ভাড়া লইয়া পশ্চিমা অশিক্ষিত লোক বিদ্যুতের যোগে গমপেষা কল চালায়। কলিকাতার অলিতে গলিতে এই প্রকার কত আছে। ইহারা মাসে ৭০।৭৫৲ টাকা উপার্জ্জন করে। চতুর ও তীক্ষবুদ্ধিবিশিষ্ট বাঙালীর সন্তান এই ব্যবসায় করে না। মূলধনের অভাবে ইহা নাকি বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ এই প্রকার ব্যবসায়ে অতি সামান্য মূলধনের প্রয়োজন হয়।

কলিকাতার কাঁসারীপাড়া, কাটোয়ার সন্নিহিত দাঁইহাট, লৌহজঙ্গ, খাগড়া, টাঙ্গাইলের কাগমারী প্রভৃতি স্থান কাঁসারীর ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। অধুনা এলুমিনিয়ামের বাসন বাঙালীর সংসারে রাজত্ব করিতেছে। কেবল পূজা পার্ব্বণে উহা ব্যবহৃত হয় না। বিদেশীয় বস্তু বলিয়াও কেহ কেহ আপত্তি করেন কিন্তু এইসকল আপত্তি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। এই বাসন আমেরিকা ও সুইডেন হইতে আমদানী চাদর হইতে তৈয়ারী হয়। অতি সহজ এই কাজ।

অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে কত ভাটিয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থে এলুমিনিয়ামের কারখানা খুলিয়া বর্ত্তমানে প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী হইয়াছেন। ঢালাই করিতে হয় না, জোড়াতাড়া দিয়া ঝালাইতে হয় না। প্রথমে চাকতির আকারে কাটিয়া পেষণযন্ত্রে (stamping) ফেলিয়া যথাবিহিত আকার দান করা হয়। এই ভাটিয়াগণ ভারত ও রেঙ্গুনে এলুমিনিয়মের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াছেন। ইহারা পরের দুঃখ মোচনে বহু টাকা দান করিয়া থাকেন, ভাবও নিতান্ত অনাড়ম্বর। এই সকল ভাটিয়াগণ বাঙলার নানা ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। আর আমারই হাতে তৈয়ারী বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষিত So., D. Sc. রা বেকার বসিয়া থাকিয়া এক মহা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। অথচ Chemistry admits of the widest application in the practice of life.

রসায়নের সাহায্যে কাঁচা মাল হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া বিদেশীয়গণ এ দেশ হইতে প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছে; কিন্তু এ দেশে রসায়নের শিক্ষার বিফলতা দেখা যাইতেছে।

আমি চোখে যাহা দেখি তাই বলি। আমার পরীক্ষায় যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয় তাহাই প্রকাশ করি। আমাদের দেশের নানা স্থানে তামাক জন্মে। রংপুরে যে খুব ভাল তামাক হয়, সে সংবাদ রংপুরের ছেলেরা রাখে না। অথচ সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে এই তামাকের সন্ধানে লোক আসে। সেদিন হাওড়ার ওপারে 'Rameswar Tobacco Works' নাম দিয়া এক যুবক সিগারেটের কারখানা খুলিয়াছেন। তামাকের রাসায়নিক পদার্থের বিষয় জানিতে তিনি আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে যুদ্ধের পূর্ব্বে যত সিগারেট এ দেশে খরচ হইতেছিল, বর্ত্তমানে তাহার ছয় গুণ সিগারেট এ দেশে বিক্রীত হইতেছে।

আমি সিগারেট খাওয়ার পক্ষপাতী নহি। বিড়ি আমাদের দেশেই তৈয়ারী হয়। সভ্য হইয়া বিড়ি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশজাত সিগারেট খাইয়া বহু অর্থ বিদেশীয়কে দিতেছি। এই কথাটা তামাকসেবনকারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কথাটি বাঙলার পক্ষেই বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

নাগপুরের পথে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডিয়া নামক রেল ষ্টেশনে প্রকাণ্ড বিড়ির কারখানা দেখিয়াছি। অল্পবয়সের বালকগণ দৈনিক এক টাকা, পাঁচ সিকা এই বিড়ির কারখানায় উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই সকল স্থানে কুটীরে

কুটীরে গৃহ-কর্ম্মের অবসরে বিড়ি তৈয়ারীর কার্য্য চলিতেছে। এমন করিয়া আমাদের দেশে পূর্ব্বে চরকা চলিত। এই প্রকারে নাগপুর অঞ্চলে ৫০ হাজার দরিদ্র ও অনাথা বিধবার অন্ন সংস্থান হয়।

কলিকাতায়ও বিড়ির ব্যবসায় চলে, কিন্তু তাহা অবাঙালীর হাতে। ভারতবর্ষে ১০।১২ লক্ষ টাকার মোহিনী বিড়ি বিক্রয় হয়। এই অতি সহজ ব্যবসায়টিও বাঙালী কোন রূপেই গ্রহণ করিতে পারে নাই।

কলিকাতায় দুধ মিলে না। অল্প যাহা কিছু মিলে পশ্চিম দেশীয় গোয়ালার দয়ায়। কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজে আছে অত বড় মাঠ; মাঠে সবুজ, নধর ঘাস। সেখানে কয়জন পশ্চিমা গোয়ালাকে অনুনয় বিনয় করিয়া আনিয়া রাখিয়াছি। বাঙালী গোয়ালা পাওয়া যায় নাই। ইহারা দেখি মাসে ২০০।২৫০ টাকা উপার্জ্জন করে।

খুলনার জেলাবোর্ড বাঙালীর। সেখানকার পারঘাটগুলি এই বাঙালীরা পশ্চিমা মাঝিদের হাতে দিয়াছেন। বাঙালীদের হাতে দিয়া উপযুক্ত অর্থ পাওয়া যায় নাই, কার্য্যও অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

রাজা গোপালাচারী ও যমুনালাল বাজাজ সহ শ্রীহট্টে খদ্দর প্রচারার্থ গিয়াছিলাম। সেখানকার খেয়াঘাট দেখিলাম দেশিয়ানায় সজ্জিত। সংবাদ লইয়া জানিলাম খেয়ার মালিকের নাম রায় বাহাদুর ছত্রপতি সিংহ। ইনি ক্ষুদ্র অবস্থায় খেয়াঘাটের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের প্রায় সকল খেয়াঘাটের ইজারাদার হইয়াছেন। ইনি বহু ধনের মালিক। এবার শ্রীহট্টের বন্যায় অজস্র অর্থ দান করিয়াছেন।

বাঙালীকে ব্যবসায়ী হইতে বলিতেছি। কেহ কেহ আমাকে বলেন, তবে কি বিদ্যাবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া মাড়োয়ারী হইব?

কলিকাতা Print Co'র Lord Cobb ১০০৲ টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। Andrew Yule-এর পরলোকগত স্যার ডেভিড ইয়ুল ভারত হইতে ৩০ কোটি টাকা লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা অশিক্ষিত ছিলেন না। এডিসন গ্রামোফোনের আবিষ্কার করিয়া প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অদৃষ্টে প্রাথমিক শিক্ষালাভও ঘটে নাই। তিনি আপন চেষ্টায় বিজ্ঞান শিখিয়াছেন। ফোর্ডের পিতা কৃষক ছিলেন। পিতার আহ্বান সত্ত্বেও সে ব্যবসায় তিনি গ্রহণ করেন নাই, সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই নিজ অনুসন্ধিৎসার

গুণে যন্ত্রের কৌশল অর্জ্জন করিয়া নিজ ব্যবসায়ে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন।

সাবান ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ ধনী লিভার ব্রাদার্সের লিভার বালক-কালে মুদিখানায় কাজ করিতেন; জগতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী Andrew Carnegie প্রথম জীবনে টেলিগ্রাফের পিয়ন, পরে কলের মজুররূপে জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। অদ্বিতীয় ধনী Inchcape গ্রাজুয়েট ছিলেন না। যাঁহাদের নাম করিলাম, ইঁহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করেন নাই। ডিগ্রীর ছাপ নাই বলিয়াই কি ইঁহাদিগকে অশিক্ষিত বলিব?

জামশেদজী টাটা বিজ্ঞান জানিতেন না,—মস্তিষ্ক ছিল। তাহারই প্রভাবে টাটার লৌহ-কারখানার উদ্ভব হইয়াছিল। Expert বলিয়া একটি কথা চলিত আছে। আমরা ইহাদের বড়াই করি। ইহারা টাকায় বিকায়। কলিকাতার নিকটে Hookumchand Steel Works চলিতেছে। হুকুমচাঁদ বিজ্ঞানবিদ্ নহেন। একজন সাহেব ম্যানেজার ও বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার রাখিয়াছেন। স্যার হুকুমচাঁদ একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। ইঁহার তাঁবেদার এই Experts.

ডিগ্রীর মোহ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। জ্ঞান-অর্জ্জন হইতেছে না, ডিগ্রী অর্জ্জিত হইতেছে। ইতিহাস ও ভূগোল Optional—যেন উহা জানা অতিরিক্ত মাত্র। ফাঁকি দিয়া পাশ করাই এখনকার ছেলেদের উদ্দেশ্য। এজন্যই ভারতবর্ষময় আমি বলিয়া থাকি Degree is only a cloak to hide one's ignorance অর্থাৎ ডিগ্রী অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র।

কলিকাতায় কলেজের হোষ্টেলে ছাত্র থাকে। মাসে ৪০।৫০৲ টাকা অভি-ভাবকদের নিকট হইতে ইহারা আদায় করে। রেস্তোঁরায় খায়, সিনেমা দেখে, ডাইং ক্লিনিং-এ কাপড় কাচে, হেয়ার কাটার দ্বারা চুল কাটায়। অবকাশের সময় দিনের বেলা ঘুমায় ও আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করে। এইরূপে পরম আলস্যে ইহাদের দিন যাপিত হয়। অপরের গলগ্রহ হইয়া এইরূপ ভাবে কালাতিপাত লজ্জার বিষয়।

আমেরিকায় অনেক ছেলে নিজের খরচের কিয়দংশ নিজ উপার্জ্জন হইতে বহন করে। এমন কি চীনেও তাই। ছুটির সময়টি আমাদের ছেলেরা নানা ব্যসনে কাটায়, আর চীনের ছেলেরা এই সময় স্বদেশের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য বক্তৃতা দান, জিনিস ফেরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে লিপ্ত থাকে। এইরূপে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য

গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরা দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিতে মনন করিয়াছে এবং বহুস্থানে সফলকাম হইয়াছে।

শুধু বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এবং তাহার প্রতিদান করিয়াই চীনেরা ক্ষান্ত হয় নাই। অর্থোপার্জ্জনের নব নব পথ তাহারা উন্মুক্ত করিয়াছে।

বাংলা দেশে ৮৬টি পাটের কল; একটিও বাঙালীর নহে। সকলই ইংরাজের ছিল। সম্প্রতি ২।৪টি মাড়োয়ারীর হইয়াছে।। এখনও বাঙালী নিশ্চল।

Bally Bridge-এর মজুরদের ঠিকাদার অবাঙালী।—ইঁহার নাম রায় বাহাদুর জগমল রাজা। ইঁনি কচ্ছ দেশীয়। কোথাকার লোক কোথায় আসিয়া অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এই প্রকার কচ্ছ দেশীয় মেমনগণ মগরাহাট অঞ্চলে Ralli Brothers-এর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল বিদেশে রপ্তানি করে। আবার কলিকাতার জহুরীরা সিন্ধি। পূর্ব্বে কেরাণীগিরি বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। মাদ্রাজীরা তাহা দখল করিয়া লইতেছে। কলিকাতার Electric মিস্ত্রী প্রায় সকলেই শিখ। বাঙলায় আসিয়া সকলেই সোণা পায়। শুধু বাঙালীর হাতে উঠে ধূলি-মুটি। তাহারা উপবাস করিয়া মরে।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ অত বড় রাস্তা—দুই পার্শ্বে কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ২।১টি ছাড়া সকলের মালিক অবাঙালী।

উপাধিধারী বাঙালী উপরিউক্ত ইংরাজী অনভিজ্ঞ মাড়োয়ারী ইত্যাদির নিকট টাইপিষ্ট ও কেরাণী হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে।

বাঙলার জমিদারের হাতে টাকা নাই। অপরিমিতব্যয়ী বলিয়া ইহারা ঋণগ্রস্ত। কোন দুর্দিনে কোন জমিদারের যদি টাকার দরকার হয়, তবে মাড়োয়ারী ছাড়া আর কে দিতে পারিবে? বাঙলার জমিদারী মাড়োয়ারীদের হাতে যাইবে, আমি এই ভবিষ্যৎ দর্শন করিতেছি। কেবল চাকরির আশায় তাহারই পথ পানে চাহিয়া হা-ভাতের মত বাঙালীর দিন যাইতেছে। তাহার কর্ম্মে স্পৃহা নাই, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। অন্নাভাবে তনু তাহার ক্ষীণ।

কলিকাতার রামমোহন হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুলিখিত।
(ভারতবর্ষ—মাঘ ১৩৩৬)

মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা

গত ৫০ বৎসর ধরিয়া আমি বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু শুধু একটি বিষয় আলোচনা করিয়াই আমি সন্তুষ্ট থাকি না। বাঙালী জাতি যে ব্যবসাক্ষেত্রে সকলের পিছনে পড়িয়া যাইতেছিল, তাহা আমি আমার যৌবনকাল হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সেজন্য কলেজে শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নানাবিধ ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার সেই কার্য্য যে আজ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দেহ লইয়াও আমি অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই। আমার গত কয়েক বৎসরের কার্য্যের হিসাব সংবাদপত্রের পাঠকদিগকে নূতন করিয়া বলিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকগণ জানেন যে আমি লোকহিতকর ও জনশিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যব্যপদেশে সারা ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকি। সমগ্র কর্ম্মজীবন শিক্ষকের কার্য্য করিয়া একদিকে যেমন আমি শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা করি, দেশের নানাপ্রকার শিল্পবাণিজ্যের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক হিসাবে অপরদিকে তেমনই আমাকে সকল শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি অবনতির কথাও চিন্তা করিতে হয়। তাহার উপর গত বার তের বৎসর মহাত্মা-গান্ধী-প্রবর্ত্তিত স্বদেশী আন্দোলনের জন্যও আমাকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। আমাদের দেশ এখন সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে। দেশবাসীর দুঃখদুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিলে সময়ে সময়ে আমি হতাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু কর্ম্মীর দল কখনও আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না। আমার কর্ম্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত হইলেও এখন আমি বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে দেশবাসীকে কয়েকটি কথা শুনাইব।

গত ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া আমি দেশের সর্ব্বত্র চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছি যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বাঙালীজাতি অর্থনীতিক হিসাবে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" পুস্তকে বহুদিন পূর্ব্বে আমি যে কথাটি বাঙালী জাতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, আজ—বহু বিলম্ব হইলেও—সকলেই তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে কোন্ পথে লইয়া চলিয়াছে?

চাকরি—চাকরি—চাকরি, উকীল—উকীল—উকীল, ডাক্তার—ডাক্তার—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার—ইহাই আমাদের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই—যদি কোন পিতার তিনটি পুত্র থাকে, তিনি তিনজনকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বানাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কোন পিতাকে যদি তাঁহার বুকে হাত দিয়া বলিতে বলা হয়, তিনি পুত্রকে কি জন্য শিক্ষাদান করিতেছেন, তাহা হইলে জানা যায়—পিতা পুত্রকে হয় (১) হাইকোর্টের জজ, না হয় (২) ডেপুটি বা মুনসেফ—অন্ততঃপক্ষে একটা মোটা বেতনের গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিয়া দিবার পক্ষপাতী। আর একদল পিতা পুত্রকে উকীল, ডাক্তার, বা ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে চাহেন। মজার কথা এই—বড় মোটা চাকরী পাইলে, পিতা পুত্রকে অপর কিছু করিতে দিবেন না। এই যে থোড়-বড়ি-খাঁড়া আর, খাঁড়া-বড়ি-থোড়, এই মনোবৃত্তি আমাদের ভিতর হইতে কিছুতেই যায় না বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি উপরি-উক্ত মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

ভারতের সেন্‌সাস রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই যে, হাজারকরা মাত্র ৮জন ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের চাকরিতে নিযুক্ত। তন্মধ্যে কয়েকজন মাত্র হাইকোর্টের জজ আছেন; আর সিভিলিয়ান, ডেপুটি, মুন্‌সেফ প্রভৃতি ধরিলে আরও ৬।৭ শত লোক পাওয়া যায়। বাকী গভর্ণমেণ্টের চাকরিয়ারা হয় চাপরাসী, আরদালী—না হয় মফঃস্বলে পুলিশের দারোগা বা চৌকিদার। উপরি-উক্ত হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়—একজন তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা কতটুকু? দশ হাজার গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজনেরও হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা সন্দেহ। তাহার পর মুনসেফ, ডেপুটি প্রভৃতির কথা—প্রতি পাঁচ হাজার গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজনের হয়ত মুনসেফ, ডেপুটি চাকরি পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

তাহার পর উকীলের কথা। উকীলের দুর্দ্দশার কথা আমি বহুবার বহুস্থানে বলিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের যুবকগণ দলে দলে আইন কলেজে প্রবেশ করিতেছেন—দলে দলে উকীল হইয়া বাহির হইতেছেন এবং দেশের বেকার সমস্যা বাড়াইতেছেন। প্রত্যেক আদালতেই দেখিতে পাই—মক্কেলের অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা অধিক। কাজেই সে অবস্থায় উকীলদের অন্নসংস্থান হইবে কি প্রকারে?

একটি স্থানের কথাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আলিপুরে সহস্রাধিক

উকীল আছেন। উঁহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনের বেশ ভাল পসার আছে। বাকী শতকরা দশজন কোন প্রকারে ওকালতী দ্বারা অন্নসংস্থান করিয়া থাকেন। এই ত শতকরা মাত্র পনের জনের কথা গেল। বাকী শতকরা ৮৫ জন কি 'বাতাস' খাইয়া থাকেন? আমি অনেক যুবক উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি। তাঁহারা বৎসরে কেহ কেহ দুই শত টাকার অধিক উপার্জ্জন করেন না। অথচ তাঁহাদিগকে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া প্রত্যহ 'পোষাক' পরিয়া ট্রামে বা বাসে চড়িয়া আদালতে যাতায়াত করিতে হয়। আমার নিজের জেলা খুলনাতেও ১০০।১৫০ উকীল আছেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই দুর্দশা দেখিলে দুঃখ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কলিকাতা ও ঢাকায় বৎসরে গড়ে দুই সহস্রাধিক ছাত্র আইন পড়িয়া থাকে। কি জন্য তাহারা আইন পড়িতেছে? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাহারা ঐ প্রশ্নের ভাল জবাব দিতে পারে না। ইহা কি সত্যসত্যই আত্মহত্যা নহে? ডাক্তারগণের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে উকীলদিগের অবস্থার মত হইতে চলিয়াছে। উকীলের ন্যায় দুই চারিজন ডাক্তারের ভাল পসার দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ডাক্তারই বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু এম. বি. পাশ করা ডাক্তার উদরান্ন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইতেছেন। তথাপি মেডিকেল কলেজ বা স্কুলগুলিতে প্রবেশের সময় ভিড় কমে না, ইহাই দেশের অর্থনীতিক অবস্থা।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যাপার চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও জাতির মোহ কাটিতেছে না। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, আজও আমরা সে কথা চিন্তা করি না। যে উচ্চশিক্ষা দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ণয় করিতে পারে না; অধিকন্তু দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করে, সেই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা কি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না? বি. এ. বা এম. এ. পাশ করা ছেলের দল বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন প্রকারে তাহারা জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইতেছে না। অথচ এ অবস্থায় ভিন্ন প্রদেশবাসী অশিক্ষিত লোকগণ বাংলায় আসিয়া অর্থোপার্জ্জন ত করিতেছেই—তাহার উপর অচিরকাল মধ্যে বিরাট ধনী হইয়া উঠিতেছে। বাংলার যুবক সম্প্রদায় এ সকল দেখিয়াও দেখেন না। তাহারা সেই মামুলী চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার কারণ কোথায়? ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী জাতি ত এরূপ ছিল না। এই শ্রমবিমুখতা ও মিথ্যা আত্মসম্মানজ্ঞান কোথা হইতে

আসিতেছে? বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? পিতা বা অভিভাবক তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। পুত্র কলিকাতায় আসিয়া পিতার প্রেরিত অনায়াসলব্ধ অর্থ অপব্যয় করিতেছে। থিয়েটার ও সিনেমায় ভিড় বাড়াইতেছে। কিন্তু তাহার পর? কলেজের পাঠ শেষ করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশের সময় অর্থার্জ্জনের সকল দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া হতাশ হইতেছে। সে আর গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারে না—বিলাসবহুল জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারে না। কাজেই তাহার কর্ম্মজীবন নষ্ট হইয়া যায়। এই আত্মঘাতিনী শিক্ষাপদ্ধতি দেশবাসী কবে বর্জ্জন করিবে?*

—:*:—

চীনে ছাত্র আন্দোলন

আমি চীন ও ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। এই উভয় দেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব্বেকার স্মৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তার দুয়ারে আঘাত করে। এই উভয় দেশের পৌরাণিকতা বৎসরে, যুগে অথবা শতাব্দীতে নয়—এদের পৌরাণিকত্ব শত-সহস্র বৎসরের—যা আমরা সহজে অনুমান, অথবা বিশ্বাস করতে রাজী নই। কেউ কেউ বলে থাকেন এদের পৌরাণিকতার পরিমাণ ৪ হাজার বৎসরের বেশী।

আমি বহু সহানুভূতিশীল ও দরদী গ্রন্থকার—যারা চীনকে ভাল ক'রে জানেন—তাঁদের অনেক বই পড়েছি। তাঁরা চীনের খাঁটি চিত্র এঁকেছেন। চীনের জাগরণ তাঁদের লেখায় জীবনী শক্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠেছে।

প্রথম বিষয়—যা' ইউরোপকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে, তা' হলো—চীনের প্রাচীনত্ব, তার সভ্যতার প্রাচীনত্ব, যে সভ্যতাকে সে তিন হাজার বছর পূর্ব্বেও জিইয়ে রেখেছিল। ইহাই জগতের একমাত্র সাম্রাজ্য, যেখানে জাতিভেদ বা সমাজভেদ নেই। এখানকার লোক বিয়ের জন্য কুলীন-অকুলীন, গোত্র-গোষ্ঠি ইত্যাদির বিচার নিয়ে হট্টগোল বাধায় না; এখানকার আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ বাস্তবিকই একটা ভাব্‌বার বিষয়। এই প্রকার উদারতায় ইসলাম অনেক অগ্রসর।

* 'গৃহস্থ মঙ্গল'—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। 'নবভাবে' উদ্ধৃত।

ত্রিবাঙ্কুর এবং তৎপরে বরোদার দেওয়ান দেশবিখ্যাত রাজনৈতিক স্যার মাধব রাও চীনের বিষয় বল্‌তে গিয়ে বক্তৃতার কোন স্থলে বলেছিলেন—"আমাদের দেশের শতকরা আশি জন দেশবাসী যেভাবে সর্ব্বদিক্ দিয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করছে, তা' আমাদেরই নিজেদের সৃষ্টি করা লাঞ্ছনা। এই দুর্দ্দশা দূর করতে হ'লে আমাদেরই করতে হবে। বাকী শতকরা বিশজন দেশবাসী যে কষ্ট ক'রে জীবন যাপন করছে—সে কষ্টের বোঝা আমরা বিদেশী শাসনকর্ত্তার কাঁধে চাপাতে পারি ; কিন্তু এর প্রতিকারও আমাদেরই হাতে।"

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই চীনের প্রকৃত জীবন জাগরণের সূত্রপাত হয়। কালের মহালীলায় তাদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সেই আলোকশিখা নিভে গিয়েছিল। তাই আবার যুগ-ভেরীর মহানিনাদে তাকে চীনের জলে স্থলে জ্বালবার জন্য তার মহাপ্রাণ সাড়া দিয়ে উঠল। জাপান আপনাকে শক্তিশালী ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মনে ক'রে চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন্দল পাকাতে সুরু করলে। জাপান তখন নববলে বলীয়ান। নূতন শক্তির শিহরণ সে তার প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করতে লাগল। জড়তার মোহ কাটিয়ে কেবল সে টাট্‌কা জীবনের আস্বাদ গ্রহণ আরম্ভ করেছে—এমন সময় চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষা ক'রে নিজেকে যাচাই করতে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগলো। চীনের অবস্থা তখন মুমূর্ষু। থাকবার মধ্যে ছিল তার মান্ধাতার আমলের কতকগুলি সংস্কার, আর 'অচল ফ্যাসান'। এতে চীন জাপানের কাছে একটা বড় রকমের ধাক্কা খেল। জাপান ইচ্ছামত কামান দাগিয়ে চীনকে নাস্তানাবুদ করলে এবং কয়টি বন্দর ও পোতাশ্রয় দখল করে নিলে। চীনের সীমারেখা আস্তে আস্তে কমতে লাগল। অবশেষে সে ফর্ম্মোজা দ্বীপটি পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

লি-হাং চু অন্তর-আঁখি দিয়ে ভবিষ্যতের যে দৃশ্য দর্শন করলেন—তাতে তিনি স্বতঃই ভাবলেন যে, যতদিন না চীন আপনার জড়তার খোলস্‌কে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাচ্যের নবীন ভাবধারা ও কর্ম্মনীতিকে গ্রহণ করবে—ততদিন চীনের এই বেদনার আঘাত থেকে মুক্তি নেই। এর পর থেকেই চীনের রাষ্ট্র জীবনের পরিবর্ত্তনের সুরু হলো।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চীনের কর্ম্মধারা এমনি ক'রে বদলে গেল এবং চীন আপনাকে এমনি করেই কাজে লাগিয়ে দিলো যে, জগৎ বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে তার ঐ পরিবর্ত্তনের ও কর্ম্মের ফল দেখতে লাগলো।

চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ যেমনি এশিয়া এবং ইউরোপের অনেকটা অংশকে

এশিয়ার করতলভুক্ত ক'রে দিয়েছিল—তেমনি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীগণও এশিয়াকে আক্রমণের দ্বারা ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নেবার জল্পনা করতে লাগলেন। জার্ম্মানী থেকে বিসমার্ক বলতে লাগলেন—এশিয়ার অর্দ্ধেক পড়বে ইংলণ্ডের ভাগে, আর অর্দ্ধেক পড়বে রুশিয়ার ভাগে ; এমনি ক'রে এশিয়া ভাগ-বাটোয়ারা হ'য়ে ইউরোপের পেটে তলিয়ে যাবে। তখনই ভাল করে গোলমাল বেধে উঠ্‌ল।

তার পরেই এলো আসল কথা—চীনের যুব-আন্দোলন—যাকে দিয়ে চীন আপনার নিজস্ব সভ্যতাকে ফিরিয়ে পেয়েছে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর চীনের তরুণ তাপসগণ আপনার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের শিহরণ অনুভব করতে লাগল। তারা তাদের দেশকে ভাল করে দেখলো। তাদের জননী জন্মভূমি তাদের দিকে করুণ ও ম্লান আঁখি নিয়ে চেয়ে রয়েছেন। দেশের পরাজয় ও দুর্নামের প্রতিকারকল্পে তাদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে তারা প্রতিজ্ঞা করে বসল, এবং যে জাপান তাদের এমন আঘাত দিয়েছে, সে জাপানের বুকে বসে তাদের মন্ত্র নিতে প্রস্তুত হলো—এক নয়, দুই নয়, বিশ হাজার তরুণ বীর জ্ঞান-সাধনার জন্য জাপানের রাজধানী টোকিও নগর একেবারে জুড়েই বসলো। তাদের উদ্দেশ্য জাপানের শিক্ষা, জাপানের কর্ম্মধারা চীনের প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গৃহে আমদানী করা।

চীনের এ-জ্ঞানসাধনার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে জাপান রোধ করতে সাহস করল না, বরং তার আপন দেশে চীনা ছাত্রদের জন্য বহু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করলো। চীনের জয়যাত্রা সুরু হলো—তরুণরা মনপ্রাণ দিয়ে জাপানে পড়তে লাগল। তাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করলো। মনের মত লোক হয়ে তারা দেশে ফিরল। ফিরে, আমাদের দেশের বিলাতফেরতের ন্যায় সাধারণ সমাজের সহিত বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করলো না। তাদের ঐ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মূলে আমাদের দেশের গোলামীর গোলোক-ধাঁধায় পড়বার প্রবৃত্তি ছিল না—ছিল এতে দেশ-সেবার এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার এক বিরাট কামনা।

দেশের বন্ধন মোচন করাই তাদের জীবন-বিসর্জ্জনের কারণ হওয়ায় তারা জ্ঞান-সাধনার পরবর্ত্তী জীবনে দেশের কাজে আপনাদের জীবনকে নিয়োজিত করলে। দেশে ফিরে তারা চীনকে এই বাণী শুনালে—জাপান যাহা পারবে,—পেরেছে—চীনও তাহা পারবে এবং পারাই তার চাই। এ-নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে দেশের কাজে তারা নামলো—নামবারই মত ক'রে।

তাদের এ-সব ঝোঁক দেখে, জীবনদানের এ-সব মহাদর্শ দর্শন করে জগৎবাসী চমৎকৃত হলো—বাস্তবিকই বুঝি 'দিন' ফিরলো।

এই যে জাপান-ফেরৎ তরুণ তাপসগণ চীনের কলঙ্ক দূর করবার মানসে দেশে বেরুলো—তারা ত আর সরকারী সাহায্য পাবার আশায় ব'সে রইল না। তাদের নিজের খাবার পরবার তারা নিজেরাই যোগাবার বন্দোবস্ত করে নিলে। যাকে বলি আমরা 'মনোহারী' জিনিস তা নিয়ে তারা দেশে বেরুলো। এসব তারা দেশকে খেলনা করে—উপহার দিতে বেরুলো না। এ-সব বেচে তারা খোরাক যোগাবার বন্দোবস্ত করলে—আর দেশের অশিক্ষিত অন্ধদের শিক্ষা ও আলো দেবার যোগাড়-যন্ত্র করলে। সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, তারা নৈশবিদ্যালয়, অবৈতনিক-বিদ্যালয়—সর্বপ্রকার বিদ্যালয়ের পত্তন করে, দেশের লোককে ডেকে ডেকে টেনে টেনে চোখ-ফোটাতে লাগল। এ-সব যে তারা নিজের পড়া শিকেয় তুলে করছিল তা নয়, এসব কাজ তারা অবসর মতই করছিল। গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতে তারা এ-সব কাজ এমনি করে করে যেতো যে—কলেজে ফিরে গিয়ে এ-সবের কথা খপ করেই ভুলে যেত না—এবং যেতো না বলেই তাদের স্থাপিত এ-সব বিদ্যালয় ও পরিশ্রম মাঠে মারা যেত না।

এই অবৈতনিক স্কুলের দ্বারা অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ হাজার দরিদ্র ছাত্র চীনের নানা সহরে শিক্ষালাভ করে মানুষ হ'তে সুযোগ পেয়েছিল। প্রত্যেক মন্দির বিদ্যালয়ে পরিণত হলো; এতে শিক্ষার সাধনা বেশী রকমে সহজ হয়ে পড়লো। পূজার হোমশিখার সঙ্গে জ্ঞানের হোমশিখা সমানভাবে জ্বলে উঠলো।

চীনের ছাত্রদের যদি কলকাতার ছাত্রদের সাথে তুলনা ক'রে গড়-পড়তা মিলিয়ে দেখা যায়, তা হলে' আমরা কি দেখতে পাই? অন্ততঃ কম পক্ষে তের হাজার ছাত্র যারা কলকাতার ইউনিভার্সিটিকে জুড়ে আছে, তারা যদি চীনা-ছাত্রদের ন্যায় মাত্র অবসরটুকু দেশের শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, তাহ'লে তারাও কি চীনাদের মত কাজ ক'রে যেতে পারে না? তারাও কি অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার ছেলেকেও মানুষ করতে পারে না? না হয় স্কুলের কথা ছেড়েই দিলাম। ঢাকায় ১১টি হাই স্কুলের ৪৪শত ছাত্র, আর ইউনিভার্সিটির ১২শত ছাত্র, অন্ততঃপক্ষে চার হাজার ছেলেকেও মানুষ করতে পারে না?—করলে অবশ্যই পারে!

আমাদের যারা ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে সুদীর্ঘ চারিটি মাস ঘুমিয়ে কাটায়, যারা আই. এ., বি. এ. দিয়ে প্রায় তিন মাস খেলিয়ে, বেড়িয়ে কাটায়, অথবা যারা

সাধারণভাবে দীর্ঘ গ্রীষ্মের বন্ধে তাস পিটে, ঘুম দিয়ে, হাই তুলে, গল্প-গুজব ক'রে উড়িয়ে দেয়, তারা যদি এদিকে একটু নেকনজর দেয়, তাহ'লে কি দেশের একটা বিরাট সমস্যার কিঞ্চিৎও সমাধান হ'তে পারে না ?

আমাদের দেশের ভাষা, চীনের ভাষা থেকে অনেকই সহজ। সে ভাষায় তাদের দেশবাসীকেও কথা কহিতে শিখতে হয়। এমনি যে জড়ানো ভাষা এও তারা সহজ করে নিয়েছে—আপনাদের পরিশ্রম অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা। আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষাকে চীনা ভাষার সহিত তুলনা করা যেতে পারে। এই ভাষাকে পরিবর্দ্ধিত করতে, আরো সহজ আকার ও প্রকার দিতে চীনা ছাত্ররা প্রচার করছে, এমন কি অনেক বই লিখেও বিলি করছে।

চীনে ধর্ম্মভেদ নাই—সেখানে বৌদ্ধ, মুসলিম, খৃষ্টান সবাই 'চীনা'। তাদের দেশের নামেই সব চলে যায়। চীনবাসী বাস্তবিক পক্ষেই দার্শনিক গোছের লোক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম্ম নিয়ে থাকবে, অথচ অবাধ মেলা-মেশায় আপত্তিজনক কিছু নেই। সপ্তম শতাব্দীতে কনফুসিয়স্ তাদের যে বাণী দিয়ে গেছেন—তারা আজও সে বাণী ভোলেনি। সে বাণী অনুসরণ করে তারা এখনও চীনা, এখনও কর্ম্মী, এখনও দেশসেবক সবই হচ্ছে। তবু আসলে তারা চীনাই থাকছে; আমাদের মত আগাগোড়া অনুকরণের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়নি।

চীনাদের সর্ব্বসমাজেই আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের প্রচলন বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের জিনিস। ধর্ম্মবিশ্বাসের অনৈক্যের জন্য ইনকুইজিশান্ অথবা অন্যান্য প্রকার পাশবিক অত্যাচার সে দেশে নাই—ইহা ভাব্‌বার বিষয় বটে। সেণ্ট বার্থালমকে মেরে কেমন করেই না তারা ধর্মের গোঁড়ামি দেখিয়েছিল। স্পেনের ইনকুইজিশানের ব্যাপারখানাও সবার জানা আছে। এই তো ছিল পুরাতনের প্রতি লোকের একটা অন্ধ অনুরাগ—একটা যুগ-যুগসঞ্চিত সংস্কার।

টোকিওতে গিয়েই তারা জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাকে থামিয়ে রাখেনি। অধ্যবসায়শীল কৃতী চীনা ছাত্রদের দুহাজার গেল ফ্রান্সে—আর এক হাজার গেল বিলাতে। তারা আমাদের দেশভুক্ত বিলাত ফেরতের মতন কেবল ফ্যাসান নিয়ে ফিরতে সুদূর প্রবাসে যায় নি, তারা গেছিলো—দেশের বন্ধন খুলতে, যা কিছু দরকার তা সঞ্চয় করে, সংগ্রহ করে আন্‌তে। স্বদেশে ফিরে তারা গোলামীর জিঞ্জির গলায় পরেনি। তারা চেয়েছিলো—চীনাবাসীকে নিয়ে এক মহাজাতি গড়ে তুলতে, চেয়েছিলো চীনকে মানুষ করতে।

স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জী ও পরাঞ্জপে আফসোসের সহিত বলেছিলেন যে ভারতবাসী কেন বেশী সংখ্যায় বিলেতে শিক্ষালাভ করতে যায় না? কিন্তু আমি বলি—বিলেত গিয়ে লাভ কি এদের? তারা তো বিলেতী ফ্যাসানের আমদানী ছাড়া আর বেশী কিছু আমদানী করবে না? তবে কিনা ডাঃ ঘোষ, আর মেঘনাদ সাহার ন্যায় ছেলেদের অবশ্যই যে বিলেত যাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। ভারতবাসী ছাত্রেরা যেরূপ কচি বয়সে বিলেত যায়—তাতে মনের সেই তারুণ্য নিয়ে—এইরূপ ফ্যাসান-শেখার তোতাপাখী হয়ে ফেরা কোন তাজ্জবের বিষয় নয়।

আমি একটিও বিলেত ফেরৎ আই. সি. এস. কে দেখছিনে—যিনি ক'বছরের মধ্যে বেশ নাম করে ফিরেছেন, আর দেশে এসে কিছু করছেন! কেবল ব্যারিষ্টার—ব্যারিষ্টার। 'বার' একেবারে ঠেসে গিয়েছে, এক কোণা কোথাও স্থান নেই। যেন পিঁপড়েরই দল আর কি? আমি যদি দিনেকের জন্যও Dictator হতুম, তা'হলে দেখতে—এসব ফৌজদারী আদালতকে একবারে মাটির সমান করে মুছে দিতুম—একবারে পালিশ। দেখ না, আলিপুরের মতন স্থানেও ৮ শত উকীল। বছর বছর আরো ২০-২৫ জন করে বাড়ছেও। ১০-১৫ বছর বাদে কি হবে, তাই আমি ভাবছি।—দেশ যেন উকীলময় হয়ে যাবে—মক্কেল যেন আর মক্কেল থাকবে না!

এই যে বিগত ১৯০৬ সালে টোকিয়োতে পনেরো শ' ছাত্র শিক্ষালাভ করছিলো—তাদের সংখ্যা কত বেড়েছিলো জান? তারা বাড়তে বাড়তে একেবারে পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হয়েছিলো; কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু আরও তাজ্জবের কথা কি জান? তারা যে কেবল সংখ্যাতেই বেড়েছিল তাই নয়—তারা আরো এমন কিছুতে বেড়েছিল যা শুনলে তোমরা অবাকই হবে। এসব ছাত্রের অর্দ্ধেকই আপনার খোরাক আপনারা জোগাতো; বাপ-দাদার কাঁধে ভর দিয়ে তারা চলতে চায়নি। আমাদের দেশের বিলেতপ্রবাসীদের মা-বাপ তো মাসে মাসে চার পাঁচশো করে টাকা পাঠিয়েও ভাবনা চিন্তায় দিন কাটান। চৌদ্দ হতে চল্লিশের মাঝামাঝি ছিল তাদের বয়স। ২৫ হলেই যে বুড়ো হলো, এদের এই অপবাদ ছিলো না।

এ-সব বলা তো অনেকটা হলো—চীনের ছাত্রদের উদ্যম ও উৎসাহ সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছুই জানলে। এখন আমি তোমাদের বলতে চাই, তোমরা কি এ সব সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখবে না? চীনাদের যারা বিদেশ থেকে বিদ্যে

শিখে আসে' তাদের বলা হয় Returned Student, যেমন আমরা বলি "বিলেত ফেরৎ"। চীনা বিলাত-ফেরত আর ভারতবাসী বিলাত-ফেরত সম্বন্ধে কি তোমরা ভাবতে চেষ্টা করবে?

পিকিন, ক্যান্টন, হংকং এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দশ হাজার ছাত্র বিদ্যা শিখে জ্ঞান সঞ্চয় করতো—তা সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মিঃ হর্ণেলের কথায় বেশ বোঝা যায়। তারা বাহির থেকে ভেতরে এসে, দেশের ভেতরকেও গড়ে তুলেছিল। এই ছিল এদের ত্যাগ ও প্রয়াসের বৈচিত্র্য।

চীনের লোকসংখ্যা হলো ৪০৫০ লক্ষ। এদের ভেতরে নিজের জীবনপাত করে জাগরণ আনয়ন করা এত সহজ নয়। তবু ছাত্রদের অধ্যবসায়ে তারা কত যে জানবার এবং বুঝবার স্থযোগ পেয়েছিলো তা' তোমাদের কত করে বলবো?

চীনের ছাত্ররাই দেশের লোককে দেশের কথা বুঝাবার জন্য চার শ' কাগজ চালাত। দেশের লোক এতে কি পেতো জান? তার মনের সত্যিকার বাণী—সত্যিকার ডাক পেতো। দেখ তো আমাদের দেশের ছাত্রদের অবস্থা—একটিও কি কাগজ আছে? যা দিয়ে তারা আপনাদের মনকে লোকের কাছে প্রকাশ করে?

আমাদের দেশে তথাকথিত ভদ্রলোকদের কথা ত্যাগ করে মধ্যবিত্তদের কথা ধরলে দেখা যায়—এদের অনেকটা চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আর সাধারণ সমাজের কথা ত এখানে আসতেই পারে না। ছেলেদের খরচ দিন দিন যে ভাবে বাড়ছে তাতে মধ্যবিত্ত লোকদেরও যে আর কদিন ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে তা মনে হয় না। চীনে সবাই সবার কথা ভাবে, একে অন্যের সাথে মিলে। পণ্ডিত মূর্খের সঙ্গে মেশে; কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যে—মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বিদ্বান জানে, কি করে অশিক্ষিতদের কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চলবে, এবং কি করে এদের ঘৃণা করতে হয়। এখানেই সব গলদ্।

প্রেসিডেন্সি, ইসলামিয়া, রাজসাহী, কটক ইত্যাদি সরকারী কলেজগুলোতে ছাত্রদের মাথা পিছু সরকার এবং দেশ যা খরচ করছে তা যে ছাত্রদের দ্বারা আবার ফিরে পকেটে আসবে তেমন আশা করাই বৃথা। যত প্রকার উন্নতির কাজ চীন দেশে চালানো হয়, সবই মধ্যবিত্তদের দ্বারাই সাধিত হয়। কিন্তু বাংলার মধ্যবিত্তগণ—সে সব বিষয়ে একেবারে পণ্ডিত;—পরিশ্রমের কাজ এঁরা একেবারে গোলায় তুলে রেখেছেন—যেন গোলারই ধান।

বাংলায় জেলা সমূহে ধান, পাট ইত্যাদি ফসল জন্মে। ফরিদপুরে সব চাইতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ধান, পাটে প্রায় বিক্রয় হয় ১২ কোটি টাকা। আর লোক হলো ২২ লাখ, মাথা পিছু আয় দাঁড়ায় ৫২৲ টাকা করে। এই আয় কি যথেষ্ট? আর এই আয় কি বাঙালী রাখতে পারে? বাংলার কৃষক-সমাজের অবস্থা আজ কি যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এই যে প্রজাদের চৌষট্টি হাজার* খাওয়া হয়, তার পরিবর্তে দেওয়া হয় কি, তার কি কোন হিসেব আছে? হিসেব আমরা কোন্ দিকেই বা করি? আজ হিসেবের দিন এসেছে—হিসেব করে আমাদের বাঁচতে হবে—এর জন্য অনেককে মরতেও হবে। এই বিপুল দায়িত্ব নেবার জন্য যদি কেহ প্রস্তুত হয় তবে জেনো এরা তরুণ—এরা ছাত্র—এরাই বিধাতার বরপুত্র।†

বাঙালীর ধ্বংসের কারণ

বাঙালী তুমি ধ্বংস-সাগরে ঝাঁপ দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ?

প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাঙালীর অক্ষমতা, শ্রমবিমুখতা এবং নিশ্চেষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা যাহাদিগকে মেড়ো, ছাতুখোর ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকি, তাহারাই সুদূর রাজপুতনার মরু-প্রান্ত হইতে রেলপথ হইবার পূর্ব্বে পদব্রজে লোটাকম্বল সম্বল করিয়া, সত্যসত্যই ২।৪ পয়সার ছাতু খাইয়া, এই বাঙলা দেশের বুকের উপর আসিয়া বসিয়াছে এবং শতবর্ষ ধরিয়া ক্রমান্বয়ে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য আয়ত্ত করিয়াছে। তবুও আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহাদের পারদর্শিতার কথা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা দু'পাতা *Shakespeare, Milton* এর পদ আওড়াইয়া বা **Differential Calculus** এর পাতা উল্টাইয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পড়ি, এবং

---

* বাংলা গভর্নমেন্টের তৎকালীন মন্ত্রীর বেতন ছিল ৬৪,০০০৲ টাকা।

† আচার্য্য দেবের ঢাকাহলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ, আমীন উদ্দীন আহম্মদ কর্ত্তৃক অনুলিখিত। ব্যবসা ও বাণিজ্য—আষাঢ়, ১৩৩২।

মাড়োয়ারী প্রভৃতি অ-বাঙালী ভ্রাতাগণকে হীন ও মুরুব্বীয়ানার চক্ষে দেখি। ইহার পরিণাম এখন হাতে হাতে ফলিতেছে।

৩০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদের উচ্চশিক্ষাভিমানী যুবকবৃন্দ যাঁহারা Political Economics বা অর্থনীতিমূলক বিদ্যা অধিগত করিয়াছেন—তাঁহাদের মুখে কেবলই শুনা যায় মাড়োয়ারী মাত্র middleman ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, কেবল মাড়োয়ারী নয়—ভাটিয়া, গুজরাটী, কচ্ছ অঞ্চলের মেমনগণ এবং বোম্বাই-এর বোরা বা খোজা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িগণ কেবল middleman হইয়া এই বাঙলা দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ কেন, কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করে।[1]

এবার পাটের ব্যবসার কথা ধরা যাউক। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যবসা সাহা, তিলি, কাপালী প্রভৃতি জাতির একপ্রকার একচেটিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ ক্রমশঃ গদিয়ান হইয়া উঠিল। এই সুবর্ণসুযোগে কর্ম্মঠ, শ্রমপরায়ণ মাড়োয়ারী ছাতুখোর হইয়াও ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে বাঙালী ব্যবসায়িগণকে অপসারিত করিতে লাগিল। আজ শুধু দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙালী—হিন্দু-মুসলমান—মাত্র সামান্য ব্যাপারী বা ফড়িয়া হিসাবে যাহা কিছু রোজগার করে। ১৪।১৫ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। যখন অসহযোগ আন্দোলন তীব্রভাবে চলিতেছে—তখন আমি মাদারীপুর অঞ্চলে সফরে বাহির হই। সেই সময় সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম যে "As Madaripur appeared in sight my heart sank within me"—অর্থাৎ যখন মাদারীপুরে ষ্টিমার লাগিল তখন নিরাশ হইয়া পড়িলাম। সেখানে দেখিলাম পাটের গুদামগুলি হয় ইউরোপীয় বা আর্ম্মেনীয়, না হয় মাড়োয়ারীদিগের দ্বারা অধিকৃত। আমরা সাধারণের অতিথিস্বরূপ সেখানকার লোন অফিস বা ব্যাঙ্কে অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রাতে সকল শ্রেণীর লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমি যখন পাটের কথা উল্লেখ করিলাম তখন একজন মাতব্বর সাহা আমাকে বলিলেন—'কর্ত্তা, ঐ যে প্রকাণ্ড গুদামের কথা বলিতেছেন উহা আমাদের পিতৃপুরুষের ছিল। কিন্তু স্বর্গীয় কর্ত্তারা যখন চলিয়া গেলেন তখন আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ ঢুকিল এবং এখন ঐ গুদামগুলি মাড়োয়ারীদিগকে ভাড়া দিয়াছি।" আমি শুধু ঐ স্থানের কথা বলিতেছি না। বাঙলা দেশের প্রধান প্রধান গঞ্জগুলি এবং আমদানি রপ্তানির কেন্দ্রস্থলগুলিতে বর্ত্তমানে খোঁজ করিলে বোঝা যায় যে

আমদানি রপ্তানিঘটিত সমস্ত ব্যবসায়ই অ-বাঙালীর করতলগত হইয়াছে এবং হইতেছে। ১৯২২ সালে যখন উত্তরবঙ্গে মহাপ্লাবন উপস্থিত হয়, তখন আমরা ঐ অঞ্চলে অর্থাৎ আত্রাই, সান্তাহার, বগুড়া, তালোরা প্রভৃতি স্থানে সাহায্যদান-কেন্দ্র (Relief Centre) স্থাপন করিয়া আসি। ঐ সব স্থানে তখন হইতেই প্রায় বৎসরে ২।১ বার খাদি প্রস্তুত পরিদর্শন করে 'এবং বর্ত্তমানে ঢেঁকি ছাটা চাউল, খাঁটি সরিষার তৈল ও গব্য ঘৃত প্রভৃতি উৎপাদন তদারক করিবার জন্য গমন করিয়া থাকি। এই সব সূত্রে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। উত্তরবঙ্গের সমস্ত আমদানি-রপ্তানি মাড়োয়ারীদিগের করতলগত। সেখানকার যাবতীয় রপ্তানি মাল অর্থাৎ ধান, পাট, কলাই প্রভৃতি যাহা ক্ষেতে উৎপন্ন হয়, তাহা সবই উহাদের হাতে এবং যাবতীয় আমদানি মাল—কেরোসিন, লোহালক্কড়, এমন কি খৈল পর্য্যন্ত সমস্তই মাড়োয়ারীদিগের দ্বারা সরবরাহ হইয়া থাকে।

যাহা পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান ধনসম্পদ, শুধু সেই পাটের কথাই ধরা যাউক। ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত পাটের বাজার খুব গরম ছিল, এমন কি ২৫।৩০ টাকা পর্য্যন্ত মনকরা দর উঠেছিল। তাহার পর ৫।৭ বৎসর বড় মন্দা যাইতেছে। যখন বাজার গরম ছিল তখন সমস্ত বাংলা দেশ হইতে অন্যূন চল্লিশ কোটি টাকার পাট রপ্তানি হইত। রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি ইউরোপীয় সওদাগরগণ এবং কয়েকজন আর্ম্মেনিয়ানকে বাদ দিলে সমস্ত middleman হইতেছে মাড়োয়ারী। তাঁহারা এই middleman স্বরূপ কত কোটি টাকা উপায় করেন তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে ধরিলে ৩।৪ কোটি টাকার কম হইবে না।

১৯২৩ সালে আমি একবার সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সমভিব্যাহারে সফর করিতে বাহির হই। মুর্শিদাবাদ ছাড়াইয়া গেলে একজন হ্যাটকোটধারী বাঙালী আমার গাড়ীতে উঠিলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আমি আপনার একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কৃষিজাত দ্রব্য, যথা—ধান, চাল, কলাই, সরিষা ইত্যাদি কাহাদের মারফৎ রপ্তানি হয়? তিনি উত্তরে বলিলেন—"আমি একজন রেলের কর্ম্মচারী; আমার কাজ হইতেছে কি উপায়ে গরুর গাড়ী ও নৌকা-সংযোগে মাল বড় বড় রেলষ্টেশনে আসিয়া রপ্তানির সুবিধা হয় তাহার ব্যবস্থা করা। এখানকার যাবতীয় ভূষিমাল মাড়োয়ারী ও আজিমগঞ্জের বড় বড় জৈন সওদাগরগণ কর্ত্তৃক বাহিরে চালান যায়।"

কালিদাসের পাখী

সাহিত্যরসিক কাব্যামোদিগণ বহুদিন যাবৎ বহুভাবে আলোচনা করিয়া মহাকবি কালিদাসের নানামুখী কবিতা-প্রতিভার সহিত সাধারণের পরিচয় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু একটা দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই। মহাকবি নায়ক-নায়িকার পরিবেষ্টন বা background-রূপে প্রকৃতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও যে তাহা নিখুঁত ও নির্ভুল তৎপ্রতি কাহারও তেমন মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কালিদাস-সাহিত্যের এই অনালোচিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি, বিশেষতঃ মহাকবি বর্ণিত পাখীগুলির দিকে আমাদের দেশের সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা।

ডাঃ লাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পক্ষিতাত্ত্বিক হিসাবে সকলের নিকট সুপরিচিত। তিনি বস্তুতঃ লক্ষ্মী-সরস্বতীর দুর্লভ মহামিলন সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন। আশৈশব ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, স্বয়ং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও ডাঃ লাহা আপনার একনিষ্ঠ সাধনার বলে বাণীর বরলাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান-স্পৃহা প্রতিনিয়ত বাণীর মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া আসিতেছে। বহু বৎসর যাবৎ তিনি পক্ষিতত্ত্বের গবেষণায় নিরত আছেন। তাঁহার রচিত মৌলিক প্রবন্ধসমূহ পাশ্চাত্য জগতেও তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছে। গবেষণার সুবিধার জন্য—পাখীদের হাবভাব, চালচলন ও আহার-বিহারের রীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে তিনি কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আগরপাড়ায় এক সুবৃহৎ 'পক্ষিভবন' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় সহস্র সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে তিনি যে দুর্লভ পক্ষিসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভারতে কেন সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে অদ্বিতীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইবার যোগ্য। এই পক্ষিভবনটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তাঁহাকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়। পক্ষিভবনটির বিশেষত্ব এই যে, এখানে পাখীগুলিকে ঠিক বন্দীর মত শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা হয় নাই। বাহিরের মুক্ত আকাশে তাহারা যেমন স্বাধীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত, এইখানে থাকিয়াও যাহাতে তাহারা যথাসম্ভব তেমনি অবাধ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের আনন্দলাভ করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দু-একটি কথায় বর্ণনা করিয়া ইহার সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মানো সম্ভবপর নয়; কেবল স্বচক্ষে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় কি মনোরম আশ্রম সদৃশ এই স্থান! যে দেশে ধনীর বিত্ত—মাত্র ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যয়িত হয়, সেখানে জ্ঞানাহরণের জন্য ধনকুবেরের বিপুল অর্থের এই সদ্ব্যয় যথার্থ-ই প্রশংসনীয় এবং আমাদের দেশের ধনিগণের অনুকরণীয়।

ডাঃ সত্যচরণ কালিদাসের পক্ষিতত্ত্ব লইয়া বহুকাল যাবৎ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ পূর্ব্বে সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর তাঁহার 'পাখীর কথা' নামক গ্রন্থেও এতৎসম্পর্কীয় আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কালিদাস বর্ণিত বিহঙ্গগুলির সম্যক্ তথ্য নির্ণয় হয় নাই। সত্যচরণ তাঁহার 'কালিদাসের পাখী'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—আজকালকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার যুগে পক্ষিবিজ্ঞান যেরূপ প্রসারলাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে পক্ষিতত্ত্বের নূতন আলোক-রশ্মিপাতে মহাকবি বর্ণিত পাখিগুলির রহস্যোদ্‌ঘাটনে বিশেষরূপ সহায়তা হয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি নূতন করিয়া বিশদ গবেষনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'কালিদাসের পাখী' এই গবেষনার ফল। সমগ্র কালিদাস-সাহিত্য হইতে যেমন নায়ক-নায়িকাকে বাদ দেওয়া যায় না,তেমনই সেই নায়ক নায়িকার জীবন-নাট্যের সঙ্গে যে সব পাখী ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেও একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই গ্রন্থে ডাঃ সত্যচরণ সেই সমস্ত পাখীর বিক্ষিপ্ত পরিচয়সমূহ একত্র করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিহঙ্গমগুলি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

কালিদাস-সাহিত্যে ঋতুবিশেষে বিশেষ বিশেষ পাখীর আবেগ, উৎকণ্ঠা ও মুখরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেন এমন হয়, কোন্ অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায়—কিসের মাদকতায় তাহাদের প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন ঘটে, ডাঃ লাহা বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা অতি সরলভাবে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘদূতে দেখিতে পাই, বর্ষা ঋতুর আগমনে মেঘের অভ্যুদয়ে রাজহংসগণ মেঘের সঙ্গীরূপে মানস যাত্রা করিয়াছে—

তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদ পাথেয়বন্তঃ
সংপৎসন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ॥

(কালিদাসের পাখী, ৪ পৃষ্ঠা)

বর্ষাগমে ভারতের জলাভূমি হইতে উৎকণ্ঠিত রাজহংস বিসকিসলয় পাথেয় সংগ্রহ করিয়া হিমাচল অতিক্রম করিয়া কৈলাসের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু বর্ষাপগমে শীত ঋতুতে এই রাজহংস যখন ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন তাহার সেই উৎকণ্ঠার উল্লেখ দেখা যায় না। সে যেন তখন মানসসরোবরের

স্মৃতিটুকুমাত্র লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ; তাই মহাকবি তখন তাহাকে 'মান সোৎক' না বলিয়া মাত্র 'মানস রাজহংসী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (কালিদাসের পাখী, ৫ পৃষ্ঠা)। আসন্ন বর্ষায় দশার্ণ গ্রামে যে হংসের সাক্ষাৎলাভ হইল তাহার সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজাম্বুবনান্তাঃ
সংপৎসন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসাঃ দশার্ণাঃ॥ (কা-পা, ৫ পৃ)

এখানে দেখা যাইতেছে যে, মানসযাত্রী হাঁসের ঝাঁক দশার্ণ গ্রামে কতিপয় দিন স্থায়ী হইল। আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে উৎকণ্ঠিতচিত্ত হংসের মানসযাত্রা-কালে পথিমধ্যে এইরূপে বিলম্ব করিবার কারণ কি? ডাঃ লাহা প্রশ্নচ্ছলে ইহার উত্তর দিয়াছেন—"যে বিসকিসলয় পাথেয়টুকু সম্বল করিয়া হাঁসের ঝাঁক মানসযাত্রা সুরু করিয়াছিল, সেটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। পথের মধ্যে আবার কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া কি স্থানে স্থানে তাহাদের এক আধ দিন থাকিতে হয়? তাই আসন্ন বর্ষায় মানস যাত্রার পথে দশার্ণ গ্রামে এই হাঁস এখন কতিপয় দিন কি স্থায়ী?" (কা-পা, ৫-৬ পৃ)।

পক্ষিতত্ত্ববিৎ বলেন—খাদ্যাভাবের তাড়না ও প্রজনন-ঋতুর প্রেরণাই পাখী-দের যাযাবরত্বের বিশিষ্ট হেতু। এই কারণেই যে স্থানের জলবায়ু এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের আহার্য্যসংগ্রহের বা সন্তানজননের অনুকূল হয় হংস-গুলি তথায় প্রব্রজন করে। বস্তুতঃ বর্ষাগমে কৈলাস এবং তাহার পাদদেশস্থিত মানস সরোবর 'যে নানা হংসের আবাসভূমি * * * অনেকেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন" (কা পা, ১০-১১ পৃ)। কিন্তু 'যদি কোন উপায়ে—নৈসর্গিক অথবা কৃত্রিম—তাহাদের অনুকূল আহার-বিহার ও সন্তানজননের ব্যবস্থা কোথাও থাকে, কতিপয় দিনস্থায়ী যাযাবর পাখীদের কেহ কেহ তথায় দীর্ঘদিনস্থায়ী হইয়া পড়ে (কা-পা, ৯ পৃঃ)। কালিদাসও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মেঘদূতে অলকামধ্যবর্তী যক্ষের উদ্যানে হংসগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়—

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসংসন্নিকৃষ্টম্
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগত শুচবস্তমপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ॥ (কা-পা, ৯পৃ)

মানসসরোবর অদূরবর্তী হইলেও হংসগুলি আসন্ন বর্ষায় বাপীসমূহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রয়াসী হইল না।

বিভিন্ন সংস্কৃত অভিধান ও তাহাদের টীকাকারগণের বর্ণনা ও মতামত আলোচনা করিয়া ডাঃ লাহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, Bar-headed Goose [Auser idious (Lath)] ও কালিদাসের রাজহংস একই বিহঙ্গ। পক্ষিতত্ত্ব-বিদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কৈলাস অথবা হিমাচলের হ্রদ বিশেষই সম্ভবতঃ ইহাদের প্রজননভূমি (কা-পা, ১৭ পৃঃ)।

মেঘদূতে কালিদাস প্রজননশীল হংসের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। ঋতুসংহারে কিন্তু তিনি নানা ঋতুতে বিভিন্ন অবস্থায় হংসকে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখিবার সুযোগ আমাদের দিয়াছেন। ডাঃ লাহা বলিতেছেন—এদেশের নিসর্গচিত্রের বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে একই বিহঙ্গের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়; কিন্তু দেশকালভেদে সেই বিহঙ্গের হাবভাব, আহার বিহার ও চালচলনে যে তারতম্য ঘটে মহাকবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে তাহা এড়াইয়া যাইতে পারে নাই" (কা-পা, ভূমিকা)।

নিদাঘ প্রকৃতির অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন হংসের সন্ধান আমরা ঋতুসংহারে পাইয়াছি আসন্ন বর্ষায় যাহার মানসযাত্রার চিত্র মেঘদূতে অঙ্কিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের নদী বক্ষে সন্তরণশীল সেই হংসের ছবি রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই। শরতকালে হংসমালার গঙ্গার শোভাবর্দ্ধনের কথা কবি উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গার আশীর্ব্বাচন হিসাবে মরালের কূজন শ্রুত হইতেছে—

সংমিলদ্ভির্মরালৈঃ সা কলং কূজদ্ভিরুন্মদৈঃ
দদে শ্রেয়াংসি— (কা-পা, ১২২পৃ)

রঘুবংশের যে দৃশ্যে বিভিন্নপ্রবাহা গঙ্গাযমুনার মিলন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে মহাকবি অতিধূসরপক্ষ কাদম্ব ও অপেক্ষাকৃত শুভ্রতরপক্ষ রাজহংস এই দুই জাতীয় হংসের ঝাঁক নদীবক্ষে পাশাপাশি মিলিত হইলে যেমন দেখায় সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডাঃ লাহা বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ "এই দুই জাতীয় হংসই নদীপ্রিয়" (কা—পা, ১২৪ পৃ)। তিনি কাদম্বের পরিচয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Grey Lag Goose—Auser auser (Linn.)

কালিদাস চাতকের সহিত মেঘের নিবিড় সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘদূতের দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইতে না হইতেই তাহার বামভাগে মধুরভাষী চাতকের কূজন শোনা গেল—

বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ (কা—পা, ৫২ পৃঃ)

ডাঃ লাহা বলিতেছেন—'বর্ষাকালই ইহার গর্ভাধান কাল এবং এই সময়ে সে এত মুখর হয় যে, তাহার রব ও কাকলি অনবরত শুনিতে পাওয়া যায়' (কা—পা, ৫৫ পৃঃ)।

রঘুবংশেও মেঘের সহিত চাতকের নিবিড় সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই—

অম্বুগর্ভোহি জীমূতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে।

পুনশ্চ—

প্রবৃদ্ধ ইব পর্জ্জন্যঃ সারঙ্গৈরভিনন্দিতঃ॥ (কা—পা, ১০০ পৃঃ)

সারঙ্গ এবং চাতক একই পাখী (কা-প, ১০৮ পৃষ্ঠা)। ডাঃ লাহা বহু তথ্যের সমাবেশ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা cuckoo বংশের clamator jacobinus (Bodd) বিহঙ্গ। চাতক কেবল মেঘ হইতেই বারিবিন্দু গ্রহণ করে। নদী সরোবর হইতে জলপান করে না, আমাদের দেশে এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি থাকিলেও মহাকবি কিন্তু এইরূপ সংস্কারের পোষকতায় কিছু বিবৃত করেন নাই। অভিধানকারগণ যে চাতক অর্থে বলিয়াছেন—"চততি যাচতে সতন্তোমেঘম্" (৫০ পৃঃ)। মনে হয়, মহাকবি যেন তাহা ঠিক মানিয়া লন নাই। কারণ তিনি চাতককে শুধু বর্ষাতেই মুখর চিত্রিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন শারদ মেঘের ডাক শুনিয়া চাতক মুখর হইয়া উঠে না—"স্বত্যস্ততে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নদতি চাতকোঽহতি" (কা-পা, ২২০ পৃঃ) এই বর্ণনা হইতে বিহঙ্গমটির স্বভাব বেশ বুঝা যাইতেছে। "এই যে মহাকবি চাতকের ভিন্ন আচরণের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অম্ভোবিন্দু ব্যতীত অন্য কোনও বারি সে তৃষ্ণানিবারণের জন্য গ্রহণ করে না এরূপ সংস্কার নির্ব্বিচারে তাঁহার চিত্তে স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না" (কা-পা, ২২৯ পৃঃ)। কিন্তু এদেশের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের অনেকে কালিদাস ও চাতক সম্বন্ধীয় কবিপ্রসিদ্ধির সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটির নির্দ্দেশ করেন—

(১) অয়মরবিচারেভ্যশ্চাতকৈর্নিস্পতদ্ভি
হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরিভবানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনিয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমি॥ (কা-পা, ২২১ পৃঃ)

(২) অন্ত বিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্বীক্ষমানাঃ॥ (কা-পা, ৫২ পৃঃ)

ডা, লাহা এই সকল পণ্ডিতগণের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বহু আলোচনা এবং যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, উক্ত শ্লোক দুইটির মধ্যে

দ্বিতীয়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে। (কা-পা, ২২৯ পৃঃ), এবং প্রথমটির সুসঙ্গত পাঠান্তর পাওয়া যাইতেছে (কা-পা, ১২৬)। সুতরাং কালিদাস উক্ত কবি-প্রসিদ্ধি সমর্থন করিতেন একথা বলা চলে না।

ঋতু সংহারে ও মালবিকাগ্নিমিত্রে কারণ্ডবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ্ডব প্রকৃতপক্ষে কোন্ পাখীর নাম ইহা লইয়া আমাদের দেশে একটা অমীমাংসিত সমস্যা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অভিধানকারগণ ইহাকে হংসবিশেষ বলিয়াছেন, কেহ কেহ ইহার পানকৌড়ি অথবা জলপিপি পরিচয় দিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার কিন্তু ইহাকে হংস বিশেষ বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু আরও লিখিয়াছেন,—"অন্যেকর হয়মাহুঃ। উক্তঞ্চ কারণ্ডবঃ কাকবক্ত্রো দীর্ঘাঙ্ঘ্রিঃ কৃষ্ণবর্ণবর্ণভাক্"। অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বরও বলিয়াছেন—"অয়ং কাকতুণ্ডো দীর্ঘপাদঃ কৃষ্ণবর্ণঃ" (কা-পা, ৯৭পৃঃ)। কারণ্ডবের এই বর্ণনা দুইটির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করিয়া এবং প্রত্যেক শব্দটি বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন পাখিগুলির ঠোঁটের বিভিন্ন চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া ডাঃ লাহা দেখাইয়াছেন কারণ্ডব হংসবিশেষ অথবা পানকৌড়ি বা জলপিপি হইতে পারে না ; ইহা জলকুক্কুট বা coot, বৈজ্ঞানিক নাম Fulicaa. atra liw (কা-পা, ১০০ পৃঃ)। বহু বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি উক্ত সংস্কৃত বর্ণনার সঙ্গে cootএর সামঞ্জস্য নিরূপণ করিয়াছেন। নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়—"তপ্তং বারি বিহারতীর নলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে" (কা-পা, ২৩৫ পৃ)। এই শ্লোকাংশটুকু অবলম্বন করিয়া ডাঃ লাহা বিহঙ্গটির স্বভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন ; কারণ্ডব জলচর পাখী—মধ্যাহ্নে জলাশয়ের তপ্তবারি ত্যাগ করিয়া সে তীরসন্নিকৃষ্ট নলিনীর অপেক্ষাকৃত ছায়া-শীতল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পক্ষিচরিত্রের এইপ্রকার ছোটখাটো ব্যাপারগুলিও যে কালিদাসের চোখ এড়ায় নাই, ডাঃ লাহা এই তথ্যটির প্রতি পুনঃ পুনঃ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

'শ্যেন' কি যে পাখী তাহা লইয়াও আমাদের দেশে সমস্যার অন্ত নাই। সাধারণ সংস্কারে আমরা গৃধ্র ও শ্যেনকে অভিন্ন মনে করি। মহাকবির রচনায় শ্যেন পক্ষীর আচরণের বিবৃতি পাওয়া যায়।

শিরাংসি বরয়োধানামর্দ্ধচন্দ্রহৃতান্তনম্
আজধানা ভূশং পাদৈঃ শ্যেনা ব্যানশিরেনবঃ॥ (কা-পা, ১৫৯ পৃ)

শ্যেনপক্ষীগৃহীত হতসৈন্যের ছিন্ন মস্তক রণস্থলের উপরে সর্বত্র দেখা যাইতে লাগিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"বাস্তবিক রণস্থলের দৃশ্য হইতে এই রক্তমাংসপ্রিয়

শ্যেনকে বাদ দেওয়া চলে না" (কা-পা, ১৬০ পৃ)। গৃধ্র ও শ্যেনকে অভিন্ন বিহঙ্গ মনে করিলে মহাকবির উপরিউক্ত বর্ণনা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ "পক্ষিবিজ্ঞানে গৃধ্র-বংশের কোনও পাখীর শিকারসংগ্রহ বিষয়ে উল্লিখিত শ্যেনপ্রকৃতির সহিত সাম্যের আভাস পাওয়া যায় না" (কা-পা, ১৬৫ পৃ)। কিন্তু শ্যেনকে গৃধ্র হইতে পৃথক করিয়া অন্য (Faconidal) বংশভুক্ত বলিয়া গণ্য করিলে কাব্যবর্ণিত আবেষ্টনে হতসৈন্যের ছিন্নমুণ্ডের প্রতি ইহার আক্রমণ সহজে উপলব্ধি করিবার কোনও অন্তরায় দেখা যায় না" (কা-পা, ১৬৩ পৃ)। কালিদাসও গৃধ্র বর্ণনায় শ্যেনের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পদনখাগ্রসাহায্যে তাহার শিকার বা আহার্য্যসংগ্রহের কথা বলেন নাই। (কা-পা, ১৬৫ পৃ)। মহাকবি শ্যেনের বিরস চীৎকারের উল্লেখ করিয়াছেন—

বিভিন্ন ধ্বনিনাং বাণৈর্ব্যাথার্থমিব বীক্ষণম্।
ররাস বিরসং ব্যোম শ্যেন প্রতিরবচ্ছলাৎ॥ (কা-পা, ১৬২ পৃ)

রঘুবংশে শ্যেনের পক্ষের বর্ণ সম্পর্কে দেখিতে পাই—

শ্যেনপক্ষপরিধূসরালশঃ সান্ধ্যমেঘরুধিরার্দ্রবাসসঃ। (কা-পা, ১৬৫ পৃ)

ইংরাজী পক্ষিতত্ত্বের গ্রন্থেও শ্যেনের বিরস কণ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়; মহাকবি বর্ণিত উহার পরিধূসর পক্ষও পক্ষিতত্ত্ববিৎ সমর্থন করিয়াছেন। শ্যেনের বর্ণে greys and browns predóminating (কা-পা, ১৬৬ পৃ) এবং Falconida বিহঙ্গের কণ্ঠস্বর unúsually harsh, ayelp, or scream (কা-পা, ১৬৬ পৃ), এই স্বরবৈশিষ্ট্যের দ্বারাও শ্যেনকে গৃধ্র হইতে পৃথক করা সহজসিদ্ধ হয় (কা-পা, ১৬৬ পৃ)। নাটকে গৃধ্রের পরিচয় দেখিতে পাই,— 'মণ্ডলশীঘ্রচার',' 'বিহগতস্কর,' 'বিহগাধম,' 'শকুনিহতাশ,' 'ক্রব্যভোজন' বলিয়া ইহাকে আখ্যাত করা হইয়াছে। পূর্বোদ্ধৃত শ্যেনের এবং গৃধ্র সম্পর্কে ঐ সকল বিশ্লেষণের সম্যক আলোচনা করিয়া ডাঃ লাহা শ্যেনকে Falcon এবং গৃধ্রকে Vulture বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।*

ময়ূরও হংসের ন্যায় মহাকবির অতি প্রিয় বিহঙ্গ বলিয়া অনুমান হয়। মেঘদূত, ঋতুসংহার, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব,' অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র—আলোচ্য প্রত্যেক গ্রন্থখানিতেই ময়ূরের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ূরের রূপবর্ণনা—তাহার সজল নয়ন, শুক্ল অপাঙ্গ, উজ্জ্বল রেখাবলয়সমন্বিত স্ফুরিতরুচিবর্হ, নীলকণ্ঠ, তাহার কেকাধ্বনি ও নয়নরঞ্জন অপরূপ নৃত্য, তাহার বাস ও বিহার-ভূমি কবির তুলিকায় অতি নিখুঁত ও অনুপমরূপে

চিত্রিত হইয়াছে। কবিবর্ণিত এই সকল বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া এবং তৎসম্পর্কে প্রামাণিক পক্ষি-তত্ত্বের গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ডাঃ লাহা ময়ূরকে Pavo Cristatus (Linn) বিহঙ্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জালোদ্গীর্ণৈরুপ চিতবপুঃ কেশ সংস্কারধূপৈঃ
বন্ধুপ্রীত্যা ভবন শিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ। (কা-পা, ৩০ পৃ)
কলাপিনাং প্রাদ্যবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু
—গোবর্দ্ধন কন্দরাসু। (কা-পা, ১৪১ পৃ)

এই শ্লোক দুইটি মেঘের সহিত ময়ূরের নিবিড় সম্পর্কের পরিচায়ক। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বর্ষাঋতুই ময়ূর-ময়ূরীর দাম্পত্যলীলার প্রশস্ত সময়। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোনও পক্ষিতত্ত্ববিৎ অস্বীকার করিতে পারেন না (কা-পা, ৪২ পৃ)। মেঘসন্দর্শনে পর্বতে পর্বতে ইহার আনন্দনৃত্য বর্ষার নিসর্গশোভার একটি অত্যন্ত বাস্তব অঙ্গ। এই সময়ে ময়ূরীর সম্মুখে ময়ূরের কলাপবিস্তার এবং নৃত্য তাদের দাম্পত্যজীবনের আরম্ভের প্রাক্ মিথুন-লীলা সূচিত করে। (কা-পা, ১৪২ পৃ)

অলকায় অশোকবকুলতলে শিখীর জন্য বাসযষ্টিরচিত ভবন দেখিতে পাই—

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টির্মূলে
বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ প্রকাশৈঃ। (কা-পা, ৪৫ পৃ)

বিক্রমোর্বশী নাটকেও রাজপ্রাসাদের মধ্যে ময়ূরের বাসযষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়—

উৎকীর্ণাইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণঃ। (কা-পা, ২৪৫ পৃ)

মহাকবি এই বাসযষ্টির ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া তৎকালীন ময়ূরপালন প্রথার সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন।

ময়ূরের নিবাসবৃক্ষের উল্লেখও কবি করিয়াছেন—

স পল্বলোত্তীর্ণ বরাহযুথাত্যাবাস বৃক্ষোন্মুখবর্হিনানি।
(কা-পা, ১৪২ পৃ)

চন্দ্রপাদজনিত প্রবৃত্তিভিশ্চন্দ্রকান্তজলবিন্দুভির্গিরিঃ।
মেখলাতরুষু নিদ্রিতামুধোধয়ত্যাসময়ে শিখণ্ডিনা॥
(কা-পা, ১৪৩ পৃ)

বস্তুতঃ প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গনে স্বচ্ছন্দবিচরণশীল ময়ূরের স্বভাব এই যে, সে প্রতি সন্ধ্যায় রাত্রিযাপনের জন্য এক নির্দ্দিষ্ট নিবাসবৃক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিহঙ্গতত্ত্ববিদগণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন—Peafowls roost on trees and they are in the habit of returning to the same perch night after night. (কা-পা, ৪৬ পৃ)

ময়ূরকে শুধু বনানীর মধ্যে কেন, নগরোপকণ্ঠের সামান্য জঙ্গলের মধ্যেও দেখা যায়, তীরস্থলীতেও সে দৃষ্ট হইয়া থাকে—

পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়ানাং কলাপিনামুদ্ধত নৃত্যহেতৌ।
তীরস্থলীবর্হিভিরুৎকলাপৈঃ প্রস্নিগ্ধ কেকৈরভিনন্দ্যমানম্॥
(কা-পা, ১৪৩ পৃ)

এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্যেরও যে অভাব নাই ডাঃ লাহা তাহা বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। (কা-পা, ১৪৪-৪৫ পৃ)

ঋতুসংহারের গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনায় ময়ূরের ছবি বিচিত্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে নব নব ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎকালে দেখিতে পাই ময়ূরগুলি আর বর্ষাকালের মত তেমন উন্মুখ হইয়া গগন নিরীক্ষণ করে না—

পশ্যতি লোল্লতামুখা গগনং ময়ূরাঃ। (কা-পা, ১১৫ পৃ)

অথবা আর তেমন ভাবে নাচে না—

নৃত্য প্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায়
হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্। (কা-পা, ১১৬ পৃ)

বর্ষাকালে দাম্পত্যলীলার প্রশস্ত সময়ে মেঘসন্দর্শনে ময়ূরের আনন্দনৃত্য যেরূপ অত্যন্ত স্বাভাবিক, বর্ষাশেষে গর্ভাধানকাল অন্তে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহার মেঘদর্শনে আকুলতার অভাবও তেমনি স্বভাবসুলভ। তাই শরতে শিখিগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে দেখিতে পাই। (কা-পা, ১১৫-১৬পৃ)

এইরূপে কালিদাস-সাহিত্য হইতে বহু শ্লোক এবং শ্লোকাংশের উদ্ধার করিয়া মহাকবিবর্ণিত পাখীগুলির সহজ রাজনীতির সহিত পাঠকের যাহাতে পরিচয় ঘটিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে অতি নিপুণতার সহিত ডাঃ সত্যচরণ এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিয়াছি। আশা করি পাঠকপাঠিকারাও অনুরূপ আনন্দিত হইবেন। বাংলা ভাষায় এইরূপ গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ যদি তাঁহাদের গবেষণার ফল

এইরূপে মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচারে সহায়তা করেন, তাহা হইলে দেশের শিক্ষা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এ হিসাবেও ডাঃ সত্যচরণের উদ্যম সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

সুদৃশ্য বাঁধাই ও চিত্রবহুল প্রায় তিন শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তকখানি বাস্তবিকই খুব মনোরম হইয়াছে। ইহার কাগজ ও ছাপা প্রভৃতিও অতিশয় পরিপাটী; ভাষা বিষয়োপযোগী গুরুগম্ভীর, অথচ সুললিত। গ্রন্থশেষে ইংরেজী ও বৈজ্ঞানিক নাম সম্বলিত কালিদাসের পাখীর তালিকা, এবং বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণানুক্রমিক সূচি সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আশা করি পুস্তকখানি বিদ্বৎসমাজে ও সাধারণ্যে তুল্যরূপে সমাদৃত হইবে।*

—:*:—

প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী

আমাদের দেশে যদি কেহ দু'চার লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ অথবা লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে,তাঁহার অধস্তন চৌদপুরুষ অভিশপ্ত। তাহারা যে কেবল কুঁড়ের বাদশা হইবে ইহা নহে—আনুষঙ্গিক যত রকম চরিত্রদোষ প্রায় সকলেরই বশীভূত হইবে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—An idle brain is the devil's workshop—অর্থাৎ অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আশ্রয়স্থল। আজ বাঙালী জীবন-সংগ্রামে দিন দিন পরাভূত হইয়া হটিয়া যাইতেছে, তাহার একটি প্রধান কারণ অলসতা। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যত হৌসের মুচ্ছুদ্দি প্রায় সবই বাঙালী ছিল; আন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যও বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এই হৌসের মুচ্ছুদ্দিরা যখন কলিকাতার আশে পাশে বাগানবাড়ী করিয়া নানা প্রকার বদখেয়াল ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, এবং জমিদারী কিনিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইল। আমাদের দেশের ধনী লোকের বংশধরগণ জড়বৎ মাংসপিণ্ডের সমষ্টি এবং মস্তিষ্ক চালনার অভাবে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। অধিকাংশ জমিদারীই তিন পুরুষের মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এখনও যাহা বজায় আছে তাহার ভিতর অনেক

* ভারতবর্ষ—মাঘ ১৩৩৬।

বড় বড় জমিদারীই ঋণভারাক্রান্ত হইয়া কোর্ট-অব-ওয়ার্ড এর অধীন। এখন দেশে বাঙালীর ঘরে নগদ টাকার আদান প্রদান একেবারেই নাই। আজ যদি কোন জমিদারের ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তিন চার লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দালালকে সর্বপ্রথমে মাড়োয়ারী অথবা ভাটিয়া মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হইবে। কাজেই আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, বাঙলার ভূমিলক্ষ্মী আজ এক শ্রেণীর অ-বাঙালীর গৃহে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে।

এই ত গেল জমিদারীর কথা। ৭০।৮০ বৎসর পূর্বে কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলের ভূস্বামী প্রধানতঃ বাঙালীরাই ছিলেন। কিন্তু যে কারণে জমিদারী পরহস্তগত হইতে চলিয়াছে, সেই কারণেই বড়বাজার অঞ্চলের মালিকানার অধিকাংশই তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। একবার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া যাইতে থাকিলে রাস্তার দুই ধারে যে সমস্ত প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার মধ্যে শতকরা দু'একটি বাঙালীর বাড়ী হইবে কিনা সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন চোরবাগানে কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক এবং শীলদের বাড়ী বাদ দিলে প্রায় সবই অ-বাঙালীর হস্তগত হইয়াছে। বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর বনিয়াদী বাঙালী ঘরও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমার আত্মচরিতে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এই খেদোক্তি করিয়াছি—'হায় বাঙালী, তুমি নিজবাসভূমে পরবাসী হ'লে!'

বিলাসিতা বা স্বেচ্ছাচারিতা বাঙালী জমিদারগণের মধ্যে বহুদিন হইতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তকপাঠ করিলে ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

যেদিন হইতে জমিদারগণ কলিকাতায় আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ও বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, সেইদিন হইতে ইঁহাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল।

আমি একথা বলিতেছি না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের সর্বনাশের মূল। তাহা হইলে আমি আমার নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করিতাম; কারণ ইহাতে আমি একপ্রকার নিমজ্জিত আছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমি বর্জন করিতে বলি না, তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া অসারটুকু বাদ দিতে হইবে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যদি একটি অনুন্নত জাতি কোন একটি উন্নতিশীল জাতির সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে প্রথমে

তাহাদের বাহ্যিক আড়ম্বর, বেশভূষা ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী কদাচিৎ গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি —ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে কলিকাতায় যাহারা ধনাঢ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরগণ কলিকাতার আশে পাশে বাগানবাড়ী করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

আমার বাল্যকালে অর্থাৎ ষাট বৎসর পূর্বে যখন জমিদারবর্গ কায়েমীভাবে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে শেখেন নাই, তখনও তাঁহারা বছরে দুতিন মাস কাল কলিকাতায় আসিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন; এমন কি যখন দেশে ফিরিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বাক্স বোঝাই করিয়া ব্রাণ্ডি ও হুইস্কি লইয়া যাইতেন, এবং পরে ধারাবাহিকভাবে ইহার চালানেরও ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে উৎসন্ন যাইবার পথ পরিষ্কার হইল এবং তাহাদের পর কয়েক পুরুষ ধরিয়া যতই কলিকাতার সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি হইতে লাগিল ততই পল্লীগ্রামের উপর বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল।

এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বড় বড় জমিদারদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৯৫ জন কলিকাতাবাসী। আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি যে জমিদারগণ স্ব স্ব গ্রামের পুষ্করিণী ও দীঘি খনন, তাহার পঙ্কোদ্ধার এবং রাস্তাঘাটের দিকে নজর রাখিতেন। কাজেই এখনকার মত পল্লী বনজঙ্গলসমাকীর্ণ ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া উঠে নাই। এতদ্ভিন্ন ধনী ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের গৃহে বার মাসে তের পার্বন হইত। কাজেই জমিদারগণ কখনও কখনও অত্যাচারী হইলেও দেশের টাকা দেশেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে যথার্থই বলিয়াছেন—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবি॥

এই স্থলে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাকে Linlithgow-র কমিশনে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, তখন আমি পল্লীর হৃতশ্রীর কারণ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছিলাম, এবং বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, পল্লীর যাবতীয় দুর্দশার একটি প্রধান কারণ ধনী জমিদারগণের পল্লীত্যাগ। পূর্বকালে পল্লীজননী যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, তাহা জমিদারদের ভগ্ন প্রাচীর ও দেউল দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

বড় বড় জমিদারের কুঠীসংলগ্ন ফুলের ও ফলের বাগ-বাগিচা থাকিত।

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথের বিষয় পড়িলে ইহার আভাস পাওয়া যায়। জমিদারগৃহে সঙ্গীতচর্চ্চা হইত এবং ওস্তাদ ও কালোয়াতের যথেষ্ট আদর ছিল। এই সকল কারণে জমিদারবাড়ী তখন জম্‌জম্‌ করিত। কিন্তু হায়, আজ আমি পাড়াগাঁয়ে যেখানেই যাই সেইখানেই দেখিতে পাই যে, বড় বড় অট্টালিকা জনমানবশূন্য হইয়া ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পূজার দালানে আর কাঁসর ঘণ্টার রব শুনিতে পাওয়া যায় না। পায়রা বাদুড় চামচিকা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ভাঙ্গা বাড়ী শিয়ালের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। বড় বড় পুষ্করিণী কর্দমে ও শৈবালে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে।

বর্ত্তমানে জমিদারগণ কলিকাতাবাসী হইয়াছেন এবং টাকার জন্য নায়েব আমলাদের উপর কড়া তাগাদা দিতেছেন। এমনও আমি জানি যে, "যেন তেন প্রকারেণ টাকা না পাঠাইলে তোমার চাকরি থাকিবে না" ইত্যাদি বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। আজ এই সমস্ত টাকা, যাহা দুঃস্থ প্রজাগণের শোণিত স্বরূপ, দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে—ইহার এক কপর্দ্দকও আমাদের দেশের লোক পাইতেছে না। চৌরঙ্গীর অট্টালিকায়, রকমারী মোটর কেনায়, লাজারাসের আসবাবশালায় অধিকাংশ টাকা ব্যয় হয়। এই স্থানে ইহাও বলা উচিৎ যে, যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল বর্ত্তমান জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণ তখন অনেক দাতব্য-চিকিৎসালয়, স্কুল, এমন কি অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়; কারণ, বাঙলায় জমিদারগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই ঋণজালে জড়িত এবং পল্লীমাতার ক্রোড় হইতে চির-নির্বাসিত।

এতক্ষণ বাঙলায় জমিদারগণের অলসতা ও অপদার্থতার বিষয় আলোচনা করিলাম। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে কেবল বসিয়া খান। আজ তাঁহারা জড়তা, নির্ব্বুদ্ধিতা এবং বিলাসিতা হেতু পৈত্রিক বিষয় বৈভব হারাইতে বসিয়াছেন। কিন্তু একবার যাঁহারা নিজ বুদ্ধি, প্রতিভা এবং পুরুষকার বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী হইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ আলস্যস্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া কি ভাবে উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন, তাহার তুলনামূলক আলোচনার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কিছুদিন হইল স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের আমন্ত্রণে হোলকার রাজ্যের রাজধানী ইন্দোরে যাই, এবং তথায় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করি। স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ নিজবুদ্ধি ও প্রতিভাবলে ভারতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কলকারখানা-

সংস্থাপক। আজ হুগলী নদীর তীরে ইঁহার যে পাটকল আছে, তাহা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইঁহার অধীন যে প্রধান ইংরাজ ম্যানেজার আছেন, তাঁহার বেতন ও কমিশনে আয় মাসিক প্রায় ৭০০০৲ টাকা হইবে এবং উচ্চ বেতনভোগী আরও ১৫ জন ইংরাজ এবং দেশীয় কর্ম্মচারীও আছেন।

রাণীগঞ্জে ইঁহার যে Electric Steel Works আছে, সেখানে ইস্পাত গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া রেলওয়ের চাকার সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। ইন্দোরে ইঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে চারিটি কাপড়ের কল। গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অবসানে গভর্ণমেণ্ট যখন সমরঋণের জন্য আবেদন করেন, ইনি প্রথমে এক কোটি টাকার War-bond কিনিয়াছিলেন। যিনি একদিনে এক কোটি টাকা নগদ তহবিল হইতে বাহির করিতে পারেন, তাঁহার যে কতটাকা আছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, শেঠ হুকুমচাঁদ আদৌ ইংরেজী জানেন না। বড় ছেলে ইন্দোরে পৈত্রিক ব্যবসায়ে পিতার একজন প্রধান সহকারী হইয়াছেন।

আর একজন কৃতী ইহুদী ব্যবসায়ীর কথা বলিতেছি। বেঙ্গল কেমিক্যালের সহিত তাঁহার লেনদেন আছে বলিয়া আমি তাঁহার কতকগুলি ঘরোয়া খবর রাখি। কলিকাতার সন্নিকটে তাঁহার একটি পাটকল আছে। ইঁহার দুই পুত্র ও এক জামাতা শিক্ষানবিশী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ ইহুদী প্রায় দুই কোটি টাকার মালিক। তাহা হইলে প্রত্যেক ছেলের ভাগে প্রায় এক কোটি টাকা করিয়া পড়িবে। এই প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও তাঁহারা প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সকালে ৯টার সময় একটু দুধ ডিম (কিন্তু চা নয়) খাইয়া পাটকলে বেলা ৬টা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে কাজ করেন। অবশ্য মাঝে টিফিনের জন্য একটু বিশ্রাম করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ ঘনশ্যামদাস বিরলা এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও তাঁহাদের স্ব স্ব পুত্রগণও কলিকাতা বোম্বে, দিল্লী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে নানাবিধ ব্যবসা, কাপড়ের কল প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক ভাইই স্বীয় স্বীয় বিভাগে মেহনৎ করেন, এবং তাঁহাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণও পৈত্রিক ব্যবসায়ে অল্প বয়স হইতে প্রবেশ লাভ করিয়া এক একদিকে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের দেশের জমিদারগণ বহুদিন হইতে যে অলসতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, আজ তাহা শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দীনা পল্লীমাকে হতশ্রী করিয়া সহরের বিলাসকুঞ্জে আরামে জীবন-যাপনেরই এই ফল;

বাঙলার জমিদারবংশ এতকাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাস-ব্যসনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা আজ সমূলে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে যদি জমিদারগণের অবস্থা এতদূর সঙ্কটাপন্ন না হইত, তাহা হইলে কতকটা আশা-ভরসা থাকিত। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া বাঙালীর পরাজয় ঘটিতেছে, এবং আর এক শতাব্দী পরে বাঙলার অবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা কল্পনা করিতে শিহরিয়া উঠিতেছি।*

বাঙলার জমিদারবর্গ (২য়)

গত ভাদ্রমাসের 'ভারতবর্ষে' বর্ত্তমান জমিদারবর্গের বিষয় কিছু বলিয়াছি। অনেকে হয়ত ভাবিতে পারেন যে, আমি তাঁহাদিগের উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছি। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, জমিদারদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য তাঁহারা নিজেরাই ষোল আনা দায়ী। আমি জমিদারদিগের হিতাকাঙ্খী। আজ যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি বাংলার জমিদারদিগের বিলোপসাধন হয়, তাহা হইলে দেশে এক ভীষণ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিবে; কারণ জমিদারগণের সঙ্গে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, গাঁতিদার, দর-গাঁতিদার, মৌরসীদার সকলেই এক সুরে বাঁধা। তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নিরন্ন হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

বোম্বাই অঞ্চলের ঐশ্বর্য্যশালিগণ বাঙলার জমিদারবর্গের সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা পরিপোষণ করিয়া থাকেন। খুলনার ভীষণ দুর্ভিক্ষে ও উত্তর-বঙ্গ প্লাবনের সময় ঐ সমস্ত প্রদেশ হইতে অনেক রাজোচিত দান পাইয়াছিলাম। যদিও তাঁহারা অকাতরে মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু অনেকে ইহা বলিতেও ত্রুটি করেন নাই যে, যে দেশের ধনবহুল জমিদারবর্গ পরম সৌভাগ্যক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভোগ করেন, সে দেশের অধিবাসীবৃন্দের দুর্দ্দশার জন্য অন্য প্রদেশবাসিগণের নিকট হাত পাতিবার প্রয়োজন কি? কারণ, তাঁহারা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই যে, বর্ত্তমান জমিদারগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই, এমন কি ৯৯ জন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ঋণজালে জড়িত।

---

* অরবিন্দ সরদার কর্ত্তৃক অনুলিখিত। ভারতবর্ষ—ভাদ্র ১৩৪০।

Royal Agricultural Commission-এর সম্মুখে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র একটি সুচিন্তিত মন্তব্য দাখিল করেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, জমিদারবর্গ প্রজাগণের নিকট হইতে মোট ১৪ ক্রোটি টাকা কর পাইয়া থাকেন; তন্মধ্যে রাজস্ব, রোডসেস্ ইত্যাদি এবং আমলা গোমস্তাদিগের বেতন বাদ দিলে ইহা মাত্র ৯ কোটিতে দাঁড়ায়! প্রথমে শুনিলেই চমকপ্রদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যাহারা জমির উপস্বত্ব ভোগ করেন তাঁহাদের মোট সংখ্যা ৪১ লক্ষ। তাহা হইলে প্রত্যেকের আয় বাইশ টাকার অধিক হয় না। অধিকন্তু ইঁহারা আবার বহু সরিকে বিভক্ত। যাঁহাদের নূন্যকল্পে ১২,০০০৲ টাকা আয় তাঁহারাই Legislative Assemblyতে ভোট দিতে পারেন। এইরূপ ভোটদাতাগণের সংখ্যা বাঙলা দেশে মাত্র ৭০০ শত। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙলার জমিদারগণ হিংসা নয়নে দেখিবার পাত্র নন। অবশ্য পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ধনী ছিলেন।

কিন্তু অদ্যাপি বর্দ্ধমান, কাশীমবাজার, মৈমনসিংহ (মুক্তাগাছা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, গৌরীপুর), রাজসাহী (নাটোর, দীঘাপাতিয়া, পুঁটিয়া) পাথুরিয়া-ঘাটা ও জোড়াসাঁকো প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত বনিয়াদী ঘর আছেন, এবং যাঁহাদের আয় ২।৩ লক্ষ হইতে ১০।১২ লক্ষ বা ততোধিক হইবে আমি তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি। চুনাপুঁটির কথা ধরিলাম না। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল জমিদারবর্গের পূর্ব্বপুরুষগণ দেশের নানাবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহাদের দানে পুষ্ট অনেক প্রতিষ্ঠান এখনও আমরা দেখিতে পাই।

উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৯ সনে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট ঐ বিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন এবং পরে নিজ অর্থব্যয়ে উহা স্থাপন করেন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তদীয় সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারিমোহনও জমিদারদিগের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। স্যর উইলিয়াম হাণ্টার একবার London Times পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, বাঙলা দেশে প্যারিমোহনের ন্যায় রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ববিষয়ক বিশেষজ্ঞ সেই সময় আর কেহ ছিলেন না। রাজ-নৈতিক আন্দোলনেও তিনি সুরেন্দ্রনাথের সহিত একমত ছিলেন। উত্তরপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরী ইঁহাদের একটি উজ্জ্বল কীর্ত্তি। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিজ জমিতে প্রথম আলুর চাষ প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাহার উৎকর্ষ সাধন করেন; এখনও কালনা অঞ্চলের প্রজাবর্গ তাঁহাকে এই জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে।

শতাধিক বর্ষের অধিক হইল ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজা ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল যখন কাশীবাসী হন, তখন সর্বপ্রথমে তিনি অন্যূন কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কাশীতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন ; এবং তৎপরে দানপত্র দ্বারা চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটীর হস্তে উক্ত বিদ্যালয় দান করেন। জয়নারায়ণ ঘোষালের একমাত্র পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল কাশীতে অন্ধ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বহু অর্থব্যয়ে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করিয়া সাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের চতুর্থ প্রপৌত্র রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর বর্তমান 'জয়নারায়ণ ভবনটি' বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া এবং স্কুলের ব্যয়নির্বাহ ও পরিচালনার জন্য আরও বহু সহস্র মুদ্রা উক্ত কলেজের ট্রাষ্টীদিগের হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, তখন তৎকালীন বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ও গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর ইহার উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ দান করেন। বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ স্বর্গীয় মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে বাঙলায় অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি স্কুল, কলেজ এবং নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে দান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সর্বস্ব[১] দান করিয়া একরকম রিক্ত হন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সমসাময়িক পুঁটিয়ার রাণী শরৎকুমারী বহুবিধ সদনুষ্ঠানে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহী কলেজ প্রধানতঃ পুঁটিয়ার ও দীঘাপতিয়ার দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। টাঙ্গাইলের জাহ্নবী চৌধুরাণী যে স্কুল স্থাপন করেন, তাঁহার পুত্রবধূ দীনমণি চৌধুরাণীও তাহাতে উপযুক্তরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যদিও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তথাপি তিনি স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার এতদ্‌বিষয়ে অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া বেথুন সাহেব তাঁহাকে দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।—"I am anxious to give you the credit which justly belongs to you of having been the first native in India, who, in modern times has

pointed out the folly and wickedness of allowing women to grow up in utter ignorance and that it is neither enjoined nor countenanced by anything in the Hindu Shastras." জগদ্বিখ্যাত 'শব্দকল্পদ্রুম' স্যার রাধাকান্তদেবই সংকলন করিয়াছিলেন, এবং উক্ত মহাগ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ যাবতীয় সুধীগণকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যাঁহারা মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথম ইহার অভিনবত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহার অনুজ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত চর্চ্চার পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। এ স্থলে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি অজ্ঞাতভাবে দেশহিতকর কার্য্যে বহু অর্থ দান করিতেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, টাকীর মুন্সিবংশের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন প্রথিতনামা জমিদার সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কলিকাতার টাউন হলে যখন বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ সভা আহূত হয় তখন অমিততেজা সূর্য্যকান্ত সিংহ বিক্রমে যে প্রকার সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন, তাহা অতি বিরল ও প্রশংসনীয়। তিনি বলিয়াছিলেন—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরিব সেও ভাল, বিদেশী কাপড় স্পর্শ করিব না।' তাঁহার সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহা এখনকার দিনের পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। যে কল্পনাপ্রসূত কথোপকথন উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে সত্য-ঘটনার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে।

লর্ড কার্জ্জন—মহারাজ! আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি।

সূর্য্যকান্ত—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কত রাজন্যবর্গ উপাসনা করিয়া ভারতেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধির পদধূলি লাভ করিতে সক্ষম হন না; আর আমি ত' একজন নগণ্য জমিদার মাত্র। ইহা আপনার ঔদার্য্য ও মহানুভবতার নিদর্শন।

লর্ড কার্জ্জন—মহারাজ, আমার আগমনের উদ্দেশ্য আপনি বুঝিতে পারেন নাই। বাঙলার আয়তন অতি বৃহৎ। একজন গভর্ণরের অধীনে শাসনকার্য্য

পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভব। কাজেই প্রাকৃতিক সীমানুযায়ী এই প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। আমার মনোগত ইচ্ছা যে, আপনাকেই পূর্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত করাই। (I propose to make you the first nobleman in East Bengal.)

সূর্য্যকান্ত—আমাকে মাপ করিতে হইবে। সমস্ত বাঙালীজাতি অন্ততঃ যাঁহাদের দেশাত্মবোধ জন্মিয়াছে তাঁহারা কখনই এ ব্যাপার অনুমোদন করিতে পারিবেন না। তাঁদের এই ধ্রুব বিশ্বাস যে তাহা হইলে বাঙালী জাতির মধ্যে যে একতা ও সংঘবদ্ধতা আছে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। আমিও প্রকাশ্যভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছি। আজ যদি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহা হইলে দেশবিদেশে আমার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এবং আমি বাঙালী জাতির ধিক্কারের পাত্র হইব।

পূর্ব্বকালের জমিদারদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। এই রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়, যাহাতে তাঁহাদের গুণাবলীর ও সৎকার্য্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হায়! আজ তাঁহাদের বংশধরদিগের প্রতি তাকাইলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়। বঙ্গমাতার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যিনিই কামনা করুন না কেন, তাঁহাকে সমভাবে জমিদার, প্রজা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই উন্নতির প্রয়াসী হইতে হইবে। বর্ত্তমান জমিদারগণ জাতির নব জাগরণের পশ্চাতে পড়িয়াছেন ; এমন কি, পাছে স্বার্থের ব্যাঘাত হয় এইজন্য তাঁহারা অনেক সময় দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন না। পরবর্ত্তী সংখ্যায় বর্ত্তমান জমিদারদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। *

—•—

বাঙলার জমিদারবর্গ (৩য়)

এদেশের ইহাই চিরাচরিত প্রথা যে ধনী জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ী হইলে সচরাচর তাঁহারা সরস্বতীকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া ভোগবিলাসে নিমজ্জিত থাকেন। সেইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি আমাদের দেশে কেহ ধনসম্পত্তি বা জমিদারি রাখিয়া যান তাহা হইলে জানিতে হইবে যে তাঁহাদের

---

* শ্রীঅরবিন্দ সরদার কর্ত্তৃক অনুলিখিত। ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩৪০

উত্তরাধিকারীবর্গের চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত অভিশপ্ত। কিন্তু এখনও এমন দুই-একটি জমিদারবংশ এদেশে আছে যেখানে কমলা ও সরস্বতী উভয়েরই সমভাবে অর্চনা হইয়া থাকে। এই প্রসিদ্ধি বা খ্যাতির কথা উল্লেখ করিতে গেলে কলিকাতার লাহা পরিবারের কথা মনে হয়। স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ লাহা এই বংশের গোড়া পত্তন করিয়া যান, কিন্তু তদীয় পুত্র বিখ্যাত ধনকুবের মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ ব্যবসা ও জমিদারি কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। মহারাজা দুর্গাচরণ নিজের ব্যবসা ও জমিদারির পরিচালনা ব্যতীত বহুবিধ কর্ম্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মতালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বরস্বরূপে তিনি যে সকল সুগভীর ও সুচিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি দেশের নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য অর্থদান করেন, তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং মেয়ো হাসপাতালে পাঁচ হাজার টাকা, এবং ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল্ সোসাইটিতে চব্বিশ হাজার টাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যম শ্যামাচরণ লাহাও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কলিকাতায় মেডিকেল-কলেজ সংলগ্ন দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসালয় তাঁহারই অর্থে স্থাপিত হইয়াছে, এবং এই কীর্ত্তি চিরদিন তাঁহাকে সজীব করিয়া রাখিবে। এতদ্‌ব্যতীত ডাফরিন হাঁসপাতালেও তিনি ৫০০০৲ টাকা দান করেন। কনিষ্ঠ জয়গোবিন্দ লাহা; ইনিও ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তিনি একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই সাধনায় ব্রতী ছিলেন। রসায়নশাস্ত্র চর্চ্চা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং এইজন্য একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার নিজ বাসভবনে নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রতি বৎসর যে ফুলের প্রদর্শনী করিতেন তাহাতেই তাঁহার কৃষ্টির (culture) সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় ইঁহার প্রভূত অনুরাগ ছিল; আলিপুরের পশুশালায় যে সর্প-গৃহ আছে তাহা ইনিই নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া দান করিতে ভালবাসিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যকল্পে গভর্ণমেণ্টের হস্তে একলক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার পুত্র অম্বিকাচরণ লাহাও এই সকল সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ একজন পশুতত্ত্ববিদ্ এবং এটি তাঁহাদের বংশানুক্রমিক রুচি। বর্ত্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যচরণ

লাহাও পক্ষীতত্ত্ববিদ্ বলিয়া স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিমলাচরণও বিশেষ কৃতবিদ্য। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা কৃষ্ণদাস লাহা বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছেন। চুঁচুড়া জলের কল নির্মাণের জন্য ভ্রাতৃগণের সহযোগে এক লক্ষ টাকা, বেনারস্ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫,০০০৲ এবং রিপন কলেজের সাহায্যকল্পে ১৫,০০০৲ দান করিয়া যান। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, যখন ১৯২১ সালে খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য আমি সাধারণের নিকট আবেদন করি, সেই সময় একদিন একখানি হাজার টাকার চেক রাজা কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইনি চিন্তাশীল, উদারপ্রকৃতি ও স্বধর্মে আস্থাবান ছিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ে ছান্দোগ্য, কণাদ প্রভৃতি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোক ইঁহার নাম জানিতে পারে, সেইজন্য এই সকল গ্রন্থে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও মুদ্রিত হয় নাই। রাজা হৃষীকেশ লাহাও নানাবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থাকিয়া অদ্যাপিও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন; এবং ইঁহার পুত্র ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি সন্তান। "হৃষীকেশ সিরিজ" নামক যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ইনিই তাহার কর্ণধার। এই সকল পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য যে কত গভীর তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইবার কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক্। ভগবান্ তাঁর সমস্ত কৃপারাশি যেন ঐ এক পরিবারের উপরেই বর্ষণ করিয়াছেন। দ্বারিকা (দ্বারকা) নাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকেই এক একজন ধুরন্ধর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের যুগপ্রবর্ত্তক। তাঁহার পুত্রগণও—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা দরকার মনে করি না, কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত। সর্ব্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কথা বলা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তিনি যে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, তাহা চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইঁহাদের বংশেরই অপর শাখাসম্ভূত অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ চিত্রবিদ্যায় বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত ইহা বলিতে হইতেছে যে, এই সকল দৃষ্টান্ত অতীব

বিরল ; ইহা কেবল exception proving the rule অর্থাৎ ব্যতিরেক-করে। দেশের বড় বড় বুনিয়াদী জমিদার ঘরের বংশধরগণ প্রায়ই নিষ্কর্মা, অলস ও গণ্ডমূর্খ। কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন বটে কিন্তু একেবারে নিষ্ক্রিয়। পশুর জীবনে ও মনুষ্যের জীবনে পার্থক্য কি ? পশুও মানুষের ন্যায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে এবং যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া থাকে। ভগবান তাঁর অসীম করুণায় মানুষকে বোধশক্তি ও বিচারশক্তি দিয়াছেন, যাহার দ্বারা সে পশু, পাখী ও অন্যান্য জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র। অমর কবি Shakespeare বলিয়াছেন :—

What is a man if his chief good and market of his time
Be but to sleep and feed ? a beast no more
Sure, He that made us with such large discourse,
Looking before and after, gave us not
That capability and Godlike reason,
To fast in us unused.

কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারবর্গ যেমন অলস, নিষ্কর্ম্মা ও শ্রমবিমুখ, তেমনই জীবনযাত্রায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বৈচিত্র্যহীন। বিখ্যাত Sir John Lubbock (Lord Avebury) একজন ধনী শেঠের (banker) পুত্র ছিলেন। নিজের কাজকর্ম্ম যেমনভাবে করিতেন, বিজ্ঞানচর্চ্চায়ও সেইরূপভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট পতঙ্গবিদ্। তাঁহার অনেকগুলি পুস্তকের মধ্যে 'Ant, Wasps and Bees', The Beauties of Life, The Pleasures of Life' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জীবনধারা সুখময় করিতে হইলে এক একটি খেয়ালের (Hobby) বশবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজন। আমি খেয়াল বলিতেছি, কিন্তু বদখেয়াল নয়। সঙ্গীতচর্চ্চা, উদ্যাননির্ম্মাণ, পশুপালন, পাহাড় পর্বতে আরোহণ ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের ধনী জমিদার বা ব্যবসাদারের মধ্যেও এর একটিও দেখা যায় না। উদ্দেশ্যহীন জড়ভরত হইয়া তাঁহারা প্রকৃত পশুর ন্যায়ই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৬০ বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরে দেখা যাইত যে, রাজপথে বা গড়ের মাঠে ধনীর সন্তানগণ প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার পূর্বে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন। অনেকে আবার শিকারপ্রিয়ও ছিলেন। এখনও অনেক জমিদারের গৃহে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য জন্তুর চর্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে মহারাজা সূর্য্যকান্তের কথা বলা যাইতে পারে। তিনি এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে 'বংশপরিচয়' নামক গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—"তিনি বসন্তের প্রারম্ভে পর্বতের উপত্যকা প্রদেশে শিবির সন্নিবেশ এবং কখনও খেদা করিয়া হস্তী ধরিতেন, কখনও বা হিংস্র ব্যাঘ্র ভালুক প্রভৃতি আরণ্য পশুর অনুসরণ করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার শতাধিক শিক্ষিত শিকারী হস্তী ছিল। ঐ সকল হস্তীর প্রতি তাঁহার এতাদৃশ যত্ন ছিল যে, তিনি স্বয়ং উহাদিগকে লালনপালন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মৃগয়া ব্যাপারে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ইউরোপের প্রসিদ্ধ শিকারীগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।" গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগেরও শিকারের জন্য খ্যাতি ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে, রেড্ রোড, প্রিন্সেপঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্ ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অ-বাঙালী। ইহাতে বোঝা যায় যে, ধনী বাঙালী সন্তানগণ কিপ্রকার অলস প্রকৃতি" হইয়া উঠিয়াছেন, এবং সেই কারণে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও আয়ুক্ষয় হইতেছে। অনেকেই ৩০।৪০ বৎসর পার না হইতে হইতেই বাত, ডায়াবিটিস্ ও হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

তিন বৎসর অতীত হইল বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও ভারতবন্ধু Mr. Brailsford ভারত ভ্রমণ করিয়া এতদ্দেশীয় জমিদার ও ভারতবর্ষের জমিদারদিগের তুলনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, যদিও ইংরাজ জমিদারবর্গের প্রতি তাঁর বড একটা শ্রদ্ধা নাই, তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য যে, ইংল্যাণ্ডের ভূম্যধিকারিগণ কৃষি ও গোপালনের উন্নতিকল্পে অজস্র অর্থব্যয় ও শক্তি সামর্থ্যের নিয়োগ করিয়া থাকেন। কৃষি ও গোজাতির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টের দিকে তাঁহারা তাকাইয়া থাকেন না কিন্তু ভারতবর্ষের জমিদারবর্গ এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন।

আমাদের ধনাঢ্য জমিদারগণের জীবন কোন খেয়ালের পরিপোষক নয় বলিয়া তাঁহারা যে কি প্রকারে মহামূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানেন না। ইউরোপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—এইপ্রকার ধনবান ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছেন বা তাহার উন্নতিকল্পে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Henry Cavendish একজন সর্ব্বপ্রধান অভিজাতবংশোদ্ভব (Duke of Devonshire) ব্যক্তি। তিনি নিজ পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানচর্চ্চায় অধিকাংশ সময়ই নিমগ্ন থাকিতেন।

তাঁহার বাহিক কোন আড়ম্বর ছিল না, চালচলনও সাদা-সিধা ছিল। একদিন যখন তিনি গবেষণায় নিরত আছেন, এমন সময় জনৈক Bank-এর manager তাঁহার দরজায় করাঘাত করিলেন। Cavendish বাহিরে আসিলে সে ব্যক্তি তাঁহাকে অনুনয় সহকারে বলিলেন—মহাশয় আপনার প্রায় এক কোটি * টাকা বিনা সুদে Bank-এ মজুত আছে, যদি অনুমতি দেন তবে সুদে খাটাইতে পারি। তিনি তাঁহার প্রতি এমন ভ্রূকুটি-কুটিল কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, বেচারা তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে আর এক ব্যক্তি ঐ বিষয়ে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসায় তিনি তাহাকে বলিলেন—দেখ, পুনরায় যদি আমাকে এমনভাবে বিরক্ত কর, তাহা হইলে সমস্ত টাকাই Bank হইতে উঠাইয়া লইব। এই ঘটনা হইতে এইটুকু বোঝা যায় যে অর্থের উপর তাঁহার কিছুমাত্র লালসা ছিল না। তিনি অকৃতদার ছিলেন, এবং বিজ্ঞানচর্চ্চাই ছিল তাঁহার জীবনযাত্রার সম্বল। নব্য রসায়ন শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা ল্যাবোসিয়ার (Lavoisier) বিত্তশালী ছিলেন ; কিন্তু তিনি অবসর সময়ে নিজব্যয়ে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়া রসায়ন-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কৃষি ও গোপালন বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের ঐশ্বর্য্যশালীরা মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এস্থলে ইহা বলিলে দূষণীয় হইবে না যে, আমাদের ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া বিরাট রাজার ন্যায় বহু গোধনের মালিক ছিলেন। গো-জাতির উন্নতিকল্পে তিনি বাছিয়া বাছিয়া নানারকম ষাঁড়, যথা—Shorthron, Alderny, Guernsey প্রভৃতি breed সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডও এই মাতৃধারা পাইয়াছিলেন, এবং এখনও (বর্ত্তমান) সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের গাভী ও বলদ প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইয়া থাকে। এখানে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, একটি Pedigree Bull কখন কখন দশ হাজার পাউণ্ড বা লক্ষাধিক মুদ্রায় বিক্রয় হয়। ১৯১৩ সালে আমি যখন ২।১ মাসের জন্য লণ্ডনে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন কেনসিংটন (Kensington) নামক উপকণ্ঠে নানা স্থানে Dairy অর্থাৎ দুগ্ধ-নবনীত প্রভৃতির দোকান দেখিতাম। কতকগুলির উপর বিজ্ঞাপন থাকিত Lord Rayleigh and Co. তিনি যে কেবল

---

* ইহা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা : তখনকার এক কোটি বর্ত্তমানের ৫ কোটি টাকার সমান হইবে।

লর্ডবংশ সম্ভূত তাহা নহে,—ইংলণ্ডের তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ। ইনি গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেন না।

আমাদের দেশের গোজাতির দুর্দ্দশার দিকে তাকাইলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। ভারতবর্ষ প্রকৃত কৃষিপ্রধান দেশ। গোজাতির উন্নতির উপর দেশের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। আগামী প্রবন্ধে বাংলা দেশের জমিদারগণের মধ্যে কিরূপ ঘুণ ধরিয়াছে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।*

বাঙলার জমিদারবর্গ (৪)

বর্ত্তমান জমিদারদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জমিদারির অর্জ্জন পুরুষকার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের সময় যাঁহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। স্রোতস্বিনী পদ্মার বিশাল জলরাশি যে বরেন্দ্রভূমির পাদদেশ প্রক্ষালিত করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ জনপদই রাজসাহী পরগণা। স্বনামধন্য রঘুনন্দন বাল্যে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; এবং পুঁটিয়ার ভূস্বামী দর্পনারায়ণের অনুগ্রহে পালিত হন। স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি তৎকালীন মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই মুর্শিদকুলী খাঁ একজন দক্ষিণাপথবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। পরে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বাঙলার সুবাদার করিয়া পাঠান। নবাবী আমলে যদিও বিচার, ও সামরিক বিভাগে মুসলমানগণের, একাধিপত্য ছিল, কিন্তু রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দুদিগের সাহায্য ভিন্ন চলিত না। এই কারণে কানুনগো প্রভৃতি পদ অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক হিন্দু দেওয়ানী পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। রঘুনন্দন যখন মুর্শিদকুলী খাঁর সুনজরে এই গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বাংলার জমিদারদিগের নির্য্যাতনের ইতিহাস এক অপূর্ব্ব কাহিনী। বাকী কর আদায়ের জন্য জমিদারদিগকে উৎপীড়ন করিবার বহু প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করা হইত। তন্মধ্যে 'বৈকুণ্ঠে' (২) প্রেরণই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য।

শ্রীঅরবিন্দ সরদার কর্তৃক অনুলিখিত। ভারতবর্ষ—পৌষ, .৩৪০

এইরূপ অত্যাচারের পরও যদি রাজস্ব অনাদায় থকিত, তাহা হইলে জমিদারি একেবারে বাজেয়াপ্ত করা হইত, এবং তাহার পরে জমিদারকে কারারুদ্ধ করা হইত। রঘুনন্দন এই সুবর্ণ সুযোগে অনেক বিশাল জমিদারি তদীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। বদনামের এবং লোকনিন্দার ভয়ে নিজনামে কখনও সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিতেন না। এই প্রকারে অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমগ্র বাঙলার এক-পঞ্চমাংশের মালিক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অভ্যুন্নতির ফলেই বাঙলায় 'রঘুনন্দনের বাড়' এই প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার নামের সঙ্গে এই প্রবাদ যদিও বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জমিদারি অর্জ্জনের মূলে সম্পূর্ণ সাধুতা ছিল না।

দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় শৈশবে অতি দরিদ্র ছিলেন। তখনকার নাটোরের মহারাজা রামজীবন রায়ের সুনজরে পতিত হইয়া ইনি সৌভাগ্যবান হন। ভূষণার রাজা সীতারাম বিদ্রোহী হইলে এই দয়ারামই তাঁহাকে বন্দী করিয়া নাটোরের রাজ বাড়ীতে আনয়ন করেন, এবং তাঁহার ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করেন। অদ্যাপি দীঘাপতিয়া রাজবাড়ীতে সীতারাম রায়ের গৃহবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণজীর পূজা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মুক্তাগাছার আচার্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগ্রহে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন।

এইবার ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জমিদারের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। কাশিমবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ কান্তবাবুর নাম আজ বাঙলা দেশে সর্ব্বজনবিদিত।

ইংরাজ বণিকদিগের ব্যবসা সম্পর্কে কান্তবাবু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত সবিশেষ পরিচিত হন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সময় কাশীমবাজার কুঠিতে একজন নিম্নতন কর্মচারী ছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের নবাব হইয়া ইংরাজ উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং অবিলম্বে কাশীমবাজার কুঠি আক্রমণ করেন। ইংরাজগণ বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। হেষ্টিংসও এই দলভুক্ত ছিলেন। কোন কৌশলে মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস কাশিমবাজারে আসিয়া কান্তবাবুর আশ্রয় লন। নবাবের রক্তচক্ষুকেও উপেক্ষা করিয়া কান্তবাবু তাঁহাকে আশ্রয়দানে সম্মত হন। পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি এই কান্তবাবুর কথা ভুলিয়া যান নাই। নানা প্রকার অসদুপায়

অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক লাভজনক জমিদারী প্রদান করেন, এবং সেইদিন হইতে কান্তবাবুর ভাগ্যের উন্মেষ হয়।

নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ দেবীসিংহ লর্ড ক্লাইভের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, এবং কলে কৌশলে জমিদারী অর্জন করিয়া গিয়াছেন। পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও সেইরূপভাবে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুগ্রহে লক্ষীর কৃপালাভ করেন। জমিদার উৎপীড়নকারী ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত আছে।

ইদানীন্তনকালেও দেখা যায় যে, অনেক জমিদারের মোক্তারগণ লাটের খাজনা দাখিল না করিয়া বেনামীতে সেই সম্পত্তি আবার ক্রয় করিয়া ভূস্বামী হইয়াছেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন বাঙালা দেশে নিতান্ত বিরল নয় (৩)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরে যখন কলিকাতায় জমিদারী নীলাম হইত তখন এই বিশ্বাসঘাতকতার ও প্রবঞ্চনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন রকমে পিয়াদাদিগকে ঘুস দিয়া নিলামজারীর পরোয়ানা গোপন করা হইত। সে সময় ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি দুরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতে ১১।১২ দিনের কম লাগিত না। সুতরাং যাঁহারা কলিকাতার বাসিন্দা ছিলেন, তাঁহারা অতি অল্পমূল্যেই অনেক বিশাল জমিদারী ক্রয় করিয়া ভূস্বামী হইয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বর্ত্তমান বাঙলার অধিকাংশ জমিদারী পুরুষকার দ্বারা অর্জিত হয় নাই। অতিসূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার মূলে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অসাধুতা এবং অন্যায়ের সমষ্টি অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সে সকল কথার উল্লেখ করিয়া আমি জমিদারদিগের বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না। জমিদারী যে প্রকারেই অর্জিত হউক না কেন, প্রজার প্রতি তাঁহাদের সত্যকার শুভেচ্ছাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে জমিদারগণ যে কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। সেই লোমহর্ষক হৃদয়বিদারক অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমি আমার লেখনি কলুষিত করিতে চাহি না। তৎকালীন ইংলণ্ডের বাগ্মী-প্রবর মহামতি বার্ক পার্লামেণ্টে সদস্যগণের নিকট প্রজা উৎপীড়নের যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহা হইতে সামান্য কিছু বলিতেছি (৪)। ইহা কখনও কঠোরতার সহিত রাজস্ব আদায় করা নহে। ইহা দেশের উপর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা। জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এইরূপ

নৃশংসতার কাহিনী কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পিতা ও পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছ পীড়ন, নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার ইত্যাদির দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত। Burke-এর সেই জ্বালাময়ী ভাষা শ্রবণ করিলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। আমাদের দেশের বড় বড় জমিদারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন এই উৎপীড়নের সহায়ক।

এইবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলিতেছি। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁহারা রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কারণ কোম্পানীর কর্মচারীগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ (৫), এবং বিশেষতঃ দেশবাসীর নিকট একেবারেই অপরিচিত। সেইজন্য রেজা খাঁ ও সীতাব রায় নামক দুইজন নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন, এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় তাঁহাদের উপরেই অর্পিত ছিল। সেই বৎসরের যে মাসেই কোম্পানী স্বহস্তে এই দুরূহ ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা বিফল হওয়াতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় জমিদারদিগের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারগণ ভূমির উন্নতিলব্ধ কর পাইবার অধিকারী। কোন অজুহাতে রাজস্ব মাপ হইতে পারিত না সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে যে হারে খাজনা আদায় করুন না কেন, গভর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব বাদে সব তাঁহাদেরই প্রাপ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কিন্তু এই উপদেশ দেওয়া আছে যে, জমিদারবর্গ প্রজাদিগের সুখ, সুবিধা ও উন্নতিবিধানে সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিবেন।

কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপব্যবহার হইতে লাগিল। কৃষির উন্নতি-বিধান ও জমির উৎকর্ষসাধন না করিয়া জমিদারগণ নানারূপ বাজে আদায়ে প্রজাদিগকে বিব্রত করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাঙলার প্রজাবর্গ দিন দিন নিঃস্ব হইতে লাগিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে James Mill পার্লামেণ্টের House of Commons-এর সম্মুখে সাক্ষ্য দেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক স্থলে প্রজাদিগের দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে। জমিদারদিগের নিকট তাহারা ক্রীড়া-পুত্তলিকাবৎ, এবং তাহাদের নিকট হইতে যথেচ্ছা শোষণ করা হয়। ধনী জমিদারগণের অধিকাংশই কলিকাতাবাসী বলিয়া জমিদার ও প্রজার মধ্যে কোন সংশ্রব নাই।

এইরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড

রিপন বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের ফলে জমিদার-দিগের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব হইয়াছে, এবং প্রজাদিগের অধিকার কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত প্রথানুসারে এখনও অনেক স্থানে প্রজা জমি হস্তান্তর করিতে পারে না। বর্তমানে বাঙলাদেশে যদিও তাদৃশ উৎপীড়ন নাই, তথাপি আমি একথা বলিতে কখনও কুণ্ঠিত হইব না যে, জমিদারবর্গ প্রজা-গণের নিকট হইতে তাহার বুকের রক্তস্বরূপ যে কর আদায় করেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা কিছুই প্রতিদান দিতে পারেন নাই। ১৯১২ সালে খুলনায় একটি কৃষি-প্রদর্শনী হয়। তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Hart কর্তৃক আহুত হইয়া তথায় যাই। খুলনার জমিদার রাজা হৃষীকেশ লাহা, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া যান। আমি সভাস্থলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, যে জমিদার বৎসরে অন্যূন তিন মাসকাল প্রজাবর্গের মধ্যে অবস্থিতি না করেন, এবং তাহাদের দুঃখ কষ্টের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেন, তাঁহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত্।

বাঙলার জমিদারবর্গের উপর দেশের ও দশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। বাঙলা দেশের কৃষিজীবী আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তদুপরি ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহাদের জীবনযাত্রা অধিকতর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। পরণে কাপড় নাই, দুবেলা অন্ন জোটে না; কিন্তু আজও তাহাদের ভূস্বামিগণের বিলাস-ব্যসন

(১) বিগত কার্ত্তিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে বাংলার জমিদারবর্গ শীর্ষক প্রবন্ধে রাজসাহী কলেজ স্থাপনে যাঁহারা অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ভুল ও ত্রুটি বশতঃ দুবলহাটী রাজবংশের কথার উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহারা এই কলেজ সংস্থাপনার জন্য বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন; এবং এখনও প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার টাকা করিয়া জমির মুনাফা বাবদ কলেজের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়। এতদবিধ নানা হিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহারা অজস্র দান করিয়াছেন।

(২) বর্ত্তমান পাঠকগণের নিকট 'বৈকুণ্ঠের'র পরিচয় প্রয়োজন হইতে পারে। হিন্দুদিগকে উপহাস করিবার জন্য পুতিগন্ধময় বিষ্ঠার দ্বারা পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত করা হইত।

(৩) At first the Zemindaries were sold not in the districts to which they belonged but in Calcutta at the office of the Board of Revenue. This gave rise to extensive frauds and intensified the rigours of the measure,—"Economic Annals of Bengal." J, C, Sinha—272.

চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব দিয়া রিক্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে। আর সেই নিরন্ন প্রজাগণের শোণিত স্বরূপ অর্থবল তাঁহারা নানারূপে বদ্‌খেয়ালে অকাতরে নিঃশেষ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়জন জমিদার তাঁর বিশাল জমিদারির প্রাঙ্গনে একটি নিম্ন প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন? একটি পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রজাবৃন্দ নিদারুণ গ্রীষ্মে নৌকাযোগে ৮।১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পানীয় জল লইতে আসিয়া থাকে। আর সেইখানকারই ভূস্বামী কলিকাতায় বসিয়া পঞ্চাশ সহস্র বা লক্ষাধিক মুদ্রা সেই জমিদারির মুনাফা বাবদ ভোগ করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, এক একটি বিবাহে ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার বিশাল সৌধকে আলোক মালায় বিভূষিত করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? (৬)

---

(৪) It was not a rigorous collection of revenue; it was a savage war against the country.

And here, my lords, began such a scene of cruelties and tortures as, I believe, no history has ever presented to the indignation of the World, such as I am sure, in the most barbarous ages, no political tyranny, no fanatic persecution has ever exceeded.

The punishments inflicted upon the ryots both of Rungpore and Dinajpore for non-payment, were in many instances of such a nature, that I would rather wish to draw a veil over them than shock your feelings by the details.

Children were scourged almost to death in the presence of their parents. This was not enough. The son and father were bound close together, so that the blow which escaped the father, fell upon the son, and the blow which was missed by the son would fall over the back of the parent.—"Burke's Impeachment of Warren Hastings".

(৫) "The proclamation regarding the Permanent Settlement was concluded in the language of distinct declaration as regards the rights of the Zeminders in language of trust and expectations as regards any definition of their duties towards the ryots". —Land System of Bengal" by K. C. Chowdhury—p. 35.

(৬) I believe that in practice the effect of the Permanent Settlement has been most injurious; the ryots are mere tenants-at-will of the Zeminders in the permanently settled provinces. The Zeminders take from them all that they can get, in short they exact whatever they please............

I believe a very considerable portion of the Zeminders are non-resident, they are rich natives who live in Calcutta.

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে—"বসুন্ধরা কাহারও নহে ; ভূম্যধিকারিগণ তাহা বণ্টন করিয়া লওয়াতে যাহা কিছু বলিতে হইল। যতক্ষণ জমিদারবাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিন শার্শি প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রীকন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণে পরাণ মণ্ডল, পুত্র সহিত দুই প্রহর রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট বলদে ও ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সাতক্ষীরা, খুলনা, বারুইপুর প্রভৃতি মহকুমায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই উক্তি কখনও কল্পনা প্রসূত উচ্ছ্বাস নহে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙলার কৃষিজীবী আজও তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে ইহাই বিধাতার আশীর্ব্বাদ। আগামী প্রবন্ধে এই বিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। (৭)

বাঙলার জমিদারবর্গ (৫)

আমি ভারতবর্ষের মারফতে বাঙলার জমিদারদিগের বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি,—জমিদারগণের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বকার অবস্থার তুলনামূলক আলোচনাই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আজ দিন দিন একটি সম্প্রদায় উৎসাহহীন ও কর্ম্মশক্তিতে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে—ইহা যে দেশের পক্ষে অশেষ ক্ষতিকারক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙলাদেশ স্বভাবতঃই কৃষিপ্রধান। সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সহায়তা করিতেছে আমাদের দেশের দুঃস্থ কৃষকেরা। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, রাজ-কর্ম্মচারী সকলেই পরগাছা (parasite)—ইহারা কেহই অর্থ উৎপাদন করিতে পারেন না। কৃষকবৃন্দের পরিশ্রমলব্ধ শস্যের উপরই দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তাহাদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা, নিরক্ষরতা দূর করিয়া তাহাদের জীবনধারণের পথকে সহজ ও সুগম করিয়া তোলা প্রত্যেক সহৃদয় দেশবাসীর কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙলা দেশে শিল্পবাণিজ্যের সমৃদ্ধি নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা কিছু আজও বর্ত্তমান আছে সবই পরের

(৭) শ্রী অরবিন্দ সরদার কর্ত্তৃক অনুলিখিত। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪০

হাতে সঁপিয়া আজ আমরা অর্থহারা হইয়া চাকরির মোহাবিষ্ট। এই দুর্দ্দিনে জমিদারগণ একেবারে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে দেশের অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বেই জমিদারগণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ কিছু কিছু উদ্‌ঘাটিত করিয়াছি। অলসতা, কর্ম্মবিমুখতা, সর্ব্বোপরি বিলাস-ব্যসনই তাঁহাদের অধোগতির কারণ। আজ দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই; তাহার একটি প্রধান কারণ—জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রসার হয় নাই, বরং পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহারাই সবচেয়ে বেশী দাস-ভাবাপন্ন। বাংলাদেশে আজও জমিদারগণের প্রভাব ক্রিয়াশীল! তাঁহারা আজও দেশের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহার কিছুই কার্য্যকরী হয় নাই। কর্মশক্তিহীন হইয়া তাঁহারা সমাজের উন্নতির পথে বিঘ্ন হইয়া আছেন, এবং তাঁহাদের জীবনের গতিও নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অগ্রগতির ইতিহাস তাঁহাদিগকে কোন মতে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই।

আমি গত ৩।৪ বৎসরের কথা বাদ দিতেছি। এখন না হয় বিশ্বব্যাপী আর্থিক অনটন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই মন্দা। এই দুর্দ্দিনে খাজনা আদায় একেবারে বন্ধ—সম্পত্তি সব নিলামে উঠিতেছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যখন দেশের অবস্থা অধিকতর সঙ্গতি সম্পন্ন ছিল, পাটের দর যখন মণ করা ১৫৲।২০৲।২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, তখনও অনেক জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ (Court of wards) এর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। বাংলাদেশে বর্ত্তমানে প্রায় একশত কুড়িটি ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আছে। ইহারা এমনই অসহায় যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদের নাবালকত্ব ঘুচাইতে পারিলেন না। এই সব লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহারা নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলেন না, ইহা কি তাঁহাদের অপদার্থতার পরিচায়ক নহে!

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ আমাদের জমিদারবর্গ অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, কোন রকমে, গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া যাইতে পারিলে জমিদারি অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু এই সুবিধা তাঁহাদিগকে অধিকতর নির্ভরশীল করিয়া ফেলিল। তাহার ফলে এই হইল যে, তাঁহারা সহরে বসিয়া নির্ব্বিবাদে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন; এবং জমিদারি পরিচালনের ভার পড়িল অল্প বেতনভোগী অশিক্ষিত নায়েব গোমস্তার হস্তে। প্রজাদের অভাব

অভিযোগ কদাচিৎ জমিদারের কর্ণকুহরে আসিয়া প্রবেশ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইহাদের জীবনযাত্রার পথের সম্বল। শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া এবং অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাহারা চিরদিনই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। জমিদারগণ এইরূপ উদাসীন হওয়ার ফলেই তাহাদের এই নির্য্যাতন। খাজনা ব্যতীত নায়েব গোমস্তাদিগকেও সন্তুষ্ট রাখা তাহাদের একটি প্রধান সমস্যা। এইখানে Resolution on the Land-Revenue Policy of the India Government, 1902, হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—"While the Government of India are proud of the fact that there are many worthy and liberal minded landlords in Bengal—as there are also in other parts of India—they know that the evils of absenteeism, of management of state by unsympathetic agents, of unhappy relations between land-lords and tenants, and the multiplication of the tenure-holders or middlemen between the zeminder and the cultivator in many and various degrees, are at least as marked and as much on the increase there as elsewhere'—প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। আজ যদি গভর্ণমেণ্টকে কোন বিবৃতি প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে—"There are many" স্থলে 'An insignificant few' ব্যবহার করিতে হইবে, অর্থাৎ সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয় হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কৃষির উন্নতির ও গোপালনের দিকে আমাদের জমিদারবর্গের আদৌ মনোযোগ নাই। আজও সেই পুরাতন মামুলী প্রথায় দেশের চাষকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; এবং এক একটি গো-মড়কে লক্ষ লক্ষ বলদ, গাভী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আজ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের উৎপাদিকা শক্তির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিছুদিন আগে জাপানীরা ব্রহ্ম, শ্যাম, বাঙলাদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, গম, প্রভৃতি আমদানি করিত; কিন্তু উন্নত কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহারা আজ ভারতবর্ষে জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল রপ্তানী করিতেছে। সার ও জলসেচন দ্বারা তাহারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। আর আমাদের 'সুজলা সুফলা' দেশে কৃষিপ্রণালী আবহমান কাল ধরিয়া সেই এক পর্য্যায়ে চলিয়া আসিতেছে।

আজ জমিদারবর্গ ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। যুক্ত প্রদেশের বর্ত্তমান গভর্ণর Sir Malcolm Hailoy Royal Empire Society-র সম্মুখে যথার্থই বলিয়াছেন * যে জমিদার সম্প্রদায় প্রজাদিগের সংরক্ষণের জন্য কিছুই করেন না। কৃষির উন্নতির প্রতি তাঁহারা একেবারেই উদাসীন। অনেকে হয়ত ভাবিতে পারেন যে, আমি জমিদারদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন; কিন্তু Hailey জমিদারদিগের হিতাকাঙ্ক্ষীভাবে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে বিবৃতি করিলাম। কৃষির উন্নতিবিধান না করিলে তাঁহারাই যে পরিণামে বিপদগ্রস্ত হইবেন, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। অপরিণামদর্শিতার ফলে জমিদারদিগের আজ এই দুর্দ্দশা। লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক হইয়া যাহারা ২।৩ বৎসরের লাটের টাকা সঞ্চিত রাখিতে পারেন না, তাঁহাদের এই দুর্দ্দিনের অজুহাত একেবারেই অযৌক্তিক। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে তেমন অনুকূল নহে। অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যাহা এককালে আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল, আজ তাহা উন্নতির পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ Harold Laski যথার্থই বলিয়াছেন—"The existing rights of property represent after all, but a moment in historic time. They are not to-day what they were yesterday, and to-morrow they will again be different. It cannot be affirmed that whatever the change in social institutions, the rights of property are to remain permanent. Property is a social fact like any other, and it is the character of social fact to alter. It has assumed the most varied aspect and it is capable of yet further changes,"—অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য বিবর্তনের সঙ্গে জমিদারিরও বিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

* "The land-lord class has lost much of its economic value in that it does not make a contribution to the soil or to the protection of the cultivator proportionate to the share of produce represented by the results : and there is likely to be increasing pressure on the part of the vast cultivating population for state assistance in adjustment of the relations of land-lords and tenants to correspond with economic fact."

আমি বাঙলার জমিদারবর্গের পূর্ব পুরুষগণের ইতিহাস ও বর্তমান জমিদার-দিগের কার্য্যাবলী কতকটা আলোচনা করিলাম। অনেকে হয়ত ভাবিবেন যে, জমিদারদিগের প্রতি প্রজাবৃন্দের বিদ্বেষবহ্নি ইহাতে আরও প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমি কখনও তাঁহাদের উচ্ছেদসাধনের মত পরিপোষণ করি না। জমিদার সম্প্রদায় দেশের সর্বকার্য্যে মুখপাত্রস্বরূপ হোন ইহাই আমার মনোগত ইচ্ছা। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিতই জমিদারগণের উপর দোষারোপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহাদের হতশ্রীর কথা বহুবার বলিয়াছি। তাঁহাদের পূর্বের মত শ্রীবৃদ্ধি আর নাই। পুরাতন মামুলী প্রথায় আজও জমিদারের গৃহাঙ্গনে ক্ষীণ উৎসবকলা বর্তমান আছে, কিন্তু ভিতরকার সে আনন্দস্রোত আর নাই; কারণ, অনেকস্থলে দেখা যায় যে, জমিদারদিগের বংশধরগণ তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন, তাহাও আবার শতধা বিভক্ত। যাঁহারা এখনও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহাদের চিন্তাধারাও পল্লীমাতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা কেবল পশ্চিমদেশীয়দের বাহ্যিক অনুকরণে ব্যস্ত। বাঙালী চরিত্রের যে দুর্বলতা, অন্ধতা, তাহা হইতে কোনক্রমেই বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এখনও সংস্কারে বিজড়িত। ভগবান তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ধনসম্পত্তি অধিকাংশ স্থানে অনর্থ ঘটাইতেছে। মানবজীবনের সত্যকার সার্থকতা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। আজ বাঙালীর অন্নসমস্যার সঙ্গে জমিদারদিগের সমস্যা সম্পূর্ণ বিজড়িত। আজ যদি বাঙলার জমিদারবর্গের এইরূপ দুর্গতি না হইত তাহা হইলে দেশ এতদূর হতশ্রী হইত না এবং দেশের শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য এমনভাবে তিরোহিত না।*

* শ্রীঅরবিন্দ সরদার বি, এ, কর্তৃক অনুলিখিত। ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

চিঁড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট

বাঙালীর অন্নসমস্যা সম্বন্ধে বিগত বহু বৎসর যাবৎ এই সুপ্ত বাঙালী জাতিকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করা যাইতেছে। বাঙালীর খাদ্য সমস্যাও ইহার সহিত জড়িত। গত ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া বাঙালীকে খাদ্য বিষয়ে, 'ঘরমুখী' করিবার জন্য নানা বক্তৃতা, পুস্তক ও প্রবন্ধে চা বিস্কুটের সর্ব্বনাশী কুফলের বিষয় ও আবহমানকাল প্রচলিত চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি ঘরের জিনিসের উপকারিতার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। হুজুগপ্রিয় বলিয়া বাঙালীর বড়ই দুর্নাম আছে। সম্ভবতঃ এই হুজুগের বশেই আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা (?) বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিঁড়া, মুড়ি, ও খই বিস্কুটকে সসম্ভ্রমে স্থান ছাড়িয়া দিয়া পল্লী অঞ্চলে আশ্রয় লইতেছে। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের বিস্কুটের বিশেষ আমদানি ছিল না। তখন জ্বর হইলে চিনির মুড়কি দিবার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখন আমরা সভ্য (?) হইতেছি এবং যাহা কিছু বিলাতী তাহাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। বাঙালী দিন দিন কঠোর অর্থসংকটে পড়িতেছে; অথচ গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, অর্থ-সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতাও দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যদি আমার বাড়ীতে একজন আগন্তুক আসেন, এবং তাঁহার সম্মুখে মুড়ি এবং তৎসঙ্গে নারিকেল কোরা, ও শসা গুড় জলখাবাররূপে উপস্থিত করি, তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন (যদি তাঁহার অবস্থা আমার অপেক্ষা হীন হয়) যে—"তিনি হীন অবস্থাপন্ন বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সমাদর করা হইল না।" পক্ষান্তরে আগন্তুকের অবস্থা আমার অপেক্ষা ভাল হইলে তিনি মনে করিবেন—"বেচারা নিতান্ত গরীব ও অসভ্য—তাই এইরূপ গ্রাম্য প্রথায় আমাকে অভ্যর্থনা করিল।" অপরপক্ষে ঐ আগন্তুকের সম্মুখে যদি নূতন টিন খুলিয়া কয়েক খানা বিস্কুট উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভাবিবেন—তাঁহাকে কত না সমাদর করা হইল। অনেক স্থলে অতি শিক্ষিত পরিবারে মার্কিন হইতে আমদানি "পাফ্‌ড্‌ রাইস" (Puffed rice) নামে চাউল হইতে প্রস্তুত হাল্‌কা মুড়ির মত পদার্থ আগন্তুক ভদ্রলোককে নিঃশঙ্কচিত্তে দেওয়া হইয়া থাকে, অথচ দেশের জিনিষ—মুড়ি দিতে গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রে শোচনীয় দুর্ব্বলতা ও দাসমনোবৃত্তির কি চূড়ান্ত পরিচায়ক নহে? সৌভাগ্যের বিষয় এখনও পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া

এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুড়ি ও খইয়ের মোয়ার যথেষ্ট প্রচলন আছে, কিন্তু সহর হইতে নব্য সভ্যতার যে প্রভাব গড়াইতেছে তাহা সুদূর পাড়া-গাঁ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইতেছে এবং অনেক স্থলে এখন ভদ্রসমাজে (?) চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতির ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে। এস্থলে শিক্ষিত বাঙালীর আর একটি অপব্যয়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের চায়ের মজলিসে ফিরপো ও ফারিকের ব্যয়সাধ্য খাবারের ব্যবস্থা না হইলেই চলে না।

এদিকে আমাদের মাদ্রাজী ভাইয়েরা এ বিষয়ে বিশেষ হুঁসিয়ার। তাঁহারা চায়ের পরিবর্ত্তে কাফি পান করেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত ডালমুট প্রভৃতি বিবিধ ভাজি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই কারণে একজন মাদ্রাজীর পার্টিতে যেখানে মাথা পিছু ✓০, ✓১০ খরচ হয়, সেস্থলে আমাদের ফ্যাসান-দুরস্ত চায়ের মজলিসে মাথা পিছু ১৲, ১৷০ টাকার কম পড়ে না। সামান্য আশার কথা এই যে, নব্য বঙ্গ 'ঘরমুখী' হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় যেমন অনেক শিক্ষিত পরিবারে আদরে স্থান পাইতেছে, তদ্রূপ সোডা ওয়াটারের স্থলে ডাবের জল এবং খাদ্যাদির বিষয়েও গৃহপ্রাঙ্গনজাত শাক-শবজি ফল মূলাদির প্রতি ক্রমশঃ শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইতেছে। দিন দিন টম্যাটো এবং বাতাবী লেবুর কিরূপ আদর বাড়িতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সহজ ভাষায় সাধারণের নিকট পৌছিলে শিক্ষিত বাঙালী তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। পূর্ব্বে বিবিধ পীড়ায় খই-মণ্ডের পথ্যের প্রচলন ছিল; চিঁড়ার জল বা কাথও পেটের অসুখে সুপথ্য বলিয়াই লোকে জানিত। আশা করি অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙলার জনসাধারণও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলির প্রতিই বর্ত্তমান যুগে অধিকতর অনুরাগ দেখাইবেন, এবং প্রাত্যহিক জীবনে তাহা প্রতিপালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন।

আজকাল এ. বি. সি. ডি. প্রভৃতি বিবিধ ভাইটামিনের কথা সকলেই জানেন, এবং সেগুলি দৈনিক আহার্য্যের মধ্যে পাবার জন্য সকলেই সাতিশয় আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। ভাইটামিন 'বি' (১) আমাদের পরিচিত; এপিডেমিক ড্রপসি' রোগে ফলপ্রদ না হইলেও হৃদযন্ত্রের সুস্থতা ও সাধারণ স্বাস্থ্য উহার উপরে যথেষ্ট নির্ভর করে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভাইটামিন 'বি (২) মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থতার জন্য অপরিহার্য্য, এবং এই উভয়বিধ উপকারী

ভাইটামিনই চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতে বিস্কুটের অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। অনেকে মনে করিতে পারেন এত উত্তাপে তৈয়ারি এই সব দ্রব্যে ভাইটামিন কি করিয়া থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র ভাইটামিন 'সি' উত্তাপে সহজে নষ্ট হয়, অন্য ভাইটামিনগুলি উত্তাপে সহজে নষ্ট হয় না। (আমাদের 'খাদ্যবিজ্ঞান' পুস্তকের ভাইটামিন অধ্যায়ে সহজ ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে)।

অনেকে জানেন, চাউলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮।১০ অংশ নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ বা প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন খুব উপকারী বলিয়া জানা গিয়াছে। এস্থলে বলিয়া রাখি যে চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতেও প্রোটিনের পরিমাণ চাউলের প্রোটিনের পরিমাণের মতই পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধে আলোচ্য সামগ্রীগুলির ভাইটামিনের পরেই ডেক্‌ষ্ট্রিন (dextrin) নামক পদার্থের পরিমাণের প্রতি আমরা বেশী মনোযোগ দিব। অনেকেই অবগত আছেন যে, চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতির প্রধান উপাদান শ্বেতসার (starch)। উত্তাপে এবং লালা ও অন্ত্রের রসে যে জারক পদার্থ (engyme) থাকে তাহার ক্রিয়ায় শ্বেতসার প্রথমতঃ ডেক্‌ষ্ট্রিনে পরিণত হয়। ডেক্‌ষ্ট্রিন আবার গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষাশর্করা হইয়া আমাদের রক্তস্রোতে প্রবেশ করিয়া শরীরের তাপশক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, শ্বেতসার অপেক্ষা ডেক্‌ষ্ট্রিন অনেক সহজপাচ্য পদার্থ। ভাজা চিঁড়া, মুড়ি, খই, লুচি প্রভৃতিতে ডেকষ্ট্রিনের পরিমাণ সচরাচর বেশী থাকে। আমাদের ধারণা ছিল বিস্কুটে ডেকষ্ট্রিনের পরিমাণ বেশী হইবে। কিন্তু পরীক্ষায় অন্যরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরবর্ত্তী তালিকাতে উহা বেশ বুঝা যাইবে। অবশ্য বিভিন্ন বিস্কুটে উহার সামান্য ইতর-বিশেষ হওয়া অসম্ভব নয়।

বৎসরাধিক কাল হইতে বেঙ্গল কেমিক্যালের বায়োক্যামিক্যাল বিভাগে চিঁড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষা চলিতেছে। প্রাণীর উপর (শ্বেত ইন্দুরের) পরীক্ষায় ভাইটামিন বি১ ও বি২ নির্ণীত হইয়াছে, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে উহাদের ডেক্‌ষ্ট্রিনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এস্থলে ভাইটামিন বি১ ও বি২-এর সাধারণ উপকারিতা, এবং উহাদের দৈনন্দিন চাহিদা সম্বন্ধে কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক—স্নায়ুমণ্ডলীকে দৃঢ় ও স্নিগ্ধ রাখিতে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে, কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করিতে এবং পরিপাক-শক্তি বাড়াইতে ভাইটামিন বি১ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধিরও

ব্যাঘাত ঘটে। এই পদার্থের অভাবে পাকস্থলী ও অন্ত্রের জারক-রস সম্যক নিঃসৃত হয় না—এ কারণ পরিপাক শক্তি হ্রাস পায়। একজন বয়স্ক সুস্থ লোকের প্রতিদিন ১৫০ ইউনিট ভাইটামিন বি১ প্রয়োজন। আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব কাঁচা লাল চিঁড়ার প্রতি ১০০ গ্রাম (gramme) বা ৯০ তোলাতে ৩৪·৫ ইউনিট ঐ ভাইটামিন লক্ষিত হইয়াছে; সুতরাং যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, একজন বয়স্ক লোক অন্য কোন খাদ্য আদৌ না খায় তবে তাহার বি১ ভাইটামিনের দৈনিক চাহিদা মিটাইতে ($\frac{১৫০}{৩৪\cdot৫}$ × ১০০) গ্রাম বা ৪৩০ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় আধ সের লাল চিঁড়ার আবশ্যক। আমরা সাধারণ খাদ্যে—মুগ, মটর, মসুরি প্রভৃতি ডা'ল, বাঁধাকপি, বেগুন, শাঁকআলু প্রভৃতি হইতেও এই ভাইটামিন পাইয়া থাকি। ভাতের ফেন না ফেলিলে উহাতে এই ভাইটামিন বেশ খানিকটা পাওয়া যায়।

ভাইটামিন বি২-র অভাবে চর্ম্মরোগবিশেষ, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার অভাবে চোখে ছানি পড়ে বলিয়া প্রকাশ। জীবনী-শক্তির বৃদ্ধি ও শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থতাও ইহার উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। পরীক্ষাগারে ভাইটামিন বি২-বঞ্চিত শ্বেত ইন্দুরের যখন ওজন কমিতে থাকে। তখন ঐ ভাইটামিনযুক্ত যে পরিমাণ খাদ্য খাইতে দিলে উক্ত ইন্দুরের সাপ্তাহিক দশ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণ খাদ্যে এক ইউনিট ভাইটামিন বি২ আছে ধরা হয়। ভাইটামিন বি১-এর ইউনিটও সাধারণতঃ এইরূপেই স্থির করা হয়। প্রত্যেক বয়স্ক সুস্থ লোকের দৈনিক এরূপ ১৫০ ইউনিট ভাইটামিন বি২ আবশ্যক বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করি—আমাদের তালিকাতে ১০০ গ্রাম বা ৯ তোলা মুড়িতে ১ ইউনিট ভাইটামিন বি২ আছে দেখিলে, উহার ধারণা করিতে আর আমাদের বেগ পাইতে হইবে না। বলা বাহুল্য, ভাইটামিন বি১-র মত বি২-ও আমরা বিভিন্ন ডালে, বাঁধাকপি, শাঁকআলু, বেগুন, দুধ, ডিম প্রভৃতি হইতেও পাইয়া থাকি।

নিম্নের তালিকায় চিঁড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল :—

	প্রতি ১০০ গ্রাম (৯ তোলা) দ্রব্যে কত ইউনিট		প্রতি ১০০ অংশে কত অংশ
	ভাইটামিন বি১	ভাইটামিন বি২	ডেক্‌ষ্ট্রিন
লাল চিঁড়া (কাঁচা)	৩৪·৫	১৮·৫	১·৫
,, (ভাজা)	৩৪·৪	৭·৫	৪·১

	ভাইটামিন বি১	ভাইটামিন বি২	ডেকৃষ্ট্রিন
সাদা চিঁড়া (কাঁচা)	২২·৫	১২·৫	১·৭
" (ভাজা)	১৮·৫	৭·৫	২·৮
মুড়ি	১৪·৫	১১·০	৬·১
খই	১৩·০	১৪·০	৫·৭
বিস্কুট	১২·০	১১·১	১·৯

উল্লিখিত তালিকাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি—চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি প্রত্যেক সামগ্রীতেই বিস্কুট অপেক্ষা ভাইটামিন বি১ বেশী আছে। খই এবং কাঁচা চিঁড়াতে ভাইটামিন বি২ বিস্কুটের চেয়ে বেশী এবং মুড়ি, খই ও ভাজা চিঁড়াতে বিস্কুট অপেক্ষা অনেক বেশী ডেকৃষ্ট্রিন বিদ্যমান। ঈষৎ ভাজা চিঁড়া মুখরোচক, উহাতে ডেকৃষ্ট্রীনের পরিমাণও বেশী, অথচ উহাতে ভাইটামিনেরও বেশী অপচয় হয় না। এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া সাগরদাঁড়ির কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

"যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরে' ঘরে—
মাতৃদত্ত খাদ্যে শক্তি স্বাস্থ্য পাবি ফিরে।"

এখন বিস্কুটের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত খাবারগুলি— চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি দামের দিক হইতেও কত সস্তা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

২ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ ছটাক ওজনের এক টিন বিস্কুটের দাম দেশী হইলে ১৸০—১৷৷০, বিলাতী হইলে ১৸০ হইতে ৪৲, টিনের দাম ৶০—৷০ তো একেবারেই অনর্থক। এখনও অনেক বাড়ীতে মুড়ির চাউল প্রস্তুত হয়। চিঁড়া, খই অনেক সময় বাড়ীতে তৈয়ারী হইয়া থাকে। চৌদ্দ ছটাক মুড়ির চাউল ঘরে তৈয়ারী করিলে উহার দাম বড় জোর ৵০আনা পড়ে, এবং উহা বালি খোলায় ভাজিয়া লইলে গরম গরম অতি উপাদেয় মুখরোচক মুড়ি প্রস্তুত হয়। এখন আমরা দেখিতেছি ২ পাউণ্ড বিস্কুট ও ২ পাউণ্ড মুড়ির দামের পার্থক্য ১৲ টাকা হইতে ১৷৷০ পর্য্যন্ত; সুতরাং খাদ্যোপযোগিতার (food value) দিক হইতে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, তদ্ভিন্ন পয়সার দিক হইতেও আমাদের ঘরের তৈয়ারী চিরপ্রচলিত ও চির-আদরের জলখাবারগুলি বিস্কুটের চেয়ে অনেক বেশী সস্তা। চকচকে টিনের মোড়ক খুলিয়া কয়েকখানি বিস্কুট ছেলেদের দেওয়ার চেয়ে সদ্যভাজা মুড়ি দিলে গৃহিণী যে কত বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাহা কর্ম্মঠা প্রাচীনাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ উপলব্ধি করা যায়।

ইহার পরে চিঁড়া, মুড়ি প্রভৃতির অনুপানের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ঈষৎ ভাজা চিঁড়ার সঙ্গে নারিকেল কুচি বা নারিকেলের কোরা ও গুড় অতি উপাদেয়। নারিকেলের স্নেহজাতীয় পদার্থ অতিশয় পুষ্টিকর। তদ্ভিন্ন গুড়ের মধ্যে বিভিন্ন শর্করা পদার্থ ছাড়া উপকারী লবণ পদার্থ ও ভাইটামিন বি ও সি পাওয়া যায়। গুড় যে সাদা চিনির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা এখন সকল খাদ্যবিদ্ এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন। স্বাস্থ্যবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেকটর ডাঃ বেণ্টলী সর্ব্বদাই বলিতেন—"সাদা চিনির চেয়ে গুড় অনেকাংশে ভাল।" বিলাতে স্বর্গীয় স্বনামধন্য রাসায়নিক আর্ম্মষ্ট্রং সাদা চিনি ও ময়দাকে অন্তঃসারশূন্য (whited sepulchre) আখ্যা দিয়াছেন। নূতন গুড়ের নলেন গন্ধযুক্ত আস্বাদ অবর্ণনীয়। গুড় চিনির অপেক্ষা দামেও সস্তা—মুখরোচকও বটে, সুতরাং ইহাকে উপেক্ষা করা কতদূর বিকৃতরুচির পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। সাদা চিঁড়া অপেক্ষা লাল চিঁড়া যে ভাইটামিনের তরফ হইতে বহু অংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বপ্রদত্ত তালিকাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। পল্লীগ্রামে কলা, গুড়, চিঁড়া, বা আম কাঁঠাল ও চিঁড়া (অবশ্য ইহাদের সঙ্গে দধি দুগ্ধ থাকিলে তো সোনায় সোহাগা), শশা, নারিকেল কোরা, টাটকা মূলা বা কড়াইশুঁটির সঙ্গে মুড়ি, খইএর মোয়া, মুড়কি প্রভৃতি কত সুলভ ও পুষ্টিকর খাদ্য তাহা ভুলিলে জাতীয় স্বাস্থ্যের কি শোচনীয় অধঃপতন হইবে তাহা প্রত্যেক বাঙালীরই বুঝা কর্ত্তব্য। ভিজানো ছোলা, মুগের অঙ্কুর, শাঁক-আলু ও গুড় যে আদর্শ জলখাবার তাহা ভুলিলে চলিবে না।

সম্প্রতি একটি ধুয়া উঠিয়াছে—রুটি না খাইলে বাঙালী জীবন-সংগ্রামে টিঁকিতে পারিবে না। ইহার মূলে যথেষ্ট সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙালায় যব গম কিয়ৎ-পরিমাণ জন্মিলেও ধানই প্রধান ফসল, এবং এই ধানের ভাত খাইয়াই একদিন প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ভীম ও দিব্যক প্রভৃতি অমিত বিক্রম ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়াছিল ; বিজয়সিংহও 'ভেতো' বাঙালী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমগ্র মঙ্গোলীয়ান জাতি—জাপান, চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের অধিবাসীদের ভাতই যে প্রধান খাদ্য তাহা অনেকে অবগত আছেন। সুতরাং বাঙালীকে বীর্যশালী হইতে হইলে ভাত ছাড়িয়া রুটি ধরিতেই হইবে এমন কোনও কথা নাই। অবশ্য যাঁহারা চাউল কিনিয়া খান তাঁহাদের পক্ষে আটা ময়দার আংশিক প্রচলন অবাঞ্ছনীয় নয়।

শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে ফলমূলের অভাব নাই। শশা, কলা, টম্যাটো, আম,

জাম, কাঁঠাল, জামরুল, নারিকেল, পেয়ারা, লিচু, আতা, আনারস, পেঁপে, লেবু প্রভৃতি ফল অধিকাংশ গৃহস্থের প্রাঙ্গণেই দেখা যায়। এইগুলিতে স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ভাইটামিন সি ও লবণপদার্থ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলের বিভিন্ন শর্করাজাতীয় পদার্থ অতিশয় বলকারী। এই সব ফল চিঁড়া, মুড়ি, খই বা গুড় প্রভৃতির সহিত জলখাবারের সময় খাইলে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি অবশম্ভাবী।

অতিরিক্ত চা-পানজনিত কুফলের কথা আমাদের 'খাদ্যবিজ্ঞান' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই স্থলে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের অভিমত উদ্ধৃত করা হইল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-ডি মহাশয় বলিয়াছেন, বাঙলাদেশে আবহমানকাল প্রচলিত গুড় ছোলা, আদা ছোলা, ফেনে ভাত ও দুধ—যাহা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রাতঃকালে জলখাবাররূপে ব্যবহার করিতেন তাহা পুষ্টিকারিতা ও ভাইটামিনের পক্ষ হইতে বাস্তবিক প্রশংসনীয় ছিল। ধনীরা পূর্ব্বোক্ত খাদ্যের সহিত মাখন, মিছরি ও সময় সময় ছানা খাওয়াতে তাঁহাদের প্রাতরাশ আদর্শ খাদ্যের মধ্যেই পরিগণিত হইত।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান টি-অ্যাসোসিয়েশন তাঁহাদের ব্যবসায়ের সুবিধাকল্পে এ দেশে চা-এর প্রচলনের নিমিত্ত বিরাট অভিযান আরম্ভ করেন। এদেশের লোক দারিদ্র্যপ্রযুক্ত প্রচলিত জলখাবার ও চা দুইটি একসঙ্গে জোগাড় করিতে অসমর্থ হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলখাবার উঠিয়া গিয়া শুধু চা-পানই জলখাবারের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যখন অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ-রূপ দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং দেশবাসী ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চিরাচরিত খাদ্য প্রথা পরিত্যাগ করিতে থাকেন তখন কেহই,-এমন কি দেশের স্বাস্থ্যবিভাগও লোককে সাবধান করিয়া বলেন নাই যে, চায়ের সহিত ব্যবহৃত অল্পমাত্র দুগ্ধ (তাহাও সব সময়ে খাঁটি নয়) ব্যতীত খাদ্য হিসাবে উহার আদৌ কোন মূল্য নাই।

বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও মাসিক-পত্রের গল্পলেখকগণ তাঁহাদের লেখার ছত্রে ছত্রে চায়ের বৈঠকের বর্ণনা দ্বারা এই প্রচারকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন।

ডাঃ জে. ওয়ালটার কার এম. ডি., এফ. আর. সি. এস. (লণ্ডন) বলিতেছেন —"চা ও কফি হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, উপযুক্তভাবে প্রস্তুত চা-ও অতিমাত্রায় ব্যবহারে (অনেকের আবার অত্যল্পতেই) অজীর্ণ, স্নায়ুবিকার,

হৃৎস্পন্দন, শিরোঘূর্ণন ও অনিদ্রা উৎপন্ন করে। খাদ্যের পরিবর্তে চা-পান এবং পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূরীকরণে চা-এর ব্যবহার—যে সময় মস্তিষ্কের প্রকৃতপক্ষে বিশ্রাম আবশ্যক সে সময় চায়ের প্রভাবে অসাড় করিয়া উহাকে খাটান অতিশয় অহিতকর।"

কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উইনিপেগ অধিবেশনের কেম্‌ব্রিজের ডাঃ ডাব্লুউ.এফ.ডিক্‌সন বিবিধ মাদকদ্রব্যের তুলনামূলক সমালোচনায় বলিয়াছিলেন—"যে সমস্ত কারণে স্নায়ুবিকার জন্মে ক্যাফিন সেবন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। চা ও কফিতে যথেষ্ট ক্যাফিন থাকে। এক পেয়ালা ভাল চায়ে সাধারণতঃ এক গ্রেণেরও অধিক ক্যাফিন দৃষ্ট হয়; সুতরাং প্রত্যেক চা-পায়ী দৈনিক পাঁচ হইতে আট গ্রেণ ক্যাফিন উদরস্থ করিয়া থাকেন এবং ইহা নিতান্ত অবহেলা করিবার নহে। চা-পানে পুনঃ পুনঃ ক্যাফিন শরীরস্থ হইলে মানসিক উত্তেজনা, শিরোঘূর্ণন এবং পরিপাকশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

এইরূপ পরিপাকশক্তির দৌর্ব্বল্যকে চা-পানজনিত ডিস্‌পেপসিয়া (Tea-dyspepsia) বলে। অতিরিক্ত চা-পানে অম্লরোগ, পেটকামড়ানি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য ও হৃদযন্ত্রের বৈলক্ষণ্য জন্মে।

খাদ্য হিসাবে বিস্কুটের স্থান কোথায় তাহাও আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইলাম। আশা করি, বাঙালার নব্য-গৃহলক্ষ্মীগণ তাঁহাদের মাতা, মাতামহীর আদর্শ অনুকরণ করতঃ চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রস্তুত ও তাহা পরিবেশন করিয়া স্বাস্থ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন এবং সর্ব্বনাশা চা বিস্কুটকে কদাচ ত্রিসীমানায় আসিতে দিবেন না।*

*ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৪৫। সহলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস, এম. এস-সি.

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান

শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন, তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল, নাম বা ঠিকানা ভুলিয়া হয়তো তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লজ্জা হয়, মাতৃভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ, যে আসনে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ও বাতুলতা মাত্র। তারপর আমি এক প্রকার চিররুগ্ন। দূর প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করা আমার শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু শশধরবাবু যখন পরদিন সাহিত্য-পরিষদের দুই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ মশককে ধৃত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমি একপ্রকার বন্দীভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত। এই গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন জানিনা। তবে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই শাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া আজ সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করিতেছি।

স্থানীয় কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

জাতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক। যে কোন দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সে দেশের তৎকালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কারণ, সাহিত্য জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির শাব্দিক বিকাশ মাত্র।

যেমন চিত্রকর নীরব ভাষাতে চিত্রিত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সজীবতা প্রদান করেন, যদ্বারা আলেখ্য বিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়, তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র মুখরিত হয়। বাংলা সাহিত্যের সূচনা হইতেই তাহাতে ধর্ম্ম প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কেবল এই একই সুর। এই ভাবের চরম বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। প্রেমের জয়, নামে রুচি, যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র, সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদন-স্রোতে দেখিতে পাই সেই এক ভাব—ধর্ম্মপ্রবণতা। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আমরা আজ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বীণানিক্বণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করি। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব। ইহার আদ্যোপান্ত "নিকষিত হেম"।

এই ধর্মসাহিত্যের স্রোত মাণিকচাঁদের সময় অর্থাৎ খ্রীঃ একাদশ শতাব্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙলা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টিসাধন ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই স্রোত আজও প্রবাহিত হইতেছে। গত কয় বৎসর বাঙলা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্মবিষয়ক।

বাঙালা সাহিত্য কোন্ সময়ে গদ্যের প্রথম আর্বিভাব হয় তাহার আলোচনা করিবার সময় আমাদের নাই। তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে, গদ্য সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গ সাহিত্য নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে। কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরাম-পুরের মিশনারীগণ, রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামরাম বসু, রাম-মোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই যুগের প্রবর্ত্তক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত কথা কয়টী বলিয়া তাঁহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন :—

"ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমস্ত জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙালী এখন বাঙলা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্রতীরে খেলা

করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কুরিত না হয়?"

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা প্রভাবে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যকে বিদ্যাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙলা সাহিত্যের শব্দবিন্যাস বর্ত্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদে পরিপূর্ণ। এক পংক্তি রচনার মধ্যে ৩।৪টি দুরূহ সমাসবদ্ধপদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। পাঠকদিগের নিকট ইহা কিরূপ সুখপাঠ্য হইবে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। Fort William Collegeএর পাঠ্যপুস্তক "প্রবোধ চন্দ্রিকা" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "কোকিলকলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র "আলালের ঘরের দুলালে"র মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপকেরা ঘিকে "আজ্য" বলিতেন, কদাচ 'ঘৃতে' নামিতেন। খইকে "লাজ", চিনিকে "শর্করা" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাহা হউক নূতন বন্যায় সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনিতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছ্বাস গীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অনুশীলন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাংলা সাহিত্য সমগ্র ভারত সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিঞ্চন করিয়া উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত, শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আজ আমাদের সম্মুখে একটি

ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্নতি হইয়াছে মাত্র, সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্যাংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে ইহাও সত্য বটে : কিন্তু একটি মাত্র কারণে ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা হয় সেই অঙ্গে দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে, আবার যে অঙ্গের চালনা হয় না, তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া পরে একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য ঋষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লুপ্ত হইল। চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত যিনি যত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে তত জ্ঞানবান বলিয়া আদৃত হইতেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ধাতুবাদ (Chemistry and Metallurgy) এ সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও বাছিয়া লইবার জন্য উদ্ভিদ-বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থিবিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের মধ্যে শল্যতন্ত্র (Surgery) একটি প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে যে ক্ষারপাকবিধি বর্ণিত আছে তাহা নব্যরসায়ণ শাস্ত্রের এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ জ্ঞানে ও ধর্মে বর্তমান জগতেরও আদর্শ, যাঁহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সাম গান একদিন ভারতের বন-ভবনে উচ্চারিত ও গীত হইয়া ভারতে ধর্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাযমুনা আবহমানকাল হইতে কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র করিয়া সাগর সঙ্গমে ধাইতেছেন, সেই ভারতের, সেই পুণ্যদেশ আর্য্যাবর্তের জ্ঞানরবি, দুর্ভাগ্য বংশধর, আমাদিগের দোষে অস্তমিত হইল। সত্যই কবি গাহিয়াছেন :—

"অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, ঔষধ সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ পরিচয়ের ভার বেদিয়া জাতির উপর সমর্পিত হইল। অস্ত্র চালনার দুঃসাধ্য ভার নরসুন্দরের উপর ন্যস্ত হইল! যাহা হউক, অতীতের আলোচনা ও অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই, এখন সময় আসিয়াছে।

গত কয় বৎসর বাঙলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্য-পুস্তক-শ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও এশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙলা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙলা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বাঙলা সাহিত্যের অস্থি মজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'Lord Hardinge' এর আনুকূল্যে Encyclopaedia Bengalensis' অথবা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্বসকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষ-শাস্ত্রবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় প্রচলিত সাহিত্যের (Classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইহাদের পূর্ব্বেও বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্‌লা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙলা' বলিয়া তাঁহাদের কৃতকার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ইয়েটস্ প্রথমে 'পদার্থ-বিদ্যা-সার' বাঙ্‌লা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন "কিমিয়া বিদ্যাসার" নামক রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ 'সমাচার দর্পণ,' নামে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্‌লা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার 'দিগ্‌দর্শন' নামক নানা তত্ত্ব-বিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্‌লা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খৃঃ "বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি" (Society for Translating European Sciences) নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন্ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় "বিজ্ঞান সেবধি" নামক গ্রন্থের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ Vernacular Literary Society নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্‌লা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গভর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকুল্য করিতেন। এই সভার উদ্‌যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন প্র্যাট্ এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই:—

"বাঙ্‌লার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ-লিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্পমূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতি উপদেশসূচক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" (বিশ্বকোষ)

বিজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। ১৭ খানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠক সাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্-ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা এই তিন-স্থানে ৩টি নর্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্‌লা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল সমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা রসায়নবিদ্যা-ঘটিত অনেক-গুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্‌লা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্‌লা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্‌লা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফল-লাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট্‌তি আছে, তাহা Text Book Committee-র নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত। সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপানস্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে তদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিদ্যালয়ের ২।৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশই যেখানকার ছাত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবক-গণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, কিম্বা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও

অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূর পরাহত। বস্তুতঃ একজামিন্ পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চির-বিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোনদেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আহ্লাদের স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয়ত উদ্ভিদ বিদ্যায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম্.-এ. পাশ হইলেন; কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। সে সমুদয় যুবকগণকে ২।১ বৎসর পর আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসা-শূন্য জ্ঞানালোচনার এই ত পরিণাম! জাপানের জ্ঞান-তৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা দুই তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সম্প্রতি সঞ্জীবনীতে কোন বাঙালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। কি ছোট, কি বড়, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাকল্

(Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁকো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত তাহা শুনিবার জন্য দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বারতা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেসাঘেসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরি-গহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার কুকুর ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোদাল, বেল, বাবলা ও শ্যেওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি এসবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবে কতকদূর চলিতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ছুরি, কাঁচি, অনুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য পিপাসা কোথায়? এদেশের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউ-রোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য

করিতে থাকেন, ভোগলালসা তখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান-পিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন উদ্ভিদ্‌নিচয় আহরণের জন্য Sir Joseph Hooker ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে Darjeeling Himalayan Railway হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলারোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে ; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসা! যখন ন্যানসেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল।

আমাদের পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় বাঙলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য—ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার ভাবী উন্নতিবিধানের উপায়-নির্দ্দেশ। তিনটি দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এবিষয়ে আমাদিগকে সহায়তা করিবে। কারণ ইতিহাসে সদৃশ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। যাহা জার্ম্মানীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুসিয়াদেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহা বাঙ্‌লা-দেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মান সাহিত্যের কি দুর্গতি ছিল! সত্য বটে, মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও চর্চ্চা বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে লাটীন ও গ্রীকই অধীত হইত এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। এমন কি Frederic, the Great মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া ভলটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি করিতেন এবং তাঁহার নিকট একটু বাহবা পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

কিন্তু Frederic এর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই Schiller, Goethe, Kant প্রভৃতি একদিকে, আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Liebig, Wohler প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপর দিকে জার্ম্মাণ ভাষাকে মহাশক্তিশালিনী করিয়া তুলিলেন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রুসিয়ার যে কি দুরবস্থা ছিল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহামতি Buckle ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে সুসভ্য আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনার্য্য জাতির ভাষা আজ

আদর্শ স্থানীয়। যে ভাষা রুশভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুষ রসায়নশস্ত্রবিৎ Mendeleef স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুষ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

অধিক কি, এশিয়া খণ্ডেই ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান কি ছিল, আর কি হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সমুদয় স্বদেশপ্রেমিক বর্ত্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উৎসাহী আশাপ্রদ যুবকবৃন্দকে প্রতীচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তৎতৎ দেশীয় পণ্ডিতদিগকে জাপানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আনয়ন করেন। বলাবাহুল্য, যদিও উক্ত পণ্ডিতগণ স্বীয় ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন তথাপি শীঘ্রই সে সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর বুঝিল; বুঝিল বৈদেশিক ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না; বুঝিল মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফল কথা এই যে, আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় বিভব হারাইয়া নিঃস্ব ভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্ব্বপুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে খৃঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপ খণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়, প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্য ভারতগগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙালী মস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মনু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবম বর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলের উর্দ্ধতন ও অধঃস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটীল টীকা টিপ্পনী

রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্বিবদবৃন্দ 'প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈর্ঋত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সেদিন কি প্রকার যাইবে' ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ "তাল পড়িয়া ঢিপ করে, কি ঢিপ করিয়া তাল পড়ে" ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তি ভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়োরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বীগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙে সত্য সত্যই বান ডাকিয়াছে। আজ বাঙালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যেদিন রাজা রামমোহন রায় বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলনই ভবিষ্যৎ ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি, এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল আকর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান ইয়োরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয় আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব। এস্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতিগণের আচার পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল, এবং সে সমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ সন্দেহ

নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—যেমন বাহ্যিক জগতে তেমনিই মানসিক রাজ্যে। এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি আশঙ্কিত হইতেছি, পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি; কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানব মাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই; যদি থাকিত তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল সেই জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া এশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে।

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে, নচেৎ ভয় হয় ভারত-ভাগ্য-রবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। জাপানীরা জার্ম্মানী ও রুশিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ মৌলিক গবেষণাসমূহ ইংরাজি ও জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে তজ্জন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই পরিভাষা হইলে যে কতদূর সুবিধা হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানীরা এই সুবিধাটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন; আমাদের তাহাই অবলম্বনীয়, কেননা উক্ত জাতির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃজন করা সাহিত্য সম্মেলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষদ এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত

যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তজ্জন্ত পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। নাগরীপ্রচারিণী সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন। পরলোকগত জগন্নাথ স্বামী তেলেগু ভাষায় রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন ও তাহাতে সংস্কৃত মূলক অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি Vernacular Text Book Committee বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন কবিয়াছেন, এবং আশা কবা যায সাহিত্য সম্মেলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি (Committee of experts) নিয়োজিত করিষা কি ভাবে পরিভাষা গৃহীত হইবে তাহার নিষ্পত্তির উপায় বিধান করিবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য সম্মেলনেব অনুষ্ঠাতাগণ বাংলা সাহিত্যকে সাধাবণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এই দুই ভাগে বিভাগ কবিষা শেষোক্ত বিভাগের কার্য-ক্ষেত্র British Association for the Advancement of Learning and Science-এব আদর্শে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা সদযুক্তি বলিয়া বোধ হয। মানবতত্ত্ব (Anthropology), পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, লোকতত্ত্ব (Ethnology), ভূগোল, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হইয়া যাহাতে তৎ তৎ বিষয়ক গ্রন্থ ,বাঙলা ভাষায প্রচারিত হয, তজ্জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আশা করি এই অধিবেশনে 'রাজসাহী বিভাগেব লোকতত্ত্ব' সম্বন্ধে দুই একটি সারবান প্রবন্ধ পঠিত হইয়া ইহাব সূচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, বাজসাহীব দুইজন কৃতবিদ্য সন্তান পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নূতন পথ দেখাইযা আমাদেব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙালী যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ইতিহাস বচনা করিতে সক্ষম, সিরাজউদ্দৌলাপ্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু দুর্লভ পারসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্নাবলী আহরণ করিতেছেন। তিনি যে সমুদয় বিবরণ লিখিতেছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃতি লাভ করিয়াছি, এবং নিজেকে কল্পনায় অনেক সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি

দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মহৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন—ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদিগের সম্মেলনের একজন উদবোক্তা শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় "মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ" প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা বাঙলা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন হইবার সূচনা হইয়াছে। আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন' ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের কথা অলীক ও পরিকল্পনাপ্রসূত উন্মাদোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশ স্বদেশপ্রেম বলিয়া কথা বহু শতাব্দী যাবত বিস্মৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণকে কি এক অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া সঞ্জীবিত করিল! যে যুবকগণের কাষ্ঠহাসি দর্শনে পূর্ব্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আত্মপ্রবঞ্চনা-মূলক বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আজ কি অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সরসবদনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবায়, জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহু কষ্টে সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল! ইহা কি আশার কথা নহে—ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙালী যুবক পিতামাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া অথবা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য দূরদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব, অশ্রুত-পূর্ব্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে সেই যুবক বিদেশযাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম, আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে আজ দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশার নূতন উদ্দীপনার দিন!

বাঙলার এমন দীনহীন কাঙ্গাল, হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহুত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জ্জিত বিদ্যা লইয়া, সকলে সমবেত হও!

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন. স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী

লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ, একটি অনন্ত অমরত্বের. অপরটি অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছু নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া ঈশ্বর প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি ঊষায় উন্মেষেই হায়, আবার অস্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙলা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, সুবোধচন্দ্র, ও ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত, সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। যাহাতে অধীতবিদ্য বিজ্ঞানবিদ ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ও অনন্যমনে বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙলা ভাষার ও বাঙলা দেশের সেবায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, এমন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিদ্য ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাঁহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাশী নহেন, যাহাতে তাঁহাদের সাংসারিক অভাব মোচন হয় ও তাঁহারা একান্তভাবে বিজ্ঞান সেবায় ব্রতী হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হউক।*

* রাজসাহীতে দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির বক্তৃতা—১৩১৫

ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে

(সুরমা উপত্যকা ছাত্র-সম্মিলনীতে বক্তৃতা)

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্রগণ,—

সর্ব্বাগ্রে আপনাদের সকলের কাছে আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না। এই যে এখানকার নেতাগণ, ছাত্রগণের তো কথাই নাই, আপনারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে ক্লিষ্ট হইয়া এখানে সমবেত হইয়াছেন এবং অনেক দূর থেকে আপনারা সকলে মিলে আমাকে নিয়ে এসেছেন, তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

আমরা মৃত জাতি। এই মৃত জাতিকে যদি সঞ্জীবিত করতে হয়, একে যদি সজীব করে রাখবার চেষ্টা করা যায়, তবে এর চেয়ে সাধু চেষ্টা আর কি হ'তে পারে! এ শুধু কথায় হয় না, কাজ চাই।

আমরা আফিংসেবী না হ'লেও কুম্ভকর্ণের ন্যায় চিরনিদ্রায় অভিভূত। মধ্যে মধ্যে ইলেকট্রিক ব্যাটারি দিয়ে যদি কখনো চৈতন্যের উদ্রেক করা হয়, আবার অমনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হই! এই বাংলার দোষ ঐ দোষটা ছেড়ে আবার আমাদের লেগে পড়ে থাকৃতে হবে। এই ছাত্ররা আমাদের ভবিষ্যৎ। এই ছাত্রদের অভ্যর্থনা আমার কাছে পবিত্র। কাজেই তাদের নিমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা করিতে পারলাম না। এই ছাত্রবৃন্দের আহ্বান আমার কাছে ঈশ্বরের বাণীর মত। সেইজন্য নানা অসুবিধা সত্বেও আমি তাদের কাছে এসেছি। আমি যেমন ছাত্র, আমার ছাত্রেরাও তেমনি ছাত্র। আমার ছাত্রত্ব যে কবে সুরু হল, কবে গেল তা আমি ঠিক করে উঠতে পারি না। ছাত্রদের সহবাসে থাকলে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি যেন আবার যৌবনসুলভ বল বিক্রম ও উদ্যম লাভ করি। একথা ঠিক না, যে ছাত্রেরা কেবল দু'ছত্তর পড়বে, আর পরীক্ষা পাশ করতে পারলেই সব শেষ হয়ে যাবে। এই পুঁথিগত বিদ্যাই সর্ব্বনাশের মূল, শিক্ষার এরূপ প্রথায় এক প্রকার ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

ছাত্র কি, শিক্ষক কি, আমি তাহা জানি না। When I ceased to be a student তা' ও আমি বলতে পারি না।

পুঁথিগত বিদ্যাই যে বিদ্যা তা ভাববার কোন কারণ নাই। ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপানের সঙ্গে তুলনায় আমাদের অবস্থা কি? ইংলণ্ডে মাতৃক্রোড়ে, by the fire side যা শিখে আমাদের দেশে বি. এ. পাশ করেও তা হয় না। ইংলণ্ডে মায়েরা শিক্ষিতা। আমাদের মায়েরা তা নয়। আমাদের দেশে শতকরা ৫ জন মাত্র literate—তারা সকলে Graduate নয়—কোনরকমে আঁকাবাঁকা করে নামটা স্বাক্ষর করতে পারলেও তাকে census-এ literate ধরা হয়। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতা '০৫, বোধ হয় আরও কম।

ভারতবর্ষে যদি depressed class কাউকে বলতে হয়, তবে এই মহিলাগণই depressed. আমরা তাঁদের চিরকাল বাহিরে রেখেছি, জ্ঞানের আলো হতে চিরকাল বঞ্চিত করে রেখেছি। আমাদের ছেলেরা যখন মাতৃস্তন পান করে তখন তার সঙ্গে সুশিক্ষা না পেয়ে কুশিক্ষা পায়। মা, দিদিমা, আই-মা, তাঁদের কাছ থেকে সুশিক্ষা পায় না! "What is bred in the bone does not go out of the flesh." ইংলণ্ডে মায়ের কোলে বসে যা শেখে আমাদের দেশে তা পারে না। তাদের জ্ঞানস্পৃহা বড়ই বলবতী; তাদের একটা spirit of inquisitiveness আছে, আমাদের তা নেই। তারা ভ্রমণকাহিনী কত পড়ে। Nansen, Livingstone. Franklin প্রভৃতি যাঁরা ভুবন পর্য্যটন করেছেন, অনন্যমনা হয়ে তাদের ভ্রমণকাহিনী অধ্যয়ন করে। Stories of Adventure তাদের বলে পড়াতে হয় না। আমাদের দেশে Livingstone, Nansen,-প্রভৃতি explorer-দের নাম অনেকে জানে না। আমাদের দেশে Paradise Lost এক কেণ্টো, ভট্টিকাব্য দুই সর্গ, রঘুবংশ দুই সর্গ—এর বেশী কিছু পড়ি না! এর সঙ্গে আবার টিকাটিপ্পনি—মল্লিনাথে কুলায় না, তার উপর আবার তারাকুমার কবিরত্ন চাই, সারদারঞ্জন রায় চাই। কে পরীক্ষক হবেন, কে কোন্ ধাতে প্রশ্ন করেন, কোন্ কলেজে পড়ান, চিঠি লিখে তার নোট আনাও। আর তাতে লাল, নীল পেন্সিলের দাগ দাও। কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করলেই যেন লেখা পড়া শেষ হয়ে গেল; জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হল। আমার একজন বন্ধু বলেছিলেন, একবার পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরী হতে লাগল। আমার সেই সর্ব্বজনবিদিত বন্ধু পরে জানতে পারলেন যে tabulator হিসাব করে দেখেন যে শতকরা

১০১ জন পাশ হয়ে গেছে। তখন ইউনিনিভারসিটির কর্ত্তারা ভাবলেন, এতো বড় গোলমাল, আচ্ছা 'লটারী' করে পাশের সংখ্যা কমিয়ে দাও।

এত বড় মেকী জিনিসে কি করে চলে? আমাদের দেশে B. A., M. A. যারা পাশ করেছেন, তাঁরা এত কম জানেন যে বলতে লজ্জা হয়। তাঁদের নিকট anything which is outside the prescribed books is anathema. কোনরকমে ফাঁকি দিয়ে একটা ডিগ্রী নেওয়া। আমি বলে আসছি ডিগ্রী ও নকরিতে বাঙালী জাতির সর্ব্বনাশ হলো একেবারে।

প্রথম যখন আমাদের দেশের লোকেরা কিছু লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি পেতে লাগল, সেই অবধি আমাদের একটা সংস্কার হয়ে গেল যে, লেখাপড়া শিখেই চাকরি পাওয়া যায়। এই অবসরে অবাঙালীরা এসে জীবিকা উপার্জ্জনের পথ করতলগত করে নিল। এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি, এখন আর তার অবতারণার দরকার নেই।

* * * *

বিলাতের আদর্শে আমাদের চলে না, আয়ের ঢের তফাৎ। গাছের তলায় বসে প্রাচীনকালে বিদ্যাশিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করত। বৃহদারণ্যক—আরণ্যক শব্দের অর্থ বিলাতে গিয়া Maxmuller সাহেবের কাছে শিখি—ষড়দর্শন, গীতা, উপনিষদ্ সব উৎপত্তি অরণ্যে। বনে মুনিগণ শিষ্যদিগকে যা উপদেশ দিতেন তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৮ লক্ষ টাকার রাজপ্রাসাদে ঐ সব মুনিদের নিয়ে বসালে ঐ সব জিনিস বের হতো না। ট্রিনিটি কলেজের মত অতুল ঐশ্বর্য্য বিভবে যা হয়, self-taught শ্রমজীবিদের তার চেয়ে কম শিক্ষা হয় না।

আমাদের দেশে কৃষকেরা যদি রোজ ৩ ঘণ্টা করে পড়ত, তাহলে এক বৎসরে ১০০০ ঘণ্টায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারত!

এখন আমাদের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন Mr. Ramsay Macdonald—তিনি ছিলেন son of a poor working man. তাঁর কেবিনেট মিনিষ্টার Benspoor, and Clynes-ও কয়লার খাদে কাজ করতেন। ১০০০, ২০০০ হাজার ফুট নীচে কোদালী দিয়ে কয়লা কেটে, নিজ চেষ্টায় তাঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন। সেই "Hoary headed labours" আজ আমাদের ভাগ্য বিধাতা। Mr. Ramsay Macdonald ২০ জন peer-এর লিষ্ট দিয়ে যদি রাজাকে বলেন to affix his signature, রাজাকে তখনই সহি করিতে হইবে। ১৯১১ সনে Mr. Macdonald বঙ্গের অঙ্গ ছেদের সময় ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ

ক'রে The Awakening of India নামক একখানা বই লিখিয়াছেন, আমি বইখানা কণ্ঠস্থ করেছি। তিনি এতে যেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখিয়েছেন, যে সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছেন। যাঁরা ২৫, ৩০ ৭২৭ বছর যাবৎ ভারতে আছেন তাঁরা তা করতে পারেন নি।

ডাঃ Hawkins আগ্রা গভর্ণমেণ্টের Chemical Examiner ছিলেন। তিনি Cambridge St. John College-এর fellow The Limitations of the Expert তাঁর পুস্তক। তিনি কেতাবি বুদ্ধির কথা সম্পর্কে বলেছেন—একটি স্কুলের অনেক ছেলে Scholarship পেত, but it is so notorious that none of them was even heard of again; কিন্তু পরে সংসারে ঢুকে তারা কোথায় যে তলিয়ে গেল খোঁজ পাওয়া গেল না। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের লক্ষ্য কেবল ঐ দিকে। কোন্ স্কুলে কতজন ছেলে first division-এ পাশ করলে আর তার মধ্যে কত ছেলে scholarship পেল—যে স্কুলে এর সংখ্যা বেশী, সব ছেলে ঐ স্কুলের দিকে ছুটবে। এই যে পুঁথিগত বিদ্যা এই দিকেই লক্ষ্য—যেমন আমাদের নৈয়ায়িক পণ্ডিত পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র এই ভাবতে ভাবতে এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে চলে গেলেন, তেমনি আমাদের মধ্যে যারা বড় বেশী কলেজের বই পড়ে তাদের initiative আর resourcefulness থাকে না; তাই বাঙালীর এই দুর্দ্দশা।

Sir R. N. Mukherjee-কে আমাদের দেশে Captain of Industry বলা হয়। ২৫ বৎসর আগে ভাবতাম তিনি স্বদেশদ্রোহী; কেন না তাঁদের Martin & Co-তে সাহেব বিস্তর, কিন্তু বাঙালীর স্থান কম। কিন্তু তাঁকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের Graduate-রা firm-এ ঢুকে কখনও ভাল করে কিছু শিখবে না। কয়েকদিন কাজ করেই বলবে উচ্চ পদের চাকরি না হলে আর চলবে না। একি হয়!

ইংলণ্ডে রাজার ছেলে sailor হন। আমাদের দেশে কোন ছেলে কারখানায় দুই চারদিন থাকলেই বলে—ও মশায়, আমার সব শেখা হয়েছে. আমায় একটা ডিপার্টমেণ্টে Head করে দিন।—এই সর্ব্বনাশের মূল।

স্যাডলার সাহেব বিলাতে গিয়ে একটা lecture-এ বল্লেন (Youths of Bengal সম্বন্ধে) "কোন একটা ছেলেকে হাসতে দেখলাম না।" আমার এদের দেখলে মনে হয় যেন সব ছেলের ঘরে ২।৩টি অরক্ষণীয়া কন্যা রয়েছে। ৩৫ বৎসরের মধ্যে চুল পাকে, অন্ন চিন্তা, হাসতে পারে না। যুবকেরা হাসবে

নাচবে, গাইবে। ইংলণ্ডে বাপে ছেলে ক্রিকেট খেলে, কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না, বরং উল্টো। ছেলে বাপের ত্রিসীমানায় মধ্যে গেলে শিষ্টতার ব্যাঘাত হয়, কিম্বা গান গাইলে যদি পিতা শোনেন—একেবারে চোব। এই ছেলে বয়সে যদি আমরা একটু না হাসি তবে হাসবো কখন?

Addison বলেছেন—I have always preferred cheerfulness to mirth. The latter I consider as an act, the former as a habit of the mind. Cheerfulness of mind ছাড়া life is not worth living. আমায় competition দাও, আমি সুপারী গাছে চড়বো, নারিকেল গাছে চড়বো—একবার চন্দননগরে J. N. Bose এর বাড়ীতে নারিকেল গাছে উঠে নারিকেল পেড়ে নিয়ে এসেছিলুম। তোমরা গাছে চড়বে, নৌকা বাইবে, পাহাড়ে উঠবে, Picnic খাবে। আমাদের বাঙালীর ছেলেরা অল্প বয়সে হাত পা কোলে করে জড়ভরত হয়ে বসে থাকবে; পরে হয় diabetes নয় gout-এ ধরবে। কলিকাতায় এ অদ্ভুত দৃশ্য। ৫৷৷০ টায় যখন বেড়াতে বেরুই, হয়ত দেখব সুকিয়া ষ্ট্রীটের কোণে ১০ বছর, ১৫ বছরের ছেলে এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এক সঙ্গে বসে আছে। এরা যে কি করে হাত পা কোলে করে বসে থাকতে পারে এ আমার বুদ্ধিতেই আসে না। কৃষকও ৩ মাস খাটে, আর ৯ মাস হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। আমরা একটা অদ্ভুত জাতি। অলসতা, জড়তা, নিস্পন্দতা, নির্জ্জীবতা যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। এক একজন ইংরেজের এক একটা খেয়াল আছে! ওই খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে ইংরাজ অসাধ্য সাধন করেছে। Music, poultry, agriculture, horticulture, ইত্যাদি এক একজনের এক একরকম খেয়াল। আমাদের দেশে যদি কেউ ধনীর ঘরে with silver spoon in the mouth জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে তাঁর এত বড় ভুঁড়ি হবে, গজেন্দ্র গমনে চলবেন, ধরাকে সরা জ্ঞান করবেন, মাটিতে পা দিলে যেন তাঁর অপমান হবে। আমি এদের বলি "a mass of corrupt flesh." Sir John Lubbock (son of a barber) বিদ্বান ও M. P. ছিলেন। তিনি বই লিখেছেন মক্ষিকাতত্ত্ব সম্বন্ধে। মক্ষিকা, পিঁপড়ের মধ্যে republic আছে, এদের ভিতরে Queen bees, drones, neuter আছে। এই মক্ষিকাতত্ত্ব সম্বন্ধে কত লোক কত পুস্তক রচনা করেছেন। আর আমাদের তো কেবল ঘুম। রাত্রিতে তো পূর্ণ উদ্যমে ঘুমোবই, তার উপর আবার ছুটি আসলে ১২টা, ১টায় আবার ৩ ঘণ্টার ঘুম।

আমাদের problem হচ্ছে how to kill time, and not how to utilise it. কোথাও তাস পাশার আড্ডা—তাস পাশা খেলে কিম্বা পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে দিন কেটে গেল। ইংরেজ প্রতিমুহূর্ত্ত utilise করে। তুমি ডিগ্রী পেয়েছ কি না পেয়েছ, ইংরেজ তা care করে না। এই যে তোমরা কলেজে পড়ছো, তারা এর মধ্যে দশগুণ বিদ্যা আহরণ করবে। যত পার out-book পড়। আমি 3rd Class-এ থাকতে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ শিখেছি নিজের চেষ্টায়। তখন Shakespeare যত পড়েছি পরে Chemistry-র যন্ত্রণায় তত পড়া হয়নি। তোমাদের হয়েছে text book ছাড়া বাইরের বই পড়া যেন পাপ। Johnson was the son of a poor bookseller. He used to devour books—second-hand বই সংগ্রহ করে ছোট ঘরে চোরের মত বসে পড়তেন। Oxford-এ দুই চার বছর পড়েছিলেন। Gibbon-ও তাই, self taught—Oxford-এ গিয়ে তিক্ত বিরক্ত হয়ে পালিয়ে আসেন। বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ অসাধ্য সাধন করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ Oriental Seminary-তে দুই চারিদিন পড়েছিলেন। কলেজের ছায়াও মাড়ান নি—তিনি কি একজন অশিক্ষিত? তিনি যদি বি. এল. পাশ করে উকিল হতেন তো গীতাঞ্জলি হতো না, বার লাইব্রেরীতে বসে আড্ডা দিতেন। খ্যাতনামা সংবাদপত্র সম্পাদকদের মধ্যে অনেকেই কলেজের শিক্ষিত নন। মিঃ চিন্তামণি Council Minister, graduate নন, self-taught, Leader-এর Editor কত well-informed. Associated Press-এর কর্ত্তা K. C. Roy আগে Eden Hindu Hostel-এর বাজার সরকার ছিলেন। অসাধারণ আধিপত্য—তিনিও self-taught, Railway finance (আয়-ব্যয়) সম্বন্ধে এখন authority সাতকড়ি ঘোষ—গভর্ণমেণ্ট ভয়ে থরহরি। তিনি প্রথমে নিম্নতম কেরাণী ছিলেন। এখন নিজের প্রচেষ্টায় Railway finance সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন!

যে ইংলণ্ড নিউটন, সেক্সপীয়র, মিল্‌টনকে গর্ভে ধারণ করেছিল, সেই ইংলণ্ডই বাণিজ্যে পৃথিবীর অগ্রণী। বিদ্যা ও বাণিজ্যে দ্বন্দ্ব নাই। আমেরিকা ও নব্য জাপান সকল রকম বিজ্ঞানে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। আর ব্যবসায় বাণিজ্যে ইংলণ্ড সকল দেশের মধ্যে প্রধান। এত দূরে গিয়ে কাজ নাই। বোম্বে গিয়ে অনেকের সঙ্গে মিশেছি—মাদ্রাজের লোক, বোম্বের লোক, তারা অর্থনীতিতে ওস্তাদ। Delhi Assembly-তে মুখ রেখেছে—বোম্বে ও মাদ্রাজের

লোকেরা। বাঙালী মসীজীবী। পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস গ্রাজুয়েট নন। পরলোকগত টাটা বহু ক্রোড়পতি ছিলেন। Institute of Science-এ ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন! তাঁর ছেলে দোরাবজী টাটা University-র শিক্ষিত নন। তবুও তাঁদের কত কৃতিত্ব দেখা যায়। লালুভাই শ্যামলদাসও তাই। আর বাঙালী চাকরি চাকরি করে পাগল; বাঙলা গবর্ণমেণ্ট বছরে কয়েকটি মাত্র হাকিম, ডেপুটী নিযুক্ত করেন। তাই নিয়ে কত মারামারি—এর জন্য আবার প্যাক্ট্ চাই। আমরা যেন কুকুর—কয়েকটা হাড় ফেলে দেয়, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি—হিন্দু কুকুর খাবে, না মুসলমান কুকুর খাবে। ওদিকে দিল্লীওয়ালা, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী এসে দেশ লুটে নিয়ে যাচ্ছে। স্যার ফজলুল ভাই করিম ভাই Institute of Commerce-এ দশ লাখ টাকা দান কর্লেন। মজাম্বিক চ্যানেলে, পার্শিয়ান গাল্‌ফে নিজের জাহাজে তাঁর বড় বড় ব্যবসায় চলছে। ভাটিয়ারা এক একজন ধনকুবের। সামান্য মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করে। স্যার বিঠলদাস থ্যাকারসে অনেক কাপড়ের কলের মালিক, অনেক ব্যবসায়ের কর্ত্তা, অর্থঘটিত ব্যাপার তিনি এমন বুঝতেন যে, মহামতি গোখলের ন্যায় finance-expert পর্য্যন্ত তাঁর কাছে গিয়ে পরামর্শ নিতেন। যাঁরা বড় বড় ব্যবসায়ের কর্ত্তা, শেয়ার মার্কেটের খবর রাখেন, মিলের মালিক তাঁরাই অর্থঘটিত ব্যাপারের সহজ মীমাংসা করতে পারেন।

আমাকে অনেকে বিদ্রূপ করে বলেন—আপনি কি বাঙালীকে মাড়োয়ারী হতে বলেন? আমি তা বলি না, আমিও সরস্বতীর অর্চ্চনা করি। আমি বলি, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যেও ঢের উন্নতি ও কৃতিত্ব লাভ করা যায়।

Mr. Dalal, Currency Commission-এ যাঁর minority রিপোর্ট বেরিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন—Reverse Council Bill sale-এ ভারতের সর্ব্বনাশ হবে। Reverse Council Bill India-তে sale-এর দরুণ ভারতের ৩৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। কিন্তু কলিকাতায় যাঁরা Political Economy-তে Gold medalist, Reverse Council Bill ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে মাথা চুলকাইবেন। আমরা বাঙালী—examination পাশ করি, ভাবি খুব লেখাপড়া শিখেছি।

স্যার মুরারজি গোকুল দাসের speculation-এ একবার অনেক টাকা লোকসান হয়েছিল। পরে জানতে পারা গেল, 'মাত্র ৪ কোটি টাকা' লোকসান হয়েছে। এতে তাঁকে পথে দাঁড়াতে হল না। মাত্র কয়েকটি মিলের

Managing Agency ছেড়ে দিলেন। তাঁর মাথা সমান উঁচুই রহিল। আমাদের হয়েছে পরিবারের সব ছেলেকেই Graduate করতেই হবে। কেন এ বিড়ম্বনা? বিধাতা ত স্বর্গ থেকে এমন্ বিধান করে পাঠাননি যে সবাই কেবল পরীক্ষা পাশ করে স্বাস্থ্য নষ্ট করবে। আমাদের একজন ডাক্তার, একজন উকীল, একজন স্কুলমাষ্টার, একজন কেরাণী হওয়া চাই। কেন? যার প্রতিভা আছে তাকে University-তে পাঠাও। যার তেমন শক্তি নাই, তাকে জোর করে কলেজে পাঠান শুধু শক্তি সামর্থ্যের অপব্যয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত সকলেই পড়ে। Upper Primary পর্য্যন্ত পড়লেই এখন দুনিয়ার সব খবর রাখা যায়। বাঙলা ভাষায় কত পত্রিকা রয়েছে—যেমন 'দৈনিক বসুমতী'—অন্য ইংরাজী কাগজ না পড়লেও চলে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ইহার পরিচালক। তিনি খুব well-informed. প্রবাসীর পঞ্চশস্য, বিবিধ প্রসঙ্গ, অন্তঃপুরে মা লক্ষ্মীরা যদি পড়েন তবে দুনিয়ার সব খবর রাখতে পারেন। আসল কথা বিদ্যাশিক্ষা কোন্ ভাষায় হলো তা দিয়ে দরকার কি? কোরাণ শরীফ বাংলায় অনুবাদ হইলে কতজন পড়তে পারে, অথচ তার মূল্য কমে না। দিনে তিন ঘণ্টা বই'র পড়া আর ২ ঘণ্টা কেবল বাজে বই পড়লে বিদ্যার জাহাজ্ হতে পারা যায়। University-তে ৬ মাস ছুটি, Post graduate class-এ ৭ মাস; কিন্তু এই কয় মাস ছুটি ওরা একেবারে সরস্বতীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে কাটায়।

অনেকের হয়ত Geography, History একেবারে বাদ গিয়েছে। গেলিপোলি কোথা, বললে দেখাতে পারবে না। দিল্লী কোথা, বলতে পারবে না—চেকোশ্লোভাকিয়া, জুগোশ্লোভাকিয়া, ইউক্রেন, এসবের কথা হয়ত কেউই বলতে পারবে না। এই যে অষ্ট্রীয়া ভেঙ্গে কত রাষ্ট্র হল তা জানে না। It is the information which counts in after-life. Examine পাশ করতে যা কিছু দরকার না হয়, তা পড়া আর দরকার নেই—এ ভয়ঙ্কর vicious system. হাইস্কুলে কুক্ষণে এগুলি (History, Geography) আবার optional subjects করা হয়েছে। 4th Class হ'তে হয়ত Geography-র একেবারে কারবার নেই।

বাঙালীর কত রকম দোষ—আর ২।৪টা কথা বলবো—এত কথা এসে পড়ে যে, বলে শেষ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার জন্য আমাদের সকলেরই একটা ঝোঁক। যার প্রতিভা আছে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাও, যাকে ঠেঙ্গিয়ে

পাঠাতে হয়, তাকে পাঠাবার দরকার নেই। অন্য দেশে From Log Cabin to the White House, Working Man থেকে Prime Minister হওয়া যায়। ইংলণ্ডে শতকরা ৯৮ জন literato ; কিন্তু ২৬০০০ ছেলে কলেজে পড়ে—কত পার্থক্য। তাদের দেশে কত ছেলে কত দিকে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে তাদের career world-wide, আর কত রকম—সৈনিক বিভাগে, রণতরী বিভাগে, বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্যে কত ছেলে যাচ্ছে। আমাদের শুধু 'খাঁড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাঁড়া'—উকীল, ডাক্তার, কেরাণী, স্কুলমাষ্টার এর বেশী কিছু নয়।

আমাদের হ'চ্ছে—যা হোক একটা কিছু করা। সবাইকে স্কুল কলেজে পড়তে হবে, কেউ ভাবে না—পরিণাম কি? অভিভাবক ছেলের জন্য মাসে ৩০।৪০ টাকা মনিঅর্ডারে পাঠান। কিন্তু কেউ ভাবে না, কি পড়ছে ও পড়ে কি হবে।

আমি চার বার বিলাত ফেরতা, ৮ বৎসর বিলাতে বাস করেছি বটে, কিন্তু কালাপাহাড়ের মতো আমি বিলাতফেরতার ভয়ানক বিদ্বেষী—ওরা stiff collar পরে, ঘাড় সোজা করে, দাঁড়িয়ে মনে করে এই বুঝি আদব কায়দা—culture. Foremost jurist of India স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ ; the foremost physician স্যার নীলরতন সরকার, কেদার দাস, বামনদাস এঁরা সব Calcutta University-র শিক্ষাপ্রাপ্ত—বিলাতফেরত ডাক্তার এখন আর বড় কলিকাতায় নাই। ইউরোপে গেলেই শিক্ষালাভ হয় না। Madras-এ Advocate General পর্য্যন্ত সব LL.B., সেখানে ব্যারিষ্টার নেই। কেবল কলিকাতায় Original side-এ Barrister; travelling in fool's paradise (Emerson)। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিম, রাসবিহারী ঘোষ আশুতোষ এঁদের শিক্ষাও তো এই দেশের—বিলাতে গেলেই যে হল-মার্কা হবে তার কি মানে আছে? ব্রজেন্দ্র শীল—a man of encyclopaedic learning. সব বিলেত-ফেরতাদের কেটে decoction করলেও এত বিদ্যা হয় না। বিবেকানন্দ শিখতে বিলাত যান নি—'প্রাচ্যের কি আছে প্রতীচ্যকে দেবার', তাই বলতে গিয়েছিলেন। এখন কথায় কথায় বিলাত যাওয়া—১২ হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বিচী—এসব ভাববার কথা। বিলাতে যাবার মোহ আছে, এ মোহ দূর করতে হবে!

মহাত্মা গান্ধী untouchability দূর করতে বলেছেন। এ Hindu

untouchability, but not Islam untouchability—নিম্নস্তরের হিন্দুরাও মুসলমানের দরগায় সিন্নি দেয়। এত কোটি হিন্দু মুসলমান হ'ল কেন, এ কি কেবল রাজশক্তির প্রভাবে?—তা নয়। দিল্লী অঞ্চলের হিন্দুরা তো খুব বেশী মুসলমান হয়ে যায় নি। ইসলামের মূলমন্ত্র—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। হিন্দু পদাঘাত করে দূরে ফেলতে জানে, মুসলমান কোলে করতে পারে। আমরা ভাইকে পায়ে ঠেলে ফেলে দেই, তারা কুড়িয়ে নেয়। আমাদের সাম্য নেই, ভ্রাতৃভাব নেই। ডোম হউক, আর যাই হউক, মুসলমান হলে অন্য সব মুসলমানেরা তাকে এক সঙ্গে নিয়ে খায়, ফকির, রাজা এক সঙ্গে নেমাজ পড়ে, ভোজন করে। এই সাম্যভাবের জন্যই পশ্চিমে আটলান্টিক, পূর্ব্বে প্যাসিফিক এর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ লোক-সংখ্যাই মুসলমান—ভারত তো ফাও। আমাদেব সাম্যভাব নাই, ভ্রাতৃভাব নাই। খাসিয়া পাহাড়ে এখনও খ্রীষ্টান হচ্ছে কেন? আমরা তাদের জন্য কি করছি? মিশনারীরা সব করছে। হিন্দু কমে যাচ্ছে অস্পৃশ্যতাব দরুণ। মুসলমানেরা জুম্মা মসজিদে সকলে একসঙ্গে নেমাজ পড়ে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের তাড়িয়ে দেয়, মন্দিরেব ত্রিসীমানায় থাকতে দেয় না। রঘুনন্দনে আছে "কায়স্থোঽপি সচ্ছূদ্র"। ব্রাহ্মণ মন্দিরেব ভিতর, কায়স্থ বারান্দায়, নবশাখ সিঁড়িতে শূদ্র অস্পৃশ্য, দূর থেকে দেখে, এত দূরে হয়তে টেলিস্কোপ দিয়ে তবে দেখতে পারা যায়। আমরা কেবল জানি ছুঁৎমার্গ—বিবেকানন্দের কথায় 'ধর্ম্ম গিয়েছে ভাতের হাঁড়ির ভিতর।' বরফ, সোডা খেলে জাত যায় না। টোলের অধ্যাপক বরফ দিয়ে সুস্নিগ্ধ পানীয় গলাধঃকরণ করেন, তাতে জাত যায় না। কিন্তু যায়—একগ্লাস জল যদি নমঃশূদ্র কি মুসলমান এনে দেয়। এত বড় গর্দ্দভ জাতি আর নাই। আবার জাতি বিচারে দূরত্ব মাপও আছে। নিউটনের দূরত্বের নিয়ম আছে, কিন্তু হিন্দুর দূরত্বের নিয়ম বোঝা যায় না; খোলা জায়গায় নিকটে খেলেও জাত যায় না; কিন্তু এক আচ্ছাদনের নীচে বহু দূরে হলেও জাত গেল। অদ্ভুত নিয়ম। এই অস্পৃশ্যতা একেবারে সর্ব্বনাশ করেছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অনেকে ভয় করে, কিন্তু বাংলার ৫০০ শ্রদ্ধানন্দ ছেড়ে দিলেও ছুঁৎমার্গ থাকতে কিছু করতে পারবে না।

বাংলার মুসলমান তো হিন্দুই, একই রক্ত। মোগল পাঠানের বংশ ক'জন? কেউ যদি বা থাকে তাহলে homoepathic dilution-এ। Scratch a Bengali Mussalman and you will find him a Hindu—জাতিগত ভাবে আমরা এক, ভাবাও এক। চাটগাঁয়ে হিন্দু মুসলমানে পাশাপাশি বাস

করে, শ্রীহট্টেও তাই। এই শ্রীহট্টে দরগাও আছে, মন্দিরও আছে। শোনা যায় কি, কারো মনে কেউ ব্যথা দিয়েছে—গরু জবাই নিয়ে, কি মুসলমানের মসজিদের নিকট শাঁক ঘণ্টা বাজা নিয়ে? যারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধায়, তফাৎ থেকে যারা কল টিপে, Mr. Ramsay Macdonald বলেছেন—"they are guilty of diabolical crime." একটুখানি উদারতা, একটু ধৈর্য্য থাকলেই সব মীমাংসা হতে পারে। হিন্দুরা যদি মুসলমানের মসজিদেব নিকট গান বাজনা থামায়, মুসলমানেরাও যদি এমনভাবে give and take নীতি অনুসরণ করে চলে তবেই হয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলেছেন—হিন্দুদেব বেশী ধৈর্য্য ও উদারতা দেখান দরকার; তারা বড ভাই, মুসলমান কনিষ্ঠ। হিন্দুরা বড ভাইয়ের মত মুসলমানদের টেনে তুলবে। আমি পৃথক মোসলেম কলেজেব বিরোধী। এ সব করে আমরা মিছামিছি মাঝখানে একটা দেওয়াল টেনে দিচ্ছি—এতে আরো ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করে দেয়। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসে অঙ্ক ইতিহাস শিখবে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কেন? এই বাংলা দেশে ৯০০টা স্কুল। এর মধ্যে মুসলমানেব পরিচালিত কয়টা? ২৫।৩০টা মাত্র। কোথাও তো এমন হয়নি যে, হিন্দুরা স্কুল করেছে বলে—আমরা বাগেরহাটে নূতন কলেজ স্থাপন করেছি,—হিন্দুরা করেছে বলে মুসলমানদের কেউ বলেছে যে, মুসলমানদের জায়গা হবে না? Education-এর জন্য টাকা ত দেয় অধিকাংশই হিন্দু; কোথাও তো মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয় না। এ সব কথা তো মোটেই আসেনি আগে। পাবনা রাজসাহীতে শতকরা ৭০ জন মুসলমান, কিন্তু flood relief-এ হিন্দু খাটছে বেশী। মুসলমানের ঘরে আগুন লাগিলে হিন্দু কি বলে যে জল তুলে দিব না। কিম্বা হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিলে কি মুসলমান বলে যে আগুন নিভাব না। Cholera-র প্রকোপ হলে হিন্দু মুসলমানকে দেখে না? এ সব নূতন কথা আমদানি হচ্ছে; সংকীর্ণতা উদারতা এ সব কথা কি আসে? আমরা ক্রমেই আরো সংকীর্ণ হয়ে উঠছি। যাহোক সমাজ শরীরে ফোঁড়া হইলেই বেরিয়ে যাওয়াই ভাল! কোকনদ কংগ্রেসে মৌলানা ভ্রাতৃদ্বয় যখন গেলেন, হিন্দুরা সব তাঁদের টেনে নিয়ে গেল, আমি শোভাযাত্রার পিছনেই ছিলাম। অন্ধ্রদেশে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, ১ জন মুসলমান। মুসলমান প্রেসিডেণ্ট বলে তো লোক কম হয়নি, হিন্দুরা তো ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকেনি। উপর থেকে বাতায়ন দিয়ে হিন্দু মেয়েরা আলী ভাইদের উপর ফুল নিক্ষেপ করেছিল। কংগ্রেসে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মন্দির

থেকে দেবতার আশীর্ব্বাদ ফুলচন্দন এনে আলি ভাইদের আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। তাঁরা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেছিলেন করজোড়ে। ভারতের মুসলমানেরা আমাদের স্নেহের পাত্র, কৃতজ্ঞতার ভাজন। বাংলার মাটি, বাংলার শস্য, বাংলার জল, বাংলার হাওয়া আমরা উভয়েই সমান ভাবে ভোগ করি। আমার যুবক ভাইয়েরা—তুমি হিন্দু হও মুসলমান হও—সব বিষয়ে একত্র হয়ে একসঙ্গে বাস কর; এক সূত্রে গাঁথা হয়ে থাক। তোমরা এইটে কর—One step farther, একটু এগিয়ে যাও, পথ পাবে—একটু সৎসাহস দেখাও, সামাজিক আট-ঘাট ভাঙ্গতে হবে।

বাঙালী, আসামী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী, কুলীন কায়স্থ, বঙ্গজ কায়স্থ, এদের মধ্যে ক্রিয়া হতে পারে না। অকুলীনদের অপরাধ এই—হয়ত তারা কিছু জায়গা জমি পেয়ে গ্রামে আছেন, আর যত ভাল ভাল নৈকষ্য কুলীন তারা হয়ত কলকাতায়, ঢাকায় আছেন। কিন্তু শাস্ত্রে ও রকম কোন অনুশাসন পাবে না। যাজ্ঞবল্ক্যে নয়, মনু পরাশরেও নয়।

শেষে একটি কথা বলব—খদ্দর বিষয়ে। এ সম্বন্ধে দুই বৎসরে অন্ততঃ ১০০টা প্রবন্ধ লিখেছি। ৫০০ জায়গায় বক্তৃতা করেছি।

এই যে শ্রীহট্টে আমার প্রিয় ছাত্রগণ আমার যথেষ্ট সম্বর্ধনা করেছেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু অন্ধ্র দেশে যা দেখেছি, সেখানে বিলাতী কাপড় প্রায় নেই বললেই চলে। যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল তার নাম রাখা হয়েছিল গান্ধী-নগর। লাখ লাখ লোক—নিরক্ষর চাষা—শতকরা ৯০ জনের গায়ে খদ্দর। কিন্তু এখানে ছাত্রদের ফিনফিনে মিহি ধুতি; জমিদার যারা, তাঁদের তো ১২০ নং সুতার কাপড়। "তস্মিন প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনম্ তদুপাসনমেব।" যদি সত্যি সত্যি মহাত্মার বাণী এখানে পৌছে থাকে, তবে কিছু কাজ কর। আর তা না হ'লে বুঝবো it is only an impious curiosity. এ দুঃখ আমার বুকে শেলসম বিঁধছে। যদি দেখতাম অন্ততঃ শতকরা ১০ জন তাঁর বাণী পালন করেছে, তবুও আমার শ্রীহট্টে আসা সার্থক হতো। যিনি শিক্ষিত হয়ে খদ্দর না পরেন তাঁর শিক্ষা বিফল। কিন্তু হৃদয়ে ব্যথা পাই এইজন্য যে, এরা যা বুঝেন তাও অনুসরণ করেন না। "গান্ধী মহারাজকী জয়" ব'লে শুধু চীৎকার করলে কিছু হবে না, ও সব ফাঁকা আওয়াজ, এইটেই আমার দুঃখের কথা। যে দেশের ষাট কোটি টাকা বিদেশে চলে যায়, সে

দেশের ইহকাল পরকাল কি হতে পারে? খদ্দর না পরলে 'বন্দে আমার জননী আমার' ও সব গান বৃথা।

আমরা বলি খদ্দর চটের কাপড়, ও শুকায় না, ওজন ভারী। কিন্তু ওদের ধড়া চূড়া চোগাচাপকান ১/০ একমণ বোঝা, তার উপর আবার শীতকালে ulster-এর বোঝা—অথচ খদ্দর নাকি ভারী! এসব দেখে অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা করে।

মেয়েদের বল্‌ছি—মা লক্ষ্মী, তোমরা খদ্দর পর, খদ্দর শাড়ী পরলে সেমিজ, ব্লাউজ ইত্যাদি উপসর্গে খরচ বাড়াতে হয় না। তোমরা যদি এটুকু না কর, তা'হলে করবে কে? "না জাগিলে আজ ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না।" তোমরা খদ্দর পর, আর কিছুই চাই না। একটু একটু চরকা ধর, আর স্বামী ও ছেলেদের শেখাও।

খদ্দর সস্তা; খদ্দর পরলে বিলাসিতার দরকার থাকে না। মা লক্ষ্মী, আমাদের অনুরোধে আপনারা চরকা ধরুন। গৃহে একটু একটু সূতা তৈয়ারি হউক। স্বামী, পুত্রগণকে আপনারা লজ্জা দিয়া শেখান। আমরা বাক্য বিশারদ, কাজের বেলায় সকলের পশ্চাতে। ভাবী ভরসার স্থল ছাত্রবৃন্দ, তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত—খদ্দর না পরে দেশমাতার অবমাননা করছ, মহাত্মার উক্তি পালন কচ্ছ না। দেশমাতৃকার জন্য সহস্র সহস্র লোক রক্ত দেয়, তোমরা কি খদ্দরটাও পরতে পারবে না? এই মহাত্মার অসহযোগ—খদ্দরের সঙ্গে অধিকাংশের যোগ আছে। কিন্তু অসহযোগের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা দেশের বাণিজ্য শিল্প যাহাতে উদ্ধার হয় তজ্জন্য খদ্দর প'রবো। নিজে খদ্দর প'রবে; প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাপড় ধোবে। Don't give the washerman a pice. একটা জামা সপ্তাহে dirty linen bag-এ রাখাও আমাদের পোষায় না। আমি এখানে এসে নিজের কাপড় নিজে সাবানে মাখিয়ে কেচেছি, পরে ভলাণ্টিয়াররা এসে কেচে দিয়েছে। সকালবেলা কাপড়-গুলি ধুয়ে দিলে দুই ঘণ্টায় শুকিয়ে যাবে।

Cleanlines is next to godliness; শ্রমবিমুখতা আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। মানুষের মত হও, নিজেরা সব করে নিতে শেখ—শ্রমবিমুখতা ছাড়। এখন আবার hostel system-এ সর্ব্বনাশ হয়েছে—মনিঅর্ডারে টাকা আসছে; আর ঘণ্টা বাজতে শ্রীমানেরা খাচ্ছেন। পূর্ব্বে কিরূপ হতো ভেবে দেখুন। এখন dignity of labour-সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হতে হবে। নিজের হাতে খাবার

রাঁধতে হবে; কাপড় কাচতে, বাজার করতে কোন লজ্জা নাই। আমরা পয়সা দিয়ে মাছ তরকারি আনব—এতে লজ্জা কি? ।৴০ আনার মাছ কিনে ৵০ আনা কুলি ভাড়া দেওয়াব সার্থকতা কি? এখন যদি কেউ নিজে আনে, চারিদিকে চায়—কেউ দেখেছে কিনা? Sense of dignity কি এই? পরপদলেহী হব না, পরমুখাপেক্ষী হব না, স্বাবলম্বী হব, এর চেয়ে dignity আর কি আছে?

মহাত্মা যে কয়টি উপায়ে ভারতের জাতিগঠন সম্বন্ধে নির্দেশ করেছেন, তা পালন করতে যেন আমরা কুণ্ঠিত না হই; ভগবানের উদ্দেশ্যে সকলকে করযোড়ে—এই বলছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব্যতিরেকে কোন কাজে সফলতা লাভ করতে পারা যায় না। *

ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা

সভাপতির অভিভাষণ

প্রায় ২০ বৎসর গত হইল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইবে হিন্দু জাতি আজ কি প্রকার ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

প্রতি দশ বৎসরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি (প্রতি দশ হাজারে):—

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
হিন্দু—	৪৮৮২	৪৭৬৭	৪৭০০	৪৫২৩	৪৩৭২
মুসলমান—	৪৯৬৯	৫০৬৮	৫১১৯	৫২৩৪	৫৩৫৫

এই হতভাগ্য দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি কালান্তক ব্যাধি মৌরুসী পাট্টা করিয়া রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান এই সমস্ত ব্যাধির সমভাগী;

* শ্রীহট্টে প্রদত্ত বক্তৃতা; জনশক্তি হইতে যোগিসংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও হিন্দুর সংখ্যা কেন দিন দিন হ্রাস হইতেছে? ইউরোপীয় জগতে কি প্রকারে সন্তান উৎপাদন (Birth control) বন্ধ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে; কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে আমাদের আত্মকৃত দুষনীয় প্রথাই ইহা সংসিদ্ধ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণগুলি, যথা—

(১) বিবাহযোগ্য পাত্রীর অভাব,

(২) বিধবার, বিশেষতঃ বালবিধবার, বাধ্যতামূলক পুনর্বিবাহ নিষেধ।

দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ-প্রথা রহিত হওয়ায় অনেক সময় কন্যা পাত্রস্থ করা দায়। আবার অপর পক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্যা পাওয়াও দুষ্কর। বারেন্দ্র রাঢ়ীর সহিত, আবার উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ীর সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে নারাজ। হিন্দু সমাজে তথা কথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পণ বিনা পাত্রী পাওয়া দায়। এই কারণে অনেকে ৪০ বৎসর গত হইলে পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া একটী অপরিণত বয়স্কা বালিকা বিবাহ করেন। অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে, বালিকাবধু ১৫-২০ বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়া যায়। এই কারণেই বাংলা দেশে কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণী একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং পশ্চিম দেশীয় খোট্টারা আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনেক শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে পুরুষেরা পাত্রীর অভাবে অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়, পরন্তু সহস্র সহস্র বালবিধবাগণ সামাজিক রীতি অনুসারে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু নৈসর্গিক গতি অবরোধ করে কে? উপপত্নী ও রক্ষিতা-নারী সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে—পাপস্রোত ও ভ্রূণহত্যাপাতকে দেশ প্লাবিত। প্রায় ৭০ বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "বিধবাবিবাহ" বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারে জ্বালাময়ী বাণীতে যে হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন তাহা যেন এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা এই প্রকার কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।

সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের দাস হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে, এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে। বাংলাদেশের বড় বড় জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্র-বক্ষে চলিতেছে। ইহাদের সারং, খালাসী প্রভৃতি পূর্ব্ব বাংলার চাষী মুসলমান

শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। মুসলমান রেঙ্গুন, আকিয়াব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূরদেশে শ্রমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে এবং দেশে পাঠায়। আমি জানি চাটগাঁয়ের অনেক গ্রামে এই প্রকারে প্রতি মাসে ৪০।৫০ হাজার টাকা মনিঅর্ডার হইয়া আসে। তা ছাড়া পদ্মায় চর পড়িলেই দুঃসাহসিক মুসলমান আসিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতি বৎসরে সহস্র সহস্র মুসলমান চাষী আসামের উর্ব্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে। কিন্তু হিন্দু অলস ও কুসংস্কার জালে জড়িত, ছুঁৎমার্গ ও জাতি-চ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিযাছে। সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়; এই কারণে সে দরিদ্র ও নিরন্ন হইযা পড়িতেছে।

জাতিভেদরূপ ব্যাধিজর্জ্জরিত হিন্দু প্রতিপদে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছে। ধোপা কুমোরের কাজ করিবে না—কুমোর কামারের কাজ করিবে না। কিন্তু মুসলমানদিগের কোন প্রকার বাধাবিপত্তি নাই: সে নিজের রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে। এই কারণে চামড়া ও দপ্তরীর ব্যবসায় মুসলমানদিগের একচেটিয়া।

বাঙলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী আসিয়া অনেক বিভাগে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, এবং অজস্র টাকা রোজগার করিযা স্ব স্ব প্রদেশে পাঠাইতেছে; কিন্তু আমরা "হা অন্ন, হা অন্ন" করিয়া চীৎকার করিতেছি ও হাত পা গুটাইযা বসিয়া আছি। নিম্ন শ্রেণীর অনেক হিন্দু শ্রমবিমুখ হইয়া অনায়াসলভ্য জীবিকা অর্জ্জনে ব্যস্ত. এই কারণে বৈরাগী ও বৈরাগিণীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, এবং গেরুয়াধারীরও অভাব দেখা যাইতেছে না। বাবাজী ও স্বামিজী পাতাল ফোঁড়ের ন্যায় গজাইয়া উঠিতেছে।

কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলাম, এবং হিন্দু সমাজ আজ যে কি প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত তাহাও কিছু কিছু জানাইলাম। এখন উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগের দরকার।

১। বিধবাবিবাহ প্রচলন।

২। যে সমস্ত কুলবধু প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহ হইতে অপহৃত হইতেছে, এবং দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা প্রযুক্ত যাহাদিগকে আমরা দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি না, তাহাদিগকে উদ্ধার করা ও সমাজের বক্ষে স্থান দেওয়া।

৩। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। যদি আমাকে কোন বিদেশী জিজ্ঞাসা করেন ৩০ কোটি ভারতবাসী কেন আজ মুষ্টিমেয় পরদেশীর পদানত ও ক্রীড়ার পুত্তলী?

আমি এক কথায় তাহার উত্তর দিই—অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, স্বরাজলাভের প্রধান পরিপন্থী কি? আমি এক কথায় উত্তর দিব—অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। সভা সমিতিতে বড় বড় শাস্ত্রের বচন আবৃত্তি করি, যথা—"সর্ব্বভূতেষ নারায়ণ", কিন্তু তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর কেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও যদি এক গেলাস জল কোন সামাজিক নিমন্ত্রণে দেয়, তখনই জাতিচ্যুত হইলাম বলিয়া পংক্তি সমেত উঠিয়া পালাই। সোডা, লিমনেড পান করিব, বরফজল খাইব—যেন সেগুলি নৈকষ্য কুলীন শুদ্ধস্নাত পূত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে গঙ্গাজল দিয়া প্রস্তুত করে। ষ্টীমারে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে বাবুর্চ্চির নিকট যাইয়া এক প্লেট মুরগীর কারি ও ভাত লইয়া অক্লেশে উদরস্থ করিব। এই সমস্ত ব্যাপারে হিন্দুত্বের কিছুমাত্র বিচ্যুতি হয় না। কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরে এখনকার দিনের যত রাঁধুনী ব্রাহ্মণ প্রায়ই খোট্টা, না হয় উড়িয়া। তাহাদের জাতি গোত্রের কোন খবর রাখি না—চেহারা দেখিলে অনেক সময় ডোম কি চামার বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একগুচ্ছ সূত্র গলদেশে প্রলম্বিত হইলেই হিন্দুত্ব বজায় থাকে। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, এই সকল বামুন যাহারা পরিবার সঙ্গে আনে না, তাহাদের অনেকেরই স্বভাব চরিত্র কলুষিত, এবং শতকরা ৯৫ জন কদর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ইহাদের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ভণ্ডামী ও কপটাচরণ ধর্ম্মের প্রধান আবরণ হইয়াছে; দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে।

যাঁহারা লোকতত্ত্বের (Ethnology) বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আজকালকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর রক্তে অনার্য্য ও দ্রাবিড়ী শোণিতের যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। ক্ষত্রবংশাবতংস রাজপুতগণ শক ও হূণ বংশোদ্ভব। হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া হজম করিয়াছে। আসামের অহোম, কুচবিহার ও ত্রিপুরার নৃপতিগণও এই প্রকারে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। একসময়ে প্রায় সমস্ত বরেন্দ্রভূমি কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ আছে। বাংলাদেশ হাজার বৎসরের অধিক কাল বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। তখন প্রকৃতপক্ষে একাকার হইয়া গিয়াছিল। যখন আদিশূর ও বল্লাল সেনের সময় পুনরায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তার করে, তখন কত রকম গলদ যে সমাজ মানিয়া লইলেন, তাহার আলোচনার সময় নাই। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে,

আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে নিমন্ত্রিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাংলায় ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিতে চাহি না। ইতিহাসে আছে কিনা জানিনা, যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পত্নী সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। আবার সপ্তসতী ব্রাহ্মণেরাই বা কোথায় গেলেন? লোকতত্ত্বের অকাট্য প্রমাণের নিকট সকল যুক্তিই পরাস্ত। নাসিকার ছিদ্র (nasal slit) ও মুখের সৌষ্ঠব ও আকৃতি (facial contour) প্রভৃতি দ্বারা বিচার করিলে বাংলাদেশে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ও নমঃশূদ্র, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না। যদি সুবর্ণবণিকগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বল্লাল সেনকে ক্রমান্বয়ে মুদ্রা ধার দিয়া এবং তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া পুনবায় ঋণ দিতে অস্বীকৃত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও আজ কৌলিন্য মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতেন না। হায়রে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ—ধন্য তোর মহিমা! বেদ সঙ্কলয়িতা ও মহাভারত রচয়িতা মহামুনি ব্যাস মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—মহর্ষি বশিষ্ঠ ও দেবর্ষি নারদ কেহ বা দাসী-পুত্র কেহ বা বেশ্যাপুত্র। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন?

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

কই, সীতা সাবিত্রীর নাম করা হয় না কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক সময়ে হিন্দুধর্ম্ম কি প্রকার উদার ছিল। যে সকল বিধবা পুনর্বিবাহ করিয়া আদর্শ সতী হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই স্মরণ করিতে হইবে। সে একদিন, আর আজ এক দিন। মুসলমানগণকে বাদ দিলেও বাঙলায় মোটামুটি ২০০ লক্ষ হিন্দু, তাহার মধ্যে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মাত্র ২৫।২৬ লক্ষ, অষ্টমাংশ মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করি ইঁহারাই কি চিরকাল সমাজে আধিপত্য করিয়া আসিবেন? দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈশপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, উদর ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত ঝগড়া বাধিলে অনশনে প্রাণত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, অশিক্ষিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণী আমাদের রক্তমাংস! দৈহিক শক্তি ও বল হিন্দুসমাজে যাহা কিছু আছে, তাহা ইহাদেরই মধ্যে বিদ্যমান। ইহাদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুসমাজ কোথায় দাঁড়াইবে? ঘরশত্রুতে রাবণ নষ্ট। একদিকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ—অপরদিকে আমাদের মধ্যে আত্মকলহ। এই ঘরোয়া বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিব, না এই

সমস্ত মিটমাট করিয়া সকল শ্রেণীকে কোলে টানিয়া লইয়া স্বরাজ-লাভের সোপান নির্ম্মাণ করিব ?

এখন বুঝা যাইতেছে কেন হিন্দুর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজের লোকসংখ্যা হ্রাসের আর একটী প্রধান কারণ এই—ইদানীং আবার সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দুগণ আভিজাত্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্নের চেষ্টা করিতেছেন। ইহার প্রধান ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা যে প্রকার সামাজিক রীতিনীতি ও চলাচল অনুসরণ করে ইহারাও সেই পথাবলম্বী হইতেছে। কতকগুলি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল ; কিন্তু এখন তাহারা ইহা বর্জ্জন করিয়াছে। এই কারণে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে কেবল উৎপাদনশক্তি কমিতেছে তাহা নহে, ভ্রূণ ও শিশু হত্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে। ১৯২১ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় সমগ্র বাঙলার লোক সংখ্যার মধ্যে মোটামুটি ২ কোটি হিন্দু, এবং ২৷৷০ কোটি মসলমান, বাকী শতকরা ৩ ভাগের কম খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। অথচ ৫০ বৎসর পূর্বে (১৮৭১ খঃ অব্দে) হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৫ লক্ষ অধিক ছিল।

নিম্নে বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান বিধবার যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কেন আমাদের ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছেন।

বিধবা	হিন্দু বিধবা	মুসলমান বিধবা
১—৫	১৪৩৯	১৪০৬
৬—১০	৮৭৫১	৭৫৫৮
১০—১৫	৩৬৩২৩	২৩৪৮০
১৫—২০	৯৬৪৭০	৫১১৭৯
২০—২৫	১৫১০৮৬	৭২৫৯৮
২৫—৩০	২৩০৭৯০	১২৪৪৬৯

ছুঁৎমার্গগ্রস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের অবজ্ঞা ও উদাসীনতার ফলে অবনত শ্রেণীর লোকেরা দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। কেনই বা করিবে না ? ইসলাম ধর্ম্মে সাম্যবাদের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান। ডোম হউক, বাগ্দী হউক, সে যে দিন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে সেই দিন হইতে সে সমস্ত সামাজিক অধিকার অন্যের সহিত সমভাবে ভোগ করে। একসঙ্গে, এমন কি

এক পাত্র হইতে ভোজন, এক মসজিদে ভগবানের উপাসনা হইতে সে বঞ্চিত হয় না। ইহা ছাড়া খৃষ্টান মিশনারীরা তাহাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভাবী জীবিকা অর্জ্জনের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এক কথায় বলিতে গেলে হিন্দুসমাজ কেবল পায়ে ঠেলিতে পারে, কোলে টানিয়া আনিবার শক্তি তাহার নাই। সম্প্রতি নিমন্ত্রিত হইয়া আমি সপ্তাহকাল "অভয় আশ্রমের" আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেখানে যে দিব্য দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার বড়ই তৃপ্তিলাভ হইল। সেখানে হিন্দু মুসলমানের বাদ-বিচার নাই—সেবক হইলেই হইল এবং অনেক সময় চামার, মেথর ভদ্রলোকের সন্তানগণের সহিত পাশাপাশি বসিয়া আহার বিহার করেন। কুমিল্লা সহরের মেথরগণ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া যখন আহার করিতে লাগিল, তখন মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। শুধু তাহাই নহে, এই সমস্ত অবজ্ঞাত ও পদদলিত লোকের বাবুদের সঙ্গে একাসনে বসিযা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান বাড়িল। হিন্দু সমাজ ইহাদিগকে ইতর জীব-জন্তু অপেক্ষা ঘৃণা করে, এবং কোণ ঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। একটা বিড়াল আঁস্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুরের মাংস ভক্ষণের পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কড়ায় মুখ দিয়া চপ্ চপ করিয়া দুধ খাইতেছে, কখনও কখনও বা থাবা দিয়া পাত হইতে মাছের মুড়া লইয়া যাইতেছে—ছুঁৎমার্গীদের ইহাতে কোন আপত্তি হয় না—অম্লানবদনে সেই দুধ পান করে ও সেই পাতে বসিয়া ভোজন করে; কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির কেহ রান্নাঘরের চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইলে একরশি তফাতে ভাতের হাঁড়ি, অন্ন ব্যঞ্জনাদি তৎক্ষণাৎ অপবিত্র হইল বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন যে, এখন রান্নাঘরে ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ দেশাচার, লোকাচার ও কপটাচার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিরাজ করিতেছে।

হিন্দু ও মুসলমান কয়েক শত বৎসর ধরিয়া নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি বাস করিতেছে। যাহা কিছু মনোমালিন্য ও বিবাদ বিসম্বাদের কারণ তাহা পরপদলেহনকারী চাকরিজীবী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে সেদিন আমি হিন্দু মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে যাহা বলিয়াছি তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বাংলাদেশ অজ্ঞতায় তমসাচ্ছন্ন—শতকরা ৫।৭ জন মাত্র বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট। এই সমস্ত কুসংস্কার তিরোহিত করিতে হইলে লোকশিক্ষা বিস্তার সর্ব্বাগ্রে

প্রয়োজন। যাহাতে প্রত্যেক গ্রাম অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিশেষতঃ বালিকাগণের মধ্যেও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করাইতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না।

উপসংহারে আবার বলি, এখন আর তর্ক যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই দিবার দিন নাই। বাঙলায়—বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙলায়—হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে—স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করিতেছে। এখনও যদি আমাদের মোহ নিদ্রা না ভাঙ্গে তাহা হইলে ২০০।২৫০ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। এখন আর কথায় চিঁড়া ভিজাইবার চেষ্টা করিলে হইবে না, কাজ করিতে হইবে ও কাজে দেখাইতে হইবে যে আমরা প্রকৃতই এই ধ্বংসোন্মুখ জাতি সংরক্ষণে প্রস্তুত। এই হিন্দুসভায় তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীদিগকে অনাচরণীয়রূপ অবজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তাহাদিগকে "জলচল" করিতে হইবে। যদি সাহসে না কুলায় জানিলাম যে আমাদের বক্তৃতা ও আস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। যিনি নব্য ভারতের উদ্ধারকল্পে যুগাবতার-রূপে অবতীর্ণ—জগতের সেই শ্রেষ্ঠ মানব, মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত। ইনি আমাদের স্বরাজলাভের যে পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন, তাহাতে খদ্দর প্রচলন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতিস্থাপন মূলমন্ত্রস্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত। তাঁহার সমক্ষে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, আজ হইতে এই সমস্ত সামাজিক দুর্নীতি ও কলঙ্ক অপসারিত করিব। হিন্দুসমাজ আবার নবজীবন লাভ করিয়া জগতের সমক্ষে মস্তক উত্তোলন করুক। যাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ ভিন্ন কোন সাধনা সিদ্ধ হয় না, সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া আমি আসন পরিগ্রহ করিলাম।

চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ

(১)

বাঙালীর আত্মহত্যা

বর্ত্তমানে বাঙালী জাতি আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। একেই ত রাজনীতিক কারণে বাঙলার বাহিরে বাঙালীর জীবিকার্জ্জনের দ্বার রুদ্ধ, তাহার উপর তাহার মাতৃভূমি এই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশেও তাহার অন্ন উঠিবার উপক্রম হইতেছে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রগৃহস্থ বাঙ্গালীর ত কথাই নাই। তাহাদের ঘরে যত বেকার, বোধ হয়, জগতের আর কোন শ্রেণীর মধ্যে তত নাই। যে বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার সহিত বাঙালীর সম্পর্ক নাই, হয়ত দুই চারি দিন হইতে সে সম্পর্ক পাতান হইতেছে, কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কয়জন? হয়ত দুই চারিজন খুচরা দোকানদার বাঙালী আছে। কৃষিকার্য্যেও অর্দ্ধেক লক্ষ্মী ; কিন্তু তাহা এত ভরপুর যে, সেখানে আর স্থান নাই। ভরসা ওকালতী, ডাক্তারী অথবা চাকরি। সেদিকে একেবারেই স্থানাভাব।

ইহা ছাড়া বাঙালীর স্বকৃত অপরাধেরও ঘাট নাই। বাঙালীর কর্ম্মবিমুখতা, শ্রমে আতঙ্ক, আলস্য ও আরামপ্রিয়তা বাঙালীকে জীবন সংগ্রামে মরণের পথে লইয়া যাইতেছে। বাঙলার বাহিরের লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালী এই সকল দোষে পারিয়া উঠে না। বাঙালী ধ্বংসের পথে যাইবে না কেন?

বাঙালী স্বেচ্ছায় এই অপরাধকে পুষিয়া রাখিয়াছে। উহার প্রতিকারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহা যদি আত্মহত্যা না হয় তাহা হইলে আত্মহত্যা কি, আমি জানি না। কেবল কি কর্ম্মবিমুখতা? অপকর্ম্মেও বাঙালী অগ্রণী। যে দোষগুলি মানুষকে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়, সেগুলিতে বাঙালী যত সহজে ও সত্বর অভ্যস্ত হয়, তত বোধ হয় আর কোন জাতি নহে। ইহার মধ্যে একটা মহৎ দোষ চা-পান।

এই চা-পানের অপকারিতার কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বসুমতীতে "চা-পান না বিষ-পান" শীর্ষক প্রবন্ধে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। নূতন আমদানী সভ্যতার মাপকাঠি এই চা! চা না হইলে বাঙালী গৃহস্থের ঘর-সংসার একদিনও চলে না। ভদ্র, শিক্ষিত, ইতর, অশিক্ষিত সকলের ঘরেই চা চাই-ই! ইহার

ফলে বাঙালীর ধনের ও স্বাস্থ্যের প্রতিদিন কত অপব্যয় হইতেছে, তাহা কয়জন বাঙালী ভাবিয়া দেখেন।

প্রথমেই দেখা যাউক, কি ভাবে কত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থগৃধ্নু বণিকগণ চা-এর প্রচলনের জন্য কত অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছে। গত শতাব্দীর শেষভাগেও বাঙালা দেশে চা-এর এমন বিষম প্রচলন ছিল না। তখন দুই চারিজন সৌখিন বাঙালী বাবু ও বাঙালী ডাক্তার চা-পান করিতেন। বাঙালী জনসাধারণ তখন চা-পান করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিত না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইবার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন আসামে চা-বাগান পর্য্যবেক্ষণ করিতে যান। তথায় চা-কর দিগের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে তিনি তখন বলিয়াছিলেন—"তোমরা কেবল ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এ দেশের চা-এর প্রচলন করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু এই ত্রিশ কোটি লোকের আবাসভূমি ভারতবর্ষে চা চালাইবার কোন চেষ্টা করিতেছ না। আমি যদি তোমাদের মত চা-কর হইতাম, তাহা হইলে ভারতে চা চালাইবার ব্যবস্থা করিতাম। যাহাতে কৃষকগণ ধান কাটিতে কাটিতে একবার অবসর মত মাঠের মধ্যেই চা পান করিয়া শীতের বা বর্ষার কাঁপুনী হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, যাহাতে আবক্ষ-জলে নিমজ্জিত থাকিয়া কৃষক পাট কাচিতে কাচিতে এক পেয়ালা চা-পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, যাহাতে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙালীর ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য চা-এর প্রচলন হয়, যাহাতে এদেশবাসী এক পয়সায় সস্তায় চা-এর মোড়ক পাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে, আমি সেই ব্যবস্থা করিতাম।" লর্ড কার্জ্জনের এই ভবিষ্যৎ চিত্র আজ সফল হইয়াছে, চা-করেরা তাঁহার উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া অদ্ভুত বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সাহায্যে এই বাঙলা দেশের রাজধানী হইতে সুদূর পল্লীর নিভৃত কোণেও চা ছড়াইয়া দিয়াছেন।

ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ায় চীনা চা-এর পরিবর্ত্তে ভারতীয় চা-এর প্রচলন চেষ্টা করিতেন। এতদর্থে তাঁহারা চিকাগোর বিশ্বমেলায় ভারত হইতে এক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ভারতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত খিদমদগারও গিয়াছিল। তাহারা দর্শকদিগকে বিনামূল্যে ভারতীয় চা পরিবেশন করিয়াছিল। মার্কিন মুলুকের লোক, বিশেষতঃ মার্কিন মহিলারা সর্ব্বদা নূতন চাহে। ভারতীয় পরিচ্ছদ-ভূষিত খিদমদগার ও বিনামূল্যে চা উভয়ের যোগাযোগের ফলে মার্কিনে ভারতীয় চা-এর প্রসার হইল। ভারতীয়

প্রতিনিধি অতঃপর মার্কিণের অন্যান্য স্থানেও প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিলেন। সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, হাটবাজার প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রচার চলিয়াছিল। ফলে মার্কিন জাতি ভারতীয় চা-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ভারতে লর্ড কার্জ্জনের বক্তৃতায় কাজ হইল। চা-করেরা এইবার ভারতে চা-প্রচারে মস্তিষ্ক ও অর্থ নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। আসাম ও কাছাড়ের চা-করগণ স্ব স্ব চা বাগিচার পরিমাণ অনুসারে চা ভিক্ষা দিতে লাগিলেন; সেই চা ছোট ছোট মোড়কে পুরিযা কেবল বাঙলায় নহে, ভারতের সর্ব্বত্র মাত্র এক পয়সা মূল্যে বেচিতে লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষার্থীদিগকে বিনামূল্যে চা-পান করাইবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাঁবু ফেলা হইতে লাগিল।

একজন 'টি-কমিশনার' এতদর্থে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে 'ইণ্ডিয়ান টি-সাপ্লাই কোম্পানী' সুলভমূল্যে জনসাধারণকে চা সরবরাহ করিত। 'টি-কমিশনার' সুলভ মূল্যে নহে, একেবারে বিনামূল্যে জনসাধারণকে 'চা-খোর' করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে উপবীতধারী হিন্দুকে 'হিন্দু' চা বেচিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। পাছে জাতিনাশ হইবার ভয়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা চা ক্রয় না করে, এজন্য গেলাসের পরিবর্ত্তে মাটির ভাঁড়ে চা বিক্রয় করা হইতে লাগিল।

তাহার পর সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে চা-এর মজলিস্ স্থায়ীরূপে বসাইবার বন্দোবস্ত হইল। বিদেশে রপ্তানি চা-এর উপর যে সেস্ বা কর ধার্য্য করা হয় উহা হইতে চা-এর মজলিসের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে এই বাবদে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে চা-এর উপর শুল্ক বাবদ সরকারের ১২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

এইস্থানে আমরা রয়াল কৃষি-কমিশনের রিপোর্টের চতুর্থ ভাগের ৩৯৭ পত্রাঙ্ক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। —"বাজারের বিক্রেতাদিগের মারফতে চা বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য তহবিলের টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। চল্লিশ হাজারেরও উপর দোকানদারকে চা বিক্রয় করিবার জন্য প্রভাবিত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে মনোহর বিজ্ঞাপনসমূহ সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চা-এর আধার, চা ওজন করিবার সরঞ্জাম এবং চা-এর মোড়কও বিনা পয়সায় দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্ববঙ্গ, হাওড়া, বোম্বাই, বরোদা, মধ্য-ভারত,

দক্ষিণ-ভারত রেলপথের বড় বড় জংসনে, ও ষ্টেশনে গাড়ীর যাত্রীদিগকে চা-খোর করিবার জন্য সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কমিটির পরামর্শে ভারতের বড় বড় কলকারখানার সান্নিধ্যে চা-এর দোকান খোলা হইয়াছে। প্রায় তিন শত সামরিক আড্ডায় চা-পান ও আমোদ প্রমোদের স্থান প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।"

চা-প্রচার সমিতির কার্য্য-প্রণালী অদ্ভুত। যে সকল স্থান দিয়া রেল লাইন গিয়াছে, তাহার নিকটস্থ সহর ও পল্লী তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১৩৭টি সহরে চ-খানা স্থাপিত হইয়াছিল। বৎসরের শেষে উহা ৮৮৩টিতে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া কেবল শুষ্ক চা বেচিবার জন্য ২ হাজার ৮শত ৫৮টি দোকান খোলা হইয়াছিল। সম্বৎসরে ভারতের ৫২ হাজার ৪ শত ৩৩টি স্থানে চা প্রস্তুত করিয়া লোককে পরিবেশন করা হইয়াছে।

চা-এর বিজ্ঞাপনেও কম মস্তিষ্ক ও অর্থ নিয়োজিত হয় নাই। প্রচারকেরা নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ করেন। যখন দেখেন যে, সহরে প্রায় শতকরা ৫০ জন লোক চা ধরিয়াছে, আর সহরেও চা-এর দোকানের অভাব নাই, তখন তাঁহারা প্রচার কার্য্যের জন্য অন্যত্র যাত্রা করেন। সে সহরেও এইভাবে টোপ্ ফেলা হয়। তবে যেস্থান ত্যাগ করিয়াছেন, সে স্থানে বিক্রয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহাতেও দৃষ্টি রাখেন। টি-সেস্ কমিটির বিবরণে প্রকাশ—এমন সহর নাই, যেখানে দুই এক বৎসর প্রচারের পর চা-এর কাটতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই!

বুঝিয়া দেখুন, বিদেশী ব্যবসাদারের প্রচার মহিমা কিরূপ। বিষবৃক্ষের ফল তাঁহারা কি মনোহর চমৎকারের আকারেই দেখাইতে জানেন। তাঁহাদের মহিমা অপার! ৫ কোটি বাঙালী এবং ৩২ কোটি ভারতবাসীকে বিদেশী অর্থপিশাচ স্বার্থান্ধ বনিক কি মোহন মন্ত্রেই না বশীভূত করিয়া চা-পান অথবা বিষপান করাইতেছেন, এবং বাঙালী ও ভারতবাসী সুধাভ্রমে গরল পান করিয়া কিরূপেই না ধনে প্রাণে উৎসন্ন যাইতেছেন।

এইস্থানে সাধারণ বাঙালীর দৈনিক ব্যবহার্য্য খাদ্যের কথা উল্লেখ করিব। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে দৈনিক বসুমতীর স্তম্ভে দেখিয়াছিলাম কিরূপে ৪০৲ হইতে ৬০৲ বেতনের বাঙালী কেরাণী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার বিবরণ আছে। কলিকাতা সহরে বাড়ী ভাড়া, তাহার উপরে বাঙালী ভদ্রলোকের ভিতরে 'ছুচার কীর্ত্তন' হইলেও বাহিরে 'কোঁচার পত্তন', অর্থাৎ জুতা, জামা, ধপধপে ধুতি, উড়ানী এই সকল বাদ দিলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটি পরিবারের

পড়পড়তা ৫ জনের জন্য কি থাকে ? কেবল কলিকাতা শহরে নহে, সারা বাংলা দেশটি ধরিলে শতকরা ৮৫ জন বাঙালীর সামান্য একটু দুগ্ধও জোটে না। বাঙালীর আহার অর্থে উদরূপ গহ্বরটিকে রাবিশের দ্বারা পরিপূর্ণ করা। খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ (যথা—ম্যাস্‌কারিসন) বলিয়াছেন যে, পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে বাঙালী ও মাদ্রাজী, ভারতের সকল জাতির নিম্নস্থান অধিকার করিয়া থাকে। মাড়বারী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, পশ্চিমা, বিহারী ও বোম্বাইবাসীরা যদিও প্রধানতঃ নিরামিষাশী—অন্ততঃ উচ্চজাতীয় হিন্দু—তথাপি তাহারা লাল আটার চাপাটী আহার করে ; পরন্তু কিছু পরিমাণে ঘৃত বা অন্য গব্যও তাহাদের নিত্য আহার্য্য। বাঙলা, আসাম ও উড়িষ্যায়, বিশেষতঃ ভদ্রশ্রেণীর—কিছু ফেনরহিত ভাত, কিছু ডাউলের জল, শাকপাতা ঘণ্ট, ডালনাই ভরসা ! মৎস্য ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু কেবল সধবাদিগের মনে প্রবোধ দিবার মত নামমাত্র মাছের টুকরা বা ঘুসাচিংড়ী ও চুনা পুঁটি পাতে পড়িয়া থাকে !

এই সামান্য আহার—বাঙালী কাজেই দিন দিন বলবীর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছে। বাঙালী পরিবারের শিশুসন্তানগণের দেহের অবস্থা দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। এই সকল শিশুসন্তান কতটুকু দুগ্ধ পান করিতে পায় ? কৃষক ও শ্রমিকের শিশুগণ ভাতের মাড় পায়। 'ভদ্র' গৃহস্থের শিশুদের বার্লি শটীই ভরসা। অথচ রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে জানা গিয়াছে যে বাঙালীর এই খাদ্যে অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের উপাদান একেবারেই নাই।

ইংরাজ রাজগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের সুশাসনে দেশের দিন দিন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যতই তাঁহাদের সুশাসনের মহিমা কীর্ত্তন করুন, আমি আমার বাল্যকালে বাঙলায় বাঙালীর যে শ্রীসম্পদ দেখিয়াছি, তাহার তুলনায় বর্ত্তমানের বাঙলায় শ্মশানের স্পর্শ পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ৬০।৬২ বৎসর পূর্ব্বে বাঙলার পল্লীর ঘরে ঘরে ধানের গোলা ও মরাই, ঢেঁকি ও ঢেঁকিশাল, গোশালায় পয়স্বিনী গাভী, তড়াগ-নদীতে, খালে-বিলে প্রচুর মৎস্য, ক্ষেত্রে শস্য এবং বাগানে শাকসব্জীর প্রাচুর্য্য যাঁরা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন বাঙলার হতশ্রী পল্লীর অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে কত ব্যথাই না অনুভব করেন !

সত্য বটে, তখন দেশে কথায় কথায় টাকার ছিনিমিনি খেলা ছিল না, টাকার প্রচলন খুবই কম ছিল, এমন কি কড়ির সাহায্যে বিকিকিনি চলিত। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। নগদ টাকায় বিলাসিতা বাবুয়ানা চরিতার্থ করা সম্ভবপর হইত না বটে, কিন্তু বাঙালী তখন প্রচুর পরিমাণে পেট ভরিয়া

পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিত এবং সুস্থ, সবল দেহে কালাতিপাত করিত। এখন আমরা কি করি? এখন আমরা অঙ্গে বিদেশী চাকচিক্যশালী সৌখিন জিনিস ব্যবহার করিতে ও নানা মাদক দ্রব্য সেবন করিতে শিখিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের পেটে অন্ন নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, চক্ষুতে দীপ্তি নাই, শরীরে শক্তি নাই; বাড়ীর বাহির হইলেই আমরা বাসে ট্রামে চড়ি, পথে নামিলেই পান সিগারেট লেমনেড কিনি, ঘন ঘন চা-পান করিয়া পিপাসার তৃপ্তি সাধন করি। এদিকে আমাদের নন্দদুলালরা দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত অভিভাবকগণের রক্ত-শোষণ করিয়া আপনাদের প্রত্যেকের জন্য মাসিক ৪০৲।৫০৲ টাকা ব্যয় বাবদ আদায় করেন। তাঁহাদের প্রসাধনের (ক্ষৌরকর্ম্ম, টয়লেট ইত্যাদি) সরঞ্জাম বাবদ ব্যয়ে পূর্ব্বে ছেলেরা লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিত। তাহার পর শ্রীমানদের অপরাহ্ণে হোটেল-রেঁস্তোরায় চা পানের সঙ্গে চপ, কাটলেট, টোষ্ট পুডিং স্প রোষ্টের ব্যয় আছে। সন্ধ্যা হইলে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিনবার সিনেমার খরচ আছে। ফুটবল ম্যাচে এক টাকা আট আনা নিত্য খরচ করা চাই! তাঁহাদের পরামাণিকে চুল ছাঁটিলে চলে না। হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়া চারি পয়সার স্থলে চারি আনা দেওয়া চাই। সাধারণ রজক, তাহাদের কাপড় কাচিতে পায় না, ডাইং-ক্লিনিংএর টিকিট মারা ধোপ-দোরস্ত ধুতি-জামা ঘরে আনয়ন করা চাই। ছাতায় তাহাদের বৃষ্টির জল আটক করে না, ওয়াটার প্রুফ চাই। দোলাই আলোয়ানে শীত ভাঙ্গে না, অলষ্টার-সোয়েটার চাই। আত্মহত্যার কত চমৎকার উপায়ই না আমরা নিত্য আবিষ্কার করিতে অভ্যস্ত হইতেছি! বাঙালীর নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যের এই অবস্থা; কাজেই যখন অধিকাংশ বাঙালী 'ভদ্রলোক'ই কলম পিষিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন, তখন তাঁহাদিগের কার্য্যকালের অবসর সময়ে চা-পান করিয়া কোনরূপে হাড়গুলিকে তাজা করিয়া লইতে হয়; প্রভাতে আটটায় নাকেমুখে শাকান্ন গুঁজিয়া ছুটাছুটি করিয়া কোনরূপে নৈহাটি, বারাসাত, হুগলী, ব্যাণ্ডেল বা বারুইপুর, সোনারপুর, প্রভৃতি ষ্টেশনে রেলগাড়ী ধরিয়া কলিকাতার সরকারী বা সওদাগরী অফিসরূপ তীর্থস্থানের অভিমুখে দৌড়াইতে হয়। সারাদিন মনিবের ঘানিতে যোড়া থাকিয়া অবসন্ন-ক্লান্ত দেহে এক কাপ-চা—তাহা যে কি অমৃত তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! এইরূপ কাপের পর কাপ চলে। সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধাও মরিয়া আসে, অজীর্ণ রোগও উদর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া 'কায়েম-মোকাম' হয়। বোম্বাইএর কেরাণীদের আমি দিনে ৬।৭ কাপ চা খাইতে দেখিয়াছি।

বাঙ্গালী কেরাণীবাবুরা বড পশ্চাদ্‌পদ নহেন। মাদ্রাজীরাও 'গরম পানি' পেটে দেন বটে, কিন্তু চা-এর পাচনে নহে, কাফির কাপে। ইহাতে যে সর্ব্বনাশের বীজ উপ্ত হইতেছে, তাহা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।*

চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ

(২)

এইবার চা-পানে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে দেখাইবার প্রয়াস পাইব। মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের কোন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন—"দেখুন, একজন মধ্যবিত্ত ইংরাজ তাঁহার দৈনন্দিন আহার্য্য বাবদে তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহার মধ্যে সুরাপানের ব্যয় ধরা হয় নাই। তাঁহার ব্রেকফাষ্ট বা প্রাতরাশের উপকরণ,—ডিম, টোষ্ট, চা; তাহার পর টিফিন—সুপ, মৎস্য, মাংস, পুডিং, ফল ইত্যাদি; রাত্রি আটটার সময় ডিনার—ইহাতে চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, সমস্তই পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের মত মধ্যবিত্ত মাদ্রাজীর দৈনিক আহারের ব্যয় এক আনার অধিক হয় না।"

কথাটা ভাববার মত নহে কি? এক আনা খাদ্যে কি শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়? আমাদের বাঙালী তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর অল্প বেতনে কেরাণীর দৈনিক আহার্য্যের জন্য গড়ে ৫।৬ পয়সাই জুটে কিনা সন্দেহ! সুতরাং দেশের সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যদি তাহাদের ভাগ্যে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য জুটে তাহা হইলে বরং দুই-এক পেয়ালা চা-পান করিলেও ক্ষতি না হইতেও পারে। ইংরেজরা শীতপ্রধান দেশের লোক, তাহারা প্রত্যেকেই নিত্য শারীরিক ব্যায়াম করে, এই জন্যে প্রায়ই তাহারা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ হয়। তাহারা পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া থাকে। কিন্তু এ দেশের যে সকল কেরাণী অল্প আয়ে সংসার প্রতিপালন করেন, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাঁহারা নিত্য ৫।৬ পেয়ালা চা-পান করিয়া জঠরজ্বালা নিবারণের প্রয়াস পান। ইহাতে যে তাঁহাদের কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। এ বিষয়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্জন

---

* মাসিক বসুমতী—ভাদ্র, ১৩৩৮।

সেন. এম. ডি. মহাশয় কি বলেন শুনুন,—"বহু প্রাচীন যুগ হইতে বাংলার ধনী দরিদ্র সমস্ত গৃহস্থই প্রত্যূষে গুড়-ছোলা অথবা আদা-ছোলা খাইয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ ছোলা-মুড়ি, ফেন-ভাত ও (মিলিলে) দুগ্ধ খাইতেন। খাদ্যের পুষ্টিকারিতা হিসাবে এসকল খাদ্যের তুলনা নাই। ধনী বাঙালী ইহার উপর মাখন-মিছরিও আহার করিতেন। কখনও কখনও ছানা-চিনি তাঁহাদের প্রাতরাশের অন্তর্ভুক্ত হইত। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় চা-সমিতি (Indian Tea Association) ভারতে চা-প্রচলনের উদ্দেশ্যে জনগণকে চা-খোর করিবার অভিপ্রায়ে রীতিমত চা-ব্যবসায়ের প্রচার কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই এত দরিদ্র যে, ছোলা, বাতাসা ইত্যাদি খাদ্যের উপর চা-এর মূল্য যোগান দিতে পারে না; এই হেতু প্রত্যূষে উপরি উক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র চা পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে। যখন চা-ব্যবসায়ী সমিতি তাঁহাদের স্বার্থসাধনে বদ্ধপরিকর হন, তখন স্বাস্থ্য-বিভাগ এই অনিষ্টকর প্রচার কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পন্থা গ্রহণ করেন নাই। অতি সামান্য অংশ ব্যতীত চা-এর পেয়ালায় কোন পুষ্টিকর পদার্থ থাকে না; যাহা থাকে, তাহা নগণ্য। এ কথা তাঁহারা দেশবাসীকে বুঝাইয়া সতর্ক করিয়া দেন নাই।

"চা-সমিতির স্বার্থপরতা ভারতের প্রাচীন আহার-ব্যবহারের ধ্বংসসাধনে যত্নবান হইল, এবং কোন দিক হইতে কোন বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া তাহাদের এই নিন্দনীয় কার্য্যে সাফল্য লাভ করিল। ফলে সরল দেশবাসীর প্রাচীন পুষ্টিকর খাদ্যের স্থানে এই সর্ব্বনাশা চা-পানের পাপ প্রবেশলাভ করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে লাগিল।"

এই চা অথবা বিষপান এত অনিষ্টকর, অথচ ইহা এখন সমাজের সর্ব্বস্তরে সঞ্চারলাভ করিয়াছে। আমি কোন ছাত্রের মুখে শুনিয়াছি যে, সে কোন মুদ্দফরাসকে তাহার বন্ধুর সমক্ষে বলিতে শুনিয়াছে যে,—"হাম এক পেয়ালা চা পিয়া হ্যায়, তামাম দিনভোর আর কুছ নেহি খায়া হ্যায়।" ভাবিয়া দেখুন, কি সর্ব্বনাশই দেশের হইতেছে। কেবল মেসে ও ছাত্রাবাসে নহে এখন বাঙালীর ঘরে ঘরে এই পাপ প্রবেশ করিয়াছে।

বিপদ সর্ব্বত্রই, তবে যে বাঙালীর ঘরে 'শিক্ষিত' মহিলা প্রবেশলাভ করিয়াছেন, সেই ঘরের বিপদ আবার সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন! কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমার এক ছাত্রের সহিত মাদ্রাজ অঞ্চলে যাত্রা করি। তিনি এখন উচ্চপদে

সমাসীন। তৎকালে তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সেথানে চা পাওয়া যায় না?—ওগো কোন্ ষ্টেশনে চা পাওয়া যাবে গো?" আমার আর একটি উচ্চপদস্থ রাসায়নিক ছাত্রের আলয়ে আমি একবার বিদেশ যাত্রা-কালে আতিথ্য গ্রহণ করি। সে সময়ে দেখি যে, তিনি স্বয়ং চা পান করেন না, কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিনী চা-পানে একেবারে সিদ্ধ-হস্ত! ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুটি পর্য্যন্তও বলিতে ছাড়ে না,—"মা আমি এক চুমুক খাই।" আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, তাঁহাদেরই দুই তিনটি সন্তান বারান্দার কোণে বসিয়া পরম আনন্দে চা-পান করিতেছে! মাতৃক্রোড় হইতেই এদেশের শিশু এইরূপে শিক্ষানবিশী করে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

বাঙলার ঘরে ঘরে—বিশেষতঃ সহরের শিক্ষিত বাবুদের ঘরে এইভাবে আবালবৃদ্ধ-বনিতার চা-পান চলিতেছে। সুতরাং বড় দুঃখে বলিতে হয়, আমাদের ঘরের মা লক্ষ্মীরাই চা-সমিতির পক্ষ হইতে এদেশে চা-এর প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। এজন্য চা সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য। আমাদের বাঙালীর ঘরের বিলাসপরায়ণা নবীনা মা লক্ষ্মীরা সন্তানকে বিষ পান করাইতেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে আমাদের বাঙালীর ঘরে ঘরে মা-লক্ষ্মীরা সন্তানের জন্য কি ত্যাগই না স্বীকার করিতেন! আমার বিশেষ পরিচিতা কোন প্রাচীনা বাঙালী মহিলা চিরজীবনের জন্য আম্রফল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কি জন্য তিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমৃত ফল স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বাষ্পজড়িতকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"আমার বাছা যে ছেড়ে যাবার আগে আম খেতে চেয়েছিল, তাকে ত আম খেতে দিতে পারি নি।" এমন অনেক প্রাচীনা মা-লক্ষ্মী সন্তানের জন্য পৃথিবীর কত মুখরোচক দ্রব্য মানত করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা অতীত যুগের অনেক বাঙালী জানেন। বলিতে লজ্জা হয়, আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মা-লক্ষ্মীরা আপন সন্তানকে এই বিষ-পানে অভ্যস্ত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না, কারণ তাঁহারা স্বয়ং চা-পান বিশারদা; সন্তানের জন্য চা-বর্জ্জনরূপ স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা তাঁহাদের নাই।

একাধিকবার চা-পান স্বাস্থ্যের কিরূপ হানিকর, তাহা বিশিষ্ট অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। লণ্ডনের 'রয়াল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্‌স'-এর ফেলো বা সদস্য ডাক্তার জে. ওয়াল্‌টার কার, এম ডি লিখিয়াছেন—"চা ও কাফি হৃদযন্ত্রের এবং স্নায়ুসমূহের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া

থাকে। চা যদি খুব উত্তমরূপেও প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে (কোন কোন লোকের পক্ষে অল্প পরিমাণে) পান করিলে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়, স্নায়ুসমূহের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হয়, মস্তিষ্ক-ঘূর্ণন রোগ দেখা দেয়; এমন কি অবশেষে অনিদ্রারূপ ভীষণ রোগও আক্রমণ করে। খাদ্যের পরিবর্ত্তে ইহা গ্রহণ করিলে নিশ্চিতই অনিষ্টসাধন করে। অনেকে শ্রম ও ক্লান্তি অপনোদনের জন্য চা-পান করিয়া থাকে। এইরূপে মানুষের মস্তিষ্ক যখন বিশ্রামপ্রার্থী হয়, সেই সময়ে অস্বাভাবিক উপায়ে তাহাকে উত্তেজিত করায় অত্যন্ত কুফল উৎপন্ন হয়।"

চা পানে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, সে সম্বন্ধে এরূপ বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেম্ব্রিজের ডাক্তার ডবলিউ. ই. ডিক্সন্ উইনিপেগ সহরের চিকিৎসক সম্মেলনের সম্মুখে 'মাদকতা পাপ' সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন—"এক পেয়ালা চা-পানে বিপদ সমধিক হইয়া থাকে। উহাতে স্নায়ুমণ্ডলের অসম্ভব উত্তেজনা হয়। স্নায়ুঘটিত রোগের এক মূল কারণ—ক্যাফিন বিষপান। ক্যাফিন জগতের প্রায় সর্ব্বত্র নিয়মিতরূপে প্রত্যহ পান করা হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। চা ও কফিতে ক্যাফিন বিষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকে। এক পেয়ালা চা-তে এক গ্রেণেরও অধিক ক্যাফিন পাওয়া যায়। নিত্য চা-পায়ীরা প্রত্যহ গড়ে ৫ হইতে ৮ গ্রেণ ক্যাফিন বিষ পান করিয়া থাকে। ইহা বড় সামান্য নহে। ক্রমাগত ক্যাফিন বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখনও কখনও উহাতে শিরোঘূর্ণন ও অজীর্ণরোগের উৎপত্তি হয়। প্রত্যহ ১৭ গ্রেণ ক্যাফিন পানে দেহে এক প্রকার রোগের সঞ্চার হয়। কেহ কেহ ক্যফিনকে চিন্তা-প্রসবিনী মাদকতা আখ্যা দিয়া থাকে। কারণ, তাহারা মনে করে, ক্যাফিন পান করিলে চিন্তাশক্তির ও স্মরণ-শক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এ ধারণা ভ্রান্ত। ক্যাফিনের মত চা-পানেও দৈহিক অবনতি ঘটিয়া থাকে।"

ডাক্তার যদুনাথ গাঙ্গুলী 'বোম্বাই ক্রণিকল' পত্রে চা-পানের অপকারিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"গত কয়েক বৎসরে সারা দেশে চা-এর প্রচারের দ্বারা আমাদের দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে অজীর্ণ রোগ আনয়ন করা হইয়াছে, ফলে আমাদের সহরে ও জনপদে চা ঘটিত অজীর্ণ রোগ প্রায় সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়াছে। সূপের আকারে শর্করা ও দুগ্ধমিশ্রিত গাঢ় চা

দিনে ৬।৭ বার পান করিলে উহার মধ্যস্থ ট্যানিন নরদেহের ভীষণ অপকার সাধন করে। ইহার ফলে অম্লশূল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য রোগ দেখা দেয়, এবং পরিণামে পাকস্থলীর বিস্তৃতি ও হৃদযন্ত্রের স্পন্দন আরম্ভ হয়।"

ডাক্তার সি. এ. টিরেল, এম. ডি. বলেন—"কঠিন অথবা জলীয় যে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা হউক না কেন, উহাব উত্তাপ দেহের উত্তাপের সহিত সমপর্য্যায়ে থাকা আবশুক, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; সুতরাং এদেশে শূন্য উদরে কোন অস্বাভাবিক উপায়ে উত্তপ্ত আহার্য্য বা পানীয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।" শূন্য উদরে গরম চায়ের অপকারিতা সম্বন্ধে ডাক্তার জন ফিসার লিখিয়াছেন—"চায়ে ঝাঁঝান ট্যানিক এসিড থাকে। চা খাদ্য নহে, ইহা মাদক দ্রব্য; ইহা উত্তেজক গুণবিশিষ্ট। যদি অধিক পরিমাণে চা পান করা যায়, তাহা হইলে পরিপাকশক্তি নষ্ট হয়, এবং স্নায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। পরে উহা হইতে অল্পে উত্তেজনা ও ক্রোধ, বুক ধড়ফড়ানি, অজীর্ণতা, দুর্ব্বলতা ও দৃষ্টিহীনতার উদ্ভব হয়।" যে কোন বিষয়ে পরিমিতাচারিতাই স্বাস্থ্যের মূল; ইহা খেলাধুলা, কাজ ও ভালবাসাতে যেমন সত্য, চা পানেও তেমনিই। প্রত্যেক চাযের পেয়ালায় ২॥ গ্রেণ ক্যাফিন থাকে। ইহার প্রতিক্রিয়া বিষের মত ভয়ঙ্কর। ইহার অনিষ্টের ক্ষমতা ক্রমশঃ জমিতে থাকে; কোকেনের মত ইহা প্রথমে খুব উত্তেজনা সৃষ্টি করে, কিন্তু পরে অবসাদ আনয়ন করে। এইরূপে চা দেহে ও মনে অবসাদ, অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা হইতে অজীর্ণ, অনিদ্রা, রক্তাল্পতা, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের উৎপত্তি হয়। অনেক সময়ে চা পানের অভ্যাস হইতে সুরাপানের প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়; অথবা উন্মাদ্ রোগও দেখা যায়। কাফিও তুল্য মূল্য, কোকেনও তথৈবচ।

বুঝিয়া দেখুন, কি ভীষণ! মানুষ যাহা হইতে উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়, তাহা স্বেচ্ছায় পান করিতে অভ্যস্ত হয় কেন, বুঝিয়া উঠা যায় না। ডাক্তার জে. ব্যাটিটিউজ বলেন—"ব্রাণ্ডির বোতল অধিক ক্ষতিকর, না চায়ের পেয়ালা অধিক অনিষ্টকারক, তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই।" অনারেবল আর. রাসেল বলেন—"চা ও কাফির বিষক্রিয়ার কথা অনেকে জানে না। এই প্রকৃতির পানীয় দ্রব্য মানুষের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া দেয়; স্নায়ু, মস্তিষ্ক, পরিপাক-শক্তি, যকৃত প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময়ে অল্প পরিমাণ চা পানেও সুনিদ্রা হয় না।" আর একজন ডাক্তার বলিয়াছেন—"চা ও কাফির নিত্য

অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এই ক্যাফিন মিশ্রিত অজীর্ণজনিত অবসাদ, স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, অস্থিরতা, উত্তেজনা, কম্পন, শিহরণ, ব্যাহত নিদ্রা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, মানসিক দৌর্ব্বল্য, বুক ধড়ফড়ানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অপস্মার রোগ দেখা দেয়। চা পানের অভ্যাস ত্যাগ করিলে, আবার ক্রমে ক্রমে এই সকল রোগ দূর হয়।"

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদিগেরই অভিমত এইরূপ। অথচ জানিয়া শুনিয়া সকলে নিত্য এই বিষপান করিতেছে। আরও সর্ব্বনাশ এই যে, পাপ আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে! আমি আজ ২৫ বৎসর যাবৎ 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' বিষযে বাঙালী জাতিকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। বাঙালী বড়ই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীরা এই বুদ্ধির উপর 'টেক্কা দিয়া' কিরূপে আপনাদের পকেট পূর্ণ করিতেছে তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিলাম।

ইহা দেখিয়াও কি বাঙালী আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিবে না? বাঙালীর কি ইহাতেও চৈতন্যের উদ্রেক হইবে না? বাঙলা ভাষায় লিখিত 'স্বাস্থ্যসোপান'এ-নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি দৃষ্ট হয়ঃ—

"পরমেশ্বর মানুষের জন্য চা ও কাফি নামক দুইটি উত্তম পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন! ইহা আত্মাকে শান্তি দেয়; চিত্তকে একাগ্র করে; অসুখ দূর করে, ক্লান্তি নাশ করে; বিচারশক্তি বৃদ্ধি করে; শরীরের বলবৃদ্ধিও নূতন করে এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা করে।"

গ্রন্থকার Tea Association-এর পক্ষে কি ভাবে নিঃস্বার্থ ওকালতী করিতেছেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুকুমারমতি ছাত্রগণকে এ প্রকার আপত্তিকর উপদেশ দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। এইরূপ গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত কিরূপে হইল তাহা বুঝা যায় না। প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত উক্তি—চা পান করিলে ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিকার হয়, ইহা নিছক মিথ্যা কথা।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, চা পান করিলে জাতিনাশ হইবে, এমন কথা আমি বলি না। পরিমিত চা পানে দেহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে এমন কথাও আমি বলিতেছি না। আমার বলিবার কথা এই যে, যদি বাঙালী সংযম ও নিয়মের অনুজ্ঞা মানিয়া প্রচুর সারবান্ ও পুষ্টিকর খাদ্যের সহিত সামান্য একটু চা দিবাভাগে একবার মাত্র পান করে, তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু বাঙালী অপরিমিত চা পান করিতে অভ্যস্ত হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন

করিতেছে, ইহাই দেখাইয়া আমি সময় থাকিতে বাঙালীকে সতর্ক হইতে বলিতেছি।

আর একটি কথা এই যে, বাজারে অধুনা অলিতে গলিতে চায়ের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলের অধিকাংশে বাঙালী কি প্রকৃতির চা পান করে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখে কি? একেই ত এই চায়ের পেয়ালায় সামান্য দুধ ও চিনি থাকে; সেই দুগ্ধ টিনে রক্ষিত ননী তোলা দুগ্ধ, উহার সারাংশ নাই বলিলেই হয়। সুতরাং সামান্য দুগ্ধ ও চিনি ছাড়া চায়ে কি থাকে? উহার ৯৮ ভাগ জল ও ২ ভাগ দুধ ও চিনি। কাজেই ইহাতে খাদ্যের উপকার নাম মাত্র পাওয়া যায়, অথচ ক্যাফিন বিষের অপকার সমধিক, তাহার উপর যে সকল সসার ও পেয়ালায় চা দেওয়া হয়, অথবা যে সব কেটলিতে চায়ের জল উত্তপ্ত করা হয়, সেগুলি কি কখনও পরিষ্কৃত করা হয়? কেটলি ত্ হয়ই না, আর কাপগুলি একবার মাত্র এক বালতি জলে ডুবাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে কি উচ্ছিষ্ট সেবনের ফলে দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না?

আশা করি আমার বাঙলা মায়ের সন্তানগণ আমার কথাগুলি ভাল করিয়া একবার বুঝিয়া দেখিবেন।*

রবীন্দ্র প্রয়াণে

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে সমগ্র দেশ আজ বিষাদাচ্ছন্ন। অন্তরের অন্তস্তলে প্রত্যেক বাঙালী আজ প্রিয়জনবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছেন। আমারও হৃদয় আজ শোকে উদ্বেলিত। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা ও ভারতের নবজাগরণের মূর্ত্ত প্রতীক। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার মহিমময় অবদান ঠিক কতখানি তাহা নির্ণয় করিবার সময় আজও আসে নাই। সাহিত্যে ও ভাষায়, কর্ম্মে ও চিন্তায় বাঙালীকে যে অমর সম্পদ তিনি দান করিয়া গেলেন তাহার তুলনা নাই। যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রকে সজীব করিয়া পুষ্পে পল্লবে সমৃদ্ধ করিবে। গল্পে, গানে, প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে তাঁহার

* মাসিক বসুমতী—কার্ত্তিক, ১৩৩৮

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উন্মেষ দেখিতে পাই। বঙ্গজননীর লজ্জানত শিরে তিনি যে বিজয় তিলক পরাইয়া গিয়াছেন, চিরদিন তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া আর লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে না; কিন্তু তাঁহার সেই কণ্ঠ আজিও নীরব হয় নাই। সমস্ত দেশের প্রাণে যে অনুভূতি ও প্রেরণা তিনি সঞ্চার করিয়াছেন তাহা চির গতিশীল ও চিরচালিষ্ণু। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের নির্য্যাতিত জনগণের কণ্ঠে তাঁহারই বাণী ফুটিয়া উঠিবে—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের পূজারী। বাহিরের সৌন্দর্য্য নিতান্তই বাহিরের বস্তু ইহা তাঁহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছে কিন্তু চিত্তকে আকৃষ্ট করে নাই। পৃথিবীর সকল দেশের ছোট বড় সকল কবিই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পূজা করিয়া গিয়াছেন। অকপটচিত্তে সৌন্দর্য্যের জয়গান ঘোষিত করিয়াছেন—কিন্তু ভারতের কবি সৌন্দর্য্যের পূজার সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুভূতির চেষ্টা করিয়াছেন। এই আত্মানুভূতির প্রেরণাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সত্য, এবং এখানেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সার্থকতা। ইহাতে আত্মানুভূতির যে বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি কথায় রবীন্দ্রনাথ নিজে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বিগত ২৫শে বৈশাখের স্মরণীয় বিবৃতিতে:— "মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলিয়া মেনে নেওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি।"

আমাদের অভিশপ্ত জাতীয় জীবন তাঁহার অস্তাচল গমনে আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, ভগবানের আশীর্ব্বাদে কবে আবার নূতন উষার অরুণোদয় হইবে।*

* ভারতবর্ষ—আশ্বিন, ১৩৪৮।

কলেজের ছাত্রদের অপব্যয়

ভারতবর্ষের কলেজের ছাত্রেরা সাধারণতঃ ৪০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা করিয়া তাহাদের মাসোহারা পাইয়া থাকে। ছাত্র বলিয়া ইহাদিগকে পবিত্র একটা কিছু মনে হয়। ইহাদের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের পিতামাতা জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রেও আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখেন। এমন কি বাড়ীঘর ও জমি জমা বন্ধক দেন, এবং গৃহের যাবতীয় শ্রমসাধ্য কার্য্য নিজেরা করিয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল এই ছাত্রদের তথাকথিত কোন নীচ কাজ করিতে হয় না; কাজেই অবকাশকালে তাহারা গান, গল্প, তাসখেলা ও সখের থিয়েটার করিয়া অথবা অপরাহ্নে অধিক মাত্রায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। কিন্তু প্রাচীন-কালে ছাত্রেরা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যালাভের সময় গরু চরাইত, কাষ্ঠ আহরণ করিত এবং কৃষিকার্য করিত, অর্থাৎ বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধনও অর্জ্জন করিতে হইত।

হোষ্টেলগুলি বিশেষতঃ যে সকল হোষ্টেল সরকারের পর্য্যবেক্ষণাধীনে পরিচালিত, ঐ সকল স্বদেশীর বিরুদ্ধতা প্রচারের আড্ডা হইয়া পড়িয়াছে। লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্দেশ্য অবশ্য খুব মহৎ ছিল; কিন্তু যে সময় তিনি আধুনিক বিলাসোপকরণ সমন্বিত প্রাসাদোপম হোষ্টেল নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলিতে ১৫ লক্ষ টাকা দেন, উহা বিশেষ অশুভ মুহূর্ত্ত বলিতে হইবে। এই সকল ছাত্রাবাসে থাকিতে গেলে কোন ছাত্রই মাসিক ৪৫৲ টাকার কমে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই আবার এই সীমাও অতিক্রম করিয়া ফেলে। কলিকাতায় আমি কোন কোন পাঞ্জাবী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, পাঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর শহরে এক একটি ছাত্রের মাসিক ব্যয় ১০০৲ টাকা পর্যন্ত, এমন কি ততোধিক। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুর সম্মুখে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের দৃশ্যই ভাসিতেছে এবং তাঁহারা এই দেশেও অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন। টেনিসের জন্য ছাত্রদের ব্লেজার ও ট্রাউজার চাই, ক্রিকেট খেলার জন্য ইহাদের প্রসাধন ব্যয়ও বিপুল।

একজন গ্রাজুয়েট গড়ে কত টাকা উপার্জ্জন করে? বিশিষ্ট ধনতত্ত্ববিদ

অধ্যাপক কে. টি. শা'-কে সেদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, বোম্বাইতে এক একজন গ্রাজুয়েটের গড়পড়তা আয় কত? তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, মাসিক ২৫৲ টাকার বেশী হইবে না। আমার হিসাবে কলিকাতা ও মাদ্রাজের গ্রাজুয়েটদের মাসিক আয়ও ঐ পরিমাণ। স্পষ্টই বুঝা যায় পঞ্চনদ মধু ও দুগ্ধে পরিপ্লুত, নতুবা কি তথায় এমন অবস্থা হয়?

ইংলণ্ডের ফ্যাসান সম্পর্কে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন—"এখানে মনুষ্যজীবন চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; বরং অমিতব্যয়ী ও আলস্যপরায়ণ পোষাক বিক্রেতা ও দর্জ্জি এবং ফুলবাবু ও স্ত্রীলোকেরাই এখানে মনুষ্যজীবন নিয়ন্ত্রণ করে।"

যে শিক্ষায় মানুষ গৃহে প্রস্তুত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কলের মিহি অথচ খেলো বস্ত্রের মোহে মুগ্ধ হয়, সেই শিক্ষাকে ধিক্! যে শিক্ষায় লোকে হুঁকা ও ফড়সীকে অতীত যুগের বর্ব্বরতার অন্ধ নিদর্শন বলিয়া অবজ্ঞা করিতে শিখে, সেই শিক্ষাকে ধিক্। যদি সিগারেট খাইতে হয় তবে স্বদেশী সিগারেট অর্থাৎ বিড়িই কেন খাও না? স্বদেশী তামাকের গুঁড়া স্বদেশী আবরণে মুড়িয়া প্রস্তুত হয়—আর বিদেশী তামাক নানা প্রক্রিয়ায় সোনালী রঙে রঞ্জিত করিয়া বিদেশী খেলো কাগজে মুড়িয়া সিগারেট প্রস্তুত করা হয়, এবং এই বিদেশী সিগারেট বাবদই ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। গোনডিয়ার চারিদিকে আমি কয়েকটি বিড়ির কারখানা দেখিয়াছি। আমি জানিতে পারিয়াছি, মধ্য প্রদেশে ঐ উষর মরুভূমিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী ও বালক বালিকা বিড়ি প্রস্তুত করিয়া দৈনিক এক আনা হইতে দুই আনা উপার্জ্জন করে। এইরূপে এই অন্যতম প্রধান কুটীরশিল্প দ্বারা অর্দ্ধ লক্ষ লোক এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে।

এই বিড়ি ক্রয় করে কাহারা? উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, কৃতী ব্যবহারজীব বা সংস্কৃতির গর্ব্বে স্ফীত কলেজের ছাত্রেরা নহে—বিড়ি ক্রয় করে কুলী, গাড়োয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর অন্যান্য সামান্য লোকেরা—তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী সমাজের পরগাছা-বিশেষ। যাহারা প্রকৃত ধনোৎপাদক, সেই চাষীদের শ্রমার্জ্জিত অর্থে এই শিক্ষিত শ্রেণী জীবনধারণ করে। তাহারাই ভারতের অর্থ বিদেশে রপ্তানির হেতু।

পল্লী অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা সহরে আসিয়া সঙ্গীদের অনুকরণ করে, এবং ব্যয়-বহুল অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়। সাধারণ ধোপার ধোলাই কাপড় আর

তাহাদের মনে ধরে না, ডাইং ক্লিনিং-এর ধোলাই কাপড় তার চাই। সাধারণ নাপিতের চুল ছাটাই তার পছন্দ হয় না, হেয়ার-কাটিং সেলুনে গিয়া চুল ছাটাই করার অভ্যাস তাহার জন্মে। সহরের দেশীয় মহল্লায় পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে সকল রেঁস্তোরা গজাইতেছে সেখানে অপরাহ্নে জলযোগ তার করা চাই। সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন সন্ধ্যায় তার সিনেমায় যাওয়া চাই—আর তার এই সব ব্যয় বহন করিতে তাহার দরিদ্র পিতামাতাকে যে কতটা কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা সে বিস্মৃত হয়। পিতামাতাকে এইরূপে অর্থদানে বাধ্য করিয়া সেই অর্থ বিলাসিতায় ব্যয় করায় শিক্ষার্থীর স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাইতেছে, এবং এই স্বার্থপরতা নীচতারই একরূপ নামান্তর মাত্র। অভিভাবকের নিকট হইতে শিক্ষাব্যয় গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে অসঙ্গত নয় বটে, কিন্তু সেই খরচার পরিমাণ একান্ত যাহা না হইলে নয়, সেইরূপ ন্যূনতম হওয়া উচিত।

যে সকল শিক্ষার্থী সানন্দে অভিভাবকদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করে, তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়টি পাঠ করিলে আশা করি উপকৃত হইবে।

"আমি অতি কষ্টে কাল কাটাইতেছি। বাবা, এই দারুণ শীতে রাত্রি থাকিতেই আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে হয়, এবং রাত্রি থাকিতেই আমাকে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া উষার আলো দেখা দিবার পূর্ব্বেই কারখানায় পৌছিতে হয়, এবং সেই ভোর হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হয়। মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কিছুক্ষণ ছুটি পাই মাত্র। সময় আর কাটে না, কাজেও আমি কোন আনন্দ পাই না। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেও সুখের আলোকরেখা দেখিতে পাই। কারণ, আমার মনে এই ধারণা জন্মে যে, আমি জগতের জন্য —আমাদের পরিবারের জন্য কিছু কাজ করিতেছি। তারপর আমি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রথম সপ্তাহের উপার্জ্জনে আমি যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, সেরূপ আনন্দ এই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আমাকে দিতে পারে নাই। সে সময় আমি পরিবারের সহায়ক, এবং একজন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি! এখন আর আমি পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নই।"—এণ্ড্রু কার্ণেগী।

সকলেই বলে যে এই স্বাবলম্বী লোকটি এক শত কোটি টাকার উপর দান করিয়াছেন।

সিনেমায় যাহারা যায় তাহাদের সিনেমায় যাইবার আগ্রহ মদের নেশার মত উগ্র। জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া বালকদের সিনেমাতে যাইবার খরচা

সংগ্রহের কথা সকলেই জানেন। পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও বহু কলেজের ছাত্রের প্রায়ই সিনেমায় যাওয়া চাই।

সিনেমা দেখায় ছাত্রদের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষতি ছাড়াও তাহাদের সামান্য তহবিলের উপরও বিশেষ চাপ পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদিগকে রুদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহার পর তাহাদের দৃষ্টিশক্তির উপরও বিশেষ জোর চাপ পড়ে; সেজন্য উহারও অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির এই আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিজনক ব্যাপার।

বস্ত্র-সমস্যা

বস্ত্র-সমস্যা পূরণের চারিটী পাদ। তূলা-সংগ্রহ, চরকায় সূতা কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, আর খাদি পরা। বৈশাখ মাসে নূতন বৎসর নূতন আশার কথা লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তূলার বীজ বপনের এই ত সময়। বাঙালী গৃহস্থ, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই অনুরোধ করিতেছি যেন বৈশাখ মাসটি বৃথা না যায়। যাঁহার যে প্রকার জমি আছে, সেই হিসাবে তিনি যেন এবার তূলার বীজ বপন করেন। রৌদ্রতপ্ত বৈশাখ মাসে কেহ কেহ জলদান করেন। যিনি সমস্ত জগতের মঙ্গলহেতু—তাঁহার উদ্দেশ্যে রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীতে জলবর্ষণ করিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল ইচ্ছাকে নিজের ভিতর অনুভব করিয়া তৃপ্ত হয়েন; বস্ত্রহীনের নগ্নতার খেদ স্মরণ করিয়া, বুভুক্ষুর ক্ষুধা স্মরণ করিয়া, আজ আমি হিন্দু-মুসলমান সকলকে এই বৈশাখ মাসে তূলাবীজবপন-ব্রত পালন করিতে অনুরোধ করিতেছি। অনেকের হয়ত বীজ পাইবার সুবিধা নাই! তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া যোগাড় করিতে বলি। গৃহস্থের পক্ষে গাছ কার্পাস ভাল। আর যাঁহারা চাষ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে বার্ষিক ফসলী জাতের কার্পাস ভাল।

যাঁহাদের সময় আছে, উৎসাহ আছে, তাঁহাদের সকলকেই এই মাসটি তূলাবীজবপন প্রচারে নিজেদের শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতে বলি। স্কুল কলেজের ছেলেদের সেবাব্রতের একটা নিষ্ঠার পরিচয় পুনঃ পুনঃ পাওয়া

* 'ব্যবসা ও বাণিজ্য'—কার্ত্তিক, ১৩৪২

গিয়াছে। এই মাসে তাহাদের সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবকাশ উপস্থিত; ইহার জন্য কোন সঙ্ঘ বা সমিতির আবশ্যক নাই। যে যাহার মত গুটিকতক তুলার বীজ সংগ্রহ করিয়া পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ীতে বীজ দিয়া আসিতে পারেন। ছুটির দিনে যেমন অধিক অবকাশ পাওয়া যায়, তেমনি দূরবর্তী গ্রাম গ্রামান্তরে তুলার বীজ ছড়াইয়া আসিতে পারে। যাহার বাড়ীতে আছে তাহার বাড়ী হইতে বীজ চাহিয়া লওয়া, আর অপর বাড়ীতে তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া বা আবশ্যক হইলে বপন করিয়া দিয়াও সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন। বন্যায় যখন লোকের বাড়ীঘর ভাসিয়া যায়, তখন যেমন অন্য বিচার করিবার অবকাশ থাকে না, কেবল কেমন করিয়া প্লাবনক্লিষ্ট নরনারী ও পশ্বাদির জীবনরক্ষা হইবে ইহাই সকলকার একমাত্র ইচ্ছা হয়, আজকার বৈশাখেও তেমনি অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর অন্নসংস্থাপনকল্পে তুলার গাছ সর্বত্রই জন্মাইবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বলিতে গেলে একপ্রকার বিনা মূল্যেই তুলার বীজ পাওয়া যায়। তুলার গাছও অতি সহজে জন্মে ও বাড়িতে থাকে। এত সহজলব্ধ জিনিষ হইতেই যখন দরিদ্রের বস্ত্র সংস্থান হইতে পারে, তখন সর্ব্বপ্রযত্নে যাহাতে প্রতি বাড়ীর আনাচ কানাচ তুলার গাছে পূর্ণ হয়, তাহা করা উচিত। যাহাদের অবস্থা ভাল তাঁহারাও বেশী করিয়া তুলার গাছ জন্মাইবেন, কেননা তাঁহাদেরই বেশী তুলার আবশ্যক।

বস্ত্র-সমস্যা পূরণের দ্বিতীয় পাদ সুতা কাটা। সুতা কাটিয়া যাঁহারা রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে, কি জিনিষ আমরা এতদিন অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। চট্টগ্রামের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে এবার যাঁহারা গিয়াছিলেন, শুনিয়াছি তাঁহারা সকলে চট্টগ্রামের সুতা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া আসিয়াছেন। চরকার সুতা সে দেশের বাবুদের পকেটে পকেটে নমুনা বলিয়া চলিয়া বেড়ায় না, ব্যবসায়ীর দোকানে গাঁইটে গাঁইটে কারবারী পণ্য হইয়াছে। সমস্ত দেশ যখন চট্টগ্রামের ন্যায় চরকায় বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হইবে, তখনই বস্ত্রসমস্যার দ্বিতীয় পাদ পূরণ হইবে। চরকার মত যন্ত্র নাই। গুটিকতক কাঠ ও এক টুকরো শিকে গড়া যন্ত্রটি ইতিমধ্যেই অসাধ্যসাধন করিবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। যাঁহারা ছয় মাস হইল সুতা কাটায় হাত দিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে ঘণ্টায় দেড় তোলা বা দেড় পয়সা উপার্জ্জন করিবার মত নিপুণতা অর্জ্জন করিয়াছেন। চারি ঘণ্টা খাটিয়া দৈনিক ছয় পয়সা রোজগার। গড়পড়তা দৈনিক এক আনা রোজগারের

হিসাবে ইহা দেড় জনের পুরা রোজগার। যাহারা বেশী রোজগারের কথা ভাবেন, তাঁহারা সমষ্টির রোজগারের কথা একেবারে ভুলিয়া যান। চরকা বাড়ীতে বাড়ীতে চলিতে থাকিলে সমষ্টির আয় অনেক বেশী হইবে, এবং সেই পরিমাণে অভাবও কমিবে। বাঁচিয়া থাকার দুই প্রধান এবং আদিম আবশ্যকীয় খাওয়া ও পরার অভাব যাহাদের আছে, ভাবিয়া দেখুন, তাহারা যদি বাড়ীর গাছের তুলায় নিজেরা সূতা কাটিয়া লয়, তবে সে অভাবের কত বড় অংশ পূরণ হয়। যাহাদের অবস্থা এমন যে খাওয়া পরাই চলে না, আর আজ দেশেব অনেকেরই অবস্থা তাহাই, তাহাদের চরকায় খাওয়া পরা দুই অভাবেরই পূরণ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা সাধ্যমত চরকা বিতরণ করিযা দরিদ্রকে ভরণ করুন।

বস্ত্র সমস্যার তৃতীয় পাদ খাদির কাপড় বোনা। তাঁতিরা এই কয় মাসে অনেক কাজ পাইয়াছে। যাহারা বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য অর্জ্জনের পথ ধরিয়াছিল, তাহারা আবার পৈতৃক ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসিতেছে। যাহারা মিহি সূতায় কাপড় করিত, চরকার সূতায় তাহাদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। চরকার সূতায় কাপড় বুনিয়াও তাহারা রোজগার করিতে পারে। গত প্রদর্শনীতে খাদির উপর ঢাকাই পাড দেওয়া শাড়ী দেখা গিয়াছিল। উহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইলেও চাহিদার অভাব ছিল না। বোধ হয় যাহারা ঢাকাই খাদির শাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, ও বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা লাভ ছাড়া লোকসান করেন নাই। একদিকে চরকার সূতার খাদি ত যথেষ্টই বোনা হইতেছে, তাহা ছাড়া টানা পোড়েন দুইই চরকার সূতায় বোনাও দেখা যাইতেছে। অচিরে কেবল চরকার সূতার খাদি প্রচুর পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

বস্ত্র-সমস্যার চতুর্থ পাদ খাদি পরা। খাদিই একমাত্র পরিধেয়, ইহা দেশবাসীকে মানিয়া লইতে হইবে। আপনাদিগের রাজনৈতিক মত যাহাই হউক, রিফর্মে বিশ্বাস করুন, কি অসহযোগে বিশ্বাস করুন, যদি দেশের সন্তান হন তবে খাদি পরিতে হইবে। যাহারা খাদি ব্যবহার এখনও আরম্ভ করেন নাই তাঁহারা বিচার করুন, বিবেচনা করুন, কি খাদি ছাড়া গত্যন্তর নাই। দেশের মঙ্গল, দশের মঙ্গল আমাদের সকলের হাতে। খাদি পরিয়া দরিদ্রের মুখে অন্ন তুলিয়া দিন। খাদি যে মোটা ও পরিতে কষ্ট হয় ইহা কেবল রুচির কথা, সুবিধা অসুবিধার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। অবস্থাপন্ন লোকেরা জুতা পরিয়া

থাকেন, এক জোড়া জুতা ওজন করিয়া দেখিবেন কত হয়। অত্যন্ত সুকুমার দেহাধিকারীও জুতার ওজন বহন করিতে কুণ্ঠিত নহেন! শীতকালে কেহ কেহ যে অলষ্টার নামে বড় কোট ব্যবহার করেন তাহার একটির ওজন কি? কিন্তু অলষ্টারের নীচে ১২০ নম্বর সূতার ধুতি পরা চাই! এখানে ত রুচির কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই আসে না। মেয়েরা কি পরিমাণ গহনার বোঝা বহন করেন! একখানা মিহি শাড়ী যদি ২০ তোলা হয়, সেখানে না হয় একখানা খাদীর শাড়ীর ওজন ৬০ তোলা হইবে। কিন্তু এই ৪০ তোলা ওজন মা লক্ষ্মীরা অনেক সময় কাচ ও কাঞ্চনের ভারে যে সানন্দে বহন করেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। মধ্যবিত্ত ও অবস্থাপন্নের সম্বন্ধে এই কথা। আর যাহার সংসার কষ্টে চলে, সে ত এসব কথার মধ্যেই নাই। খাদি ওজনেও যেমন, টিঁকতেও তেমনি বেশী। আর তাছাড়া যাহা নিজে তৈয়ারী করিতে পারি তাহাই পরিব, এই ত মানুষের মত কথা। হোটেলে ভাল খাবার পাওয়া যায় বলিয়া যে ছেলে মায়ের দেওয়া মোটা ভাত ফেলিয়া হ্যাংলার মত হোটেলওয়ালার কৃপাভিক্ষা করে, তাহারও যে অবস্থা, সূক্ষ্মবস্ত্র না গড়িতে পারিয়া যে দেশের লোক বস্ত্রের জন্য বিদেশের মুখের দিকে তাকায় তাহাদেরও সেই অবস্থা। বিলাতী সূতার কাপড় পরা পাপ, কেননা দেশের দারিদ্র্য বিদেশী সূতার কাপড়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিলাতী সূতার দেশী কাপড়ও যা, বিলাতী কাপড়ও তাহাই। দেশবাসী পাপজ্ঞানে উহা বর্জ্জন করিবেন। উৎসবে ব্যবহার করিতে খাদি, বিবাহের যৌতুকে খাদি ও মৃতের আচ্ছাদনীয় খাদি। খাদি আজ আর রাজনৈতিক মত বিশেষের নিশান নহে, উহা এই বুভুক্ষু ও নগ্নদেশের দারিদ্র্যের স্মারক, উহা মৃতবৎ অসাড় দেহে জীবন সঞ্চারের লক্ষণ। সুখের বিষয় জীবনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। যিনি এই বেদনার বোধ আনিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ, মহাত্মা গান্ধী আজ কারাগারে। অক্লান্ত কর্ম্মী যে কারাগারের নিষ্কর্ম্মা জীবন বহন করিতেছেন, সে কেবল এই আশাতেই যে আমরা খাদি পরিব, খাদির প্রচার করিব। ভগবানের যে মঙ্গল ইচ্ছা, তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যেন অন্তরের সহিত আমরা গ্রহণ করিয়া লই। সহযোগী হই, অসহযোগী হই, খাদি ছাড়া আর কোন পরিধেয় যেন সমাজ স্বীকার না করে!*

---

* বসুমতী—বৈশাখ ১৩২৯

বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল

পররাজ্যলোভী শত্রু যখন বাংলার সীমান্তে, দুর্ভিক্ষে দুর্য্যোগে যখন সমস্ত দেশ উৎপীড়িত, নানা সঙ্কটময় জীবন সমস্যায় যখন দেশের জনসাধারণ উদ্ব্যস্ত ঠিক সেই চরম সময়ে বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল আইন সভায় নূতন এক মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল উপস্থিত করেছেন। এই প্রস্তাবিত বিলের যথারীতি ও যথাযোগ্য বিচারালোচনার সুযোগ দিতে তাঁরা অনিচ্ছুক; প্রত্যেক বিশিষ্ট আইন প্রবর্ত্তিত হবার আগে সিলেক্ট কমিটিতে আলোচিত ও বিচারিত হবার যে সাধারণ রীতি প্রচলিত আছে, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল এই ব্যাপারে তা পালন করছেন না। সরাসরি বিলটিকে সংখ্যাধিক্যের জোরে আইনসভায় পাশ করিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র তাকে বিধিবদ্ধ করে নিতে পারলেই যেন তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে মনে হচ্ছে; ১৯৪০-এ এক মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের প্রস্তাব আইন সভায় উপস্থিত করা হয়েছিল; সেই শিক্ষাবিরোধী, প্রগতি বিরোধী প্রস্তাব দেশে যে ক্ষুব্ধ আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল তা এখনও সকলের স্মৃতিতে জাগরূক। সেই ক্ষোভ ও বিরোধের ফলেই গভর্ণমেণ্ট তখনকার মত প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৪১ এ বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল নবগঠিত হয়, এবং এক বৎসরের মধ্যেই তাঁরা সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সকল মতামতের দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৪২-এ একটি সুচিন্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব প্রণয়ন করেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় সেই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হতে পারে নি। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল শাসনভার হাতে নিয়েই ১৯৪২-এর প্রস্তাবটি নূতন একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ ক'রে তাকে নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এই সিলেক্ট কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যেরা আইনগত আপত্তি উত্থাপন করে বলেন—১৯৪২-এর প্রস্তাবিত বিলের মূলগত আদর্শ স্বীকার করে না নিলে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের সেই বিলের প্রস্তাব উত্থাপন ও বিধিবদ্ধ করবার কোনও অধিকার নেই। তারই ফলে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল ১৯৪৪-এর এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, এবং জনসাধারণকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই প্রস্তাব যথার্থতঃ ১৯৪২-এরই পুরানো প্রস্তাব, শুধু একটু-আধটু অদল-বদল করা হয়েছে মাত্র। অথচ, সত্য বলতে গেলে পুরাতন প্রস্তাবের সঙ্গে নূতন প্রস্তাবের আদর্শগত কোথাও কোন মিল নেই। তা ছাড়া গঠন এবং নিয়ন্ত্রণের দিক

থেকে নূতন প্রস্তাবে এত রদবদল করা হয়েছে যে, এই প্রস্তাব ১৯৪০-এর প্রস্তাবের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর, শিক্ষাবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। এ-প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হলে শুধু যে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে, তা-ই নয়, বাঙলার জাতীয় জীবনের মূল শিথিল হয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কা এতটুকু অমূলক নয়।

১। প্রস্তাবিত শিক্ষা বোর্ডের গঠন এবং কর্ম্মসমিতি

উপরোক্ত মন্তব্য প্রমাণের জন্য প্রস্তাবিত আইনে সকল ধারার বিচারের প্রয়োজন নেই। প্রস্তাবটির সবচেয়ে প্রধান প্রগতিবিরোধী উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাকে একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো, এবং সর্ব্বতোভাবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সূত্রে একে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। সুবিখ্যাত স্যাড্‌লার কমিশন সাম্প্রদায়িক ঐক্যগত যুক্তনির্ব্বাচনের ভিত্তিতে বাঙলার শিক্ষাসৌধ গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন; সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব সেই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল। ১৯৪২-এর প্রস্তাবিত আইন স্যাড্‌লার কমিশনের পরিকল্পনাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই পরিকল্পনার ভেতর সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের যেটুকু ব্যবস্থা ছিল, তার বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি জনসাধারণের পক্ষ থেকে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির চরম পরিণতি সূর্য্যালোকের মত সুস্পষ্ট। বোর্ড ও কর্ম্মসমিতির গঠন বিশ্লেষণ করিলেই তা ধরা পড়ে। দুয়েরই সভ্যনির্ব্বাচনের ভিত্তি একান্তই সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি পৃথক পৃথক সম্প্রদায় পৃথক পৃথকভাবে তাদের নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবেন; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন সভা থেকে যে-সব প্রতিনিধি শিক্ষা বোর্ড ও কর্ম্মসমিতি গঠন করবেন তারাও এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই নির্ব্বাচিত হবেন। শুধু এইখানেই শেষ নয়। বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী, যাদের হাতে বাংলার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ ন্যস্ত, তাঁদের প্রতিনিধিরাও নির্ব্বাচিত হবেন একই আদর্শ ও পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুসলমান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবেন, হিন্দুরা করবেন হিন্দু প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। এর চেয়ে প্রগতিবিরোধী, শিক্ষাবিরোধী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী আদর্শ আর কি হতে পারে? কিন্তু সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির প্রসারই এই প্রস্তাবের একমাত্র দোষ নয়। এই প্রস্তাবে

শিক্ষাবুদ্ধিকে ছাপিয়ে উঠেছে রাষ্ট্রবুদ্ধি ও রাষ্ট্রগত স্বার্থবুদ্ধির প্রভাব। বোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সংখ্যা ১৬ জনের জায়গায় করা হয়েছে ৮ জন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ জন ; ঢাকা থেকে ২ জন)। বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধায়ক সভায় প্রতিনিধিত্বের কোনও অধিকারই বর্ত্তমান প্রস্তাবে নেই ; অথচ অন্যদিকে বঙ্গীয় আইন সভার প্রতিনিধিদের সংখ্যা ৭ জন থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০ জন। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ভাইস্-চ্যান্সেলার নিজেদের পদাধিকারের জোরেই কর্মসমিতির সভ্য হতে পারবেন, ১৯৪২-৪৩-এর পরিকল্পনায় এইরূপ প্রস্তাব ছিল। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তা নেই। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি সরাসরি বোর্ডের কর্মসমিতিতে যে তিনজন সভ্য প্রেরণ করতে পারবেন, তাঁদের বোর্ডের সভ্য না হলেও চলবে, এইরূপ সুবিধা এই প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার কৌশল কৌতুকাবহ সন্দেহ নেই।

২। বোর্ডের আত্মকর্তৃত্বের বিলোপ ও সরকারী স্বার্থের প্রসার

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ও তথা বোর্ডের কর্মসমিতিতে আত্মকর্তৃত্বের বিলোপ এবং সরকারী স্বার্থের প্রসারের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রস্তাবিত আইনের কয়েকটি বিশেষ ধারা-উপধারার উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) গোড়াতেই বলা হয়েছে, কোন্‌টা মাধ্যমিক শিক্ষা কোন্‌টা তা নয়, তা নির্দ্ধারণ করার ভার প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। ১৯৪২-এর প্রস্তাবে ছিল, বোর্ডের সম্মতি নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছা করলে কার্য্যকরী শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, বাণিজ্য-শিক্ষা, চিকিৎসা-শিক্ষা, অন্ধমূকবধির-শিক্ষা প্রভৃতি বাদে অন্য যে কোনো প্রকার বিশেষ শিক্ষা-বিধানকে মাধ্যমিক শিক্ষা নয় বলে বিধান দিতে পারবেন, অথবা তেমন বিধান রহিত করতে পারবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অঙ্গীকারও ছিল যে, বোর্ড গঠনের পর তিন বৎসরের বেশী প্রাদেশিক সরকারের হাতে এ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে না। বর্ত্তমান প্রস্তাবে সময়ের সীমা নির্দ্দেশ তো নেই-ই ; তা ছাড়া সমস্ত ক্ষমতাটাই একান্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ; বোর্ডের কোনও পরামর্শ দেবার অধিকারও এ-ব্যাপারে থাকবে না। এ তথ্য অত্যন্ত সহজবোধ্য যে, বোর্ডের হাত থেকে প্রাদেশিক সরকার যদি যখন যেমন খুশী যে কোনও মাধ্যমিক শিক্ষা কেড়ে নেবার ক্ষমতার অধিকারী হন, তাহলে বোর্ড প্রাদেশিক সরকারের হাতে খেলার পুতুল হয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন অধিকারই যে শুধু তার থাকবে না তা' নয়, কতটুকু যে তার কর্তৃত্ব-সীমা, কতটুকু প্রসার, তারও কোনও নিশ্চয়তা থাক্‌বে না।

(খ) বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ, এবং তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধেও ২।৪টি কথা এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য। বোর্ডের এবং কর্মসমিতির কর্ম্মক্ষমতার উৎস হ'চ্ছেন প্রেসিডেণ্ট; তিনিই বোর্ডের ও কর্মসমিতির এবং বিশেষ বিশেষ কর্মে নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত সমিতির নির্দ্ধারণগুলি কর্ম্মে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। সুতরাং, তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে, তিনি সমস্ত রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি এবং অন্যান্য শিক্ষাবহির্ভূত প্রভাবের উর্ধ্বে অবস্থিত থাকবেন ১৯৪২-এর প্রস্তাবে সেইজন্যেই বলা হয়েছিল যে, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন ও নিয়োগ করবেন প্রাদেশিক সরকার; কিন্তু তার আগে শিক্ষামন্ত্রী, ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ভাইস্-চ্যান্সেলার এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি, এই চারজনকে নিয়ে একটি নির্ব্বাচন সভা গঠিত হবে; এই সভা তিনজন প্রার্থীর নাম নির্ব্বাচন করবেন, এবং প্রাদেশিক সরকারকে প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচন ও নিয়োগ করতে হ'বে এই তিনজনের একজনকে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এসব কিছুই নেই; প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন ও নিয়োগের ক্ষমতা সরাসরি প্রাদেশিক সরকারের হাতেই একান্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে। তার ফল এই হ'তে বাধ্য যে প্রেসিডেণ্ট্ একান্তভাবে প্রাদেশিক সরকারের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে পড়বেন; প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছা ও আদেশ পালন করাই হ'বে তাঁর নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত হ'বার প্রধান উপায় ও অবলম্বন। নির্ব্বাচন ও নিয়োগের পরও তাঁকে সরকারের ইচ্ছা ও আদেশানুগামী হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না, কারণ তা' নইলে তাঁর পুনর্নিয়োগেরও কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। প্রেসিডেণ্টের অস্থায়ী অনুপস্থিতিতে বোর্ডের কোনও সভ্য প্রেসিডেণ্টের স্থলাভিষিক্ত হ'তে যা'তে না পারেন তার জন্য ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের পদটি একেবারে তুলেই দেওয়া হ'য়েছে।

(গ) বোর্ড-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সভ্য নির্ব্বাচন ও নিয়োগের ক্ষমতাও সরাসরি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে; বিশেষজ্ঞ নির্বাচনের ক্ষমতাও কমিটিগুলির হাতে রাখা হয়নি। ১৯৪২-এর প্রস্তাবে, প্রাদেশিক সরকার নিয়োজিত জেলা জজের সমপদস্থ একজন বিচার বিভাগীয় কর্মচারী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত একজন সিণ্ডিকেট সভ্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত একজন কর্ম্মসমিতির সভ্য এই তিনজনকে নিয়ে একটি ট্রাইবুন্যাল

গঠনের অঙ্গীকার ছিল। বোর্ড, কর্ম-সমিতি এবং বোর্ড-সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলির নির্বাচন ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার বাদবিতণ্ডায় মীমাংসার ভার এই ট্রাইবুনালের উপর ন্যস্ত করবার প্রস্তাব করা হ'য়েছিল। বর্ত্তমান প্রস্তাবিত আইনে এই ট্রাইব্যুনালের কোন স্থান নেই। নির্বাচন-নিয়োগ সম্পর্কিত বাদবিতণ্ডার একমাত্র মীমাংসক হ'বেন জেলা জজের সমপদস্থ একজন বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারী, এবং তাঁকে নিযুক্ত করবেন প্রাদেশিক সরকার। ১৯৪২-এর প্রস্তাবে বলা হ'য়েছিল, মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থভাণ্ডার ও হিসাবপত্র সম্বন্ধে কারু কিছু বল্‌বার থাকলে প্রাদেশিক সরকার-নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী তিনি হিসাব পরীক্ষকদের নিকট তাঁর বক্তব্য ও আপত্তি উপস্থিত করতে পারবেন। বর্ত্তমান ১৯৪৪-এর প্রস্তাব থেকে এই অঙ্গীকার তুলে দেওয়া হ'য়েছে।

এইভাবে নানা উপায়ে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের একান্ত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রবুদ্ধি, শিক্ষাবুদ্ধি ও শিক্ষার প্রয়োজনকে আচ্ছন্ন করেছে; এবং তার ফলে, তাঁদের প্রস্তাবিত আইনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অনেক বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করা হ'য়েছে, যার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে সরকার যে কোনও ক্ষেত্রে হস্তার্পণ ক'রে বাধা ও বিরোধের সৃষ্টি করতে পারবেন।

(ঘ) অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারেও এই প্রস্তাবিত আইনে গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ পরিবর্ত্তন করা হ'য়েছে যা শিক্ষাস্বার্থবিরোধী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এইসব পরিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষণীয় নয়; কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখ্‌লে এদের ব্যাপক ও গভীর উদ্দেশ্য ধরা পড়তে বিলম্ব হয় না। নূতন বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির ধারাটি অপরিবর্ত্তিতই র'য়ে গেছে; কিন্তু হঠাৎ স্বীকৃতি তুলে নেবার সম্পর্কে যে সব নিষেধ-বিধান ছিল সেগুলি একেবারে তুলে দেওয়া হ'য়েছে। এর অর্থ সুস্পষ্ট; বোড ইচ্ছা করলেই যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর না দিয়ে যে কোন বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি তুলে' নিতে পারবেন। ১৯৪২-এর প্রস্তাবে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমপর্যায়স্থ বলে স্বীকৃত যে কোনো পরীক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গ্রহণ করতে পারবেন, পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন ও প্রকাশ করতে পারবেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত যে সব কাজে বর্ত্তমানে রত আছেন সে সমস্তই বোর্ড নির্বাহ করতে পারবেন। সেই জন্যই প্রস্তাব করা হ'য়েছিল, এর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করবেন, তা' প্রাদেশিক সরকারকে পূরণ করে দিতে হবে। বর্ত্তমান প্রস্তাবিত আইন এ-সম্বন্ধে একেবারে

নীরব, যদিও প্রায় নিশ্চিত যে বোর্ড উপরোক্ত রূপ পরীক্ষা গ্রহণ করবেন; তা'ছাড়া, বোর্ড যে পরীক্ষামান নির্দ্দেশ করবেন তা' বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের সমপর্যায়স্থ কিনা তা' নির্দ্ধারণ ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধিকারের উল্লেখও এই প্রস্তাবে নেই।

৩। সাধারণ কয়েকটি কথা

আর বিশ্লেষণ করে লাভ নেই। প্রগতি-বিরোধী, শিক্ষাবিরোধী প্রস্তাবিত আইনের বিরোধীতা স্যাডলার কমিশন অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসিত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন প্রস্তাবের বিরোধিতা নয়—একথা সুস্পষ্ট করে জানাবার প্রয়োজন আছে। সুগঠিত, স্বায়ত্তশাসিত, যথার্থ শিক্ষার প্রগতি ও প্রসারকামী একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড জনসাধারণের সহায়তায় দেশের শিক্ষাকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে, প্রসারের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ বিশ্বাসের অবকাশ আছে। কিন্তু যে প্রস্তাবের মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি, রাষ্ট্রস্বার্থবুদ্ধি, সে-প্রস্তাব শিক্ষাস্বার্থের অনুকূল কিছুতেই হ'তে পারে না—সে প্রস্তাব শিক্ষাবিরোধী, জাতীয়তা বিরোধী হ'তে বাধ্য। প্রস্তাব-প্রণয়ন কর্তারা যদি মুসলমানের জন্য বিশেষ ধরণের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান, সে-শিক্ষার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত এখনও বিদ্যমান—একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে এম, এ, স্তর পর্য্যন্ত। যে-সব হিন্দুরা ধর্মশিক্ষার জন্য পৃথক সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কামনা করেন তাঁদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু তা হলেই দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান একান্তভাবে সাম্প্রদায়িকভাবে গড়ে উঠবে, বস্তু ও পার্থিবশিক্ষাকে অগ্রাহ্য করবে, এ-যুক্তি আজ বিংশ শতাব্দীতে কিছুতেই স্বীকার করা চলতে পারে না। এই আদর্শ স্বীকৃত হ'লে সাম্প্রদায়িক মিলন ও জাতীয় ঐক্যের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, যে আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছি তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে আর এক সম্প্রদায়ও নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'বে, এতো খুবই স্বাভাবিক; এবং তার ফলে ঐক্য স্বার্থবোধ চিরকালের জন্য নষ্ট হ'য়ে যাবে, দেশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষে ছেয়ে যাবে, এবং সাম্প্রদায়িক কলহ দিন দিন উগ্রতর হ'য়ে দেখা দেবে। শত শত লোকের ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কর্ম, অর্থ ও সেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে-সৌধ বাংলাদেশ আজ গড়ে তুলেছে, যা' নিয়ে আজ বাঙলার এবং বাঙালীর গর্ব, ক্ষমতার দর্পে এবং সংখ্যাধিক্যের জোরে বর্ত্তমান প্রগতি-বিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী মন্ত্রিমণ্ডল আজ তা' মাটির ধূলায়

লুটিয়ে দিতে চাইছেন। যথার্থতঃ বল্‌তে গেলে প্রস্তাবিত বিল মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের মূল অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হ'য়েছে, আমাদের জাতির আশা ও আদর্শের মূলোচ্ছেদ করবার উপক্রম করেছে। তা' ছাড়া, যে সরকার এ পর্য্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধাই সৃষ্টি করেছেন বেশী, যাঁরা এতটুকু আনুকূল্য কখনও দেখান নি, সেই সরকারের হাতেই এত বড় ক্ষমতা কেন্দ্রীকৃত করবার চেষ্টাকে দেশবাসী কিছুতেই সন্দেহের চক্ষে না দেখে পারে না। একথা কেউ বলে না যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নির্দোষ; এর সংস্কারও বর্তমান জাতীয় আদর্শানুযায়ী পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনগ্রাহ্য; কিন্তু প্রস্তাবিত বিল সংস্কার ও পুনর্গঠন দূরে থাক্, যে-সব সুযোগ সুবিধা এখন বর্তমান যে জাতীয় আদর্শ এখনও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় তার মূল একেবারে বিনষ্ট করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে। এর চেয়ে আত্মঘাতী প্রস্তাব আর কি হ'তে পারে?

দেশের পূর্বসীমায় যখন পররাজ্যলোভীর আক্রমণ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দেশ যখন পর্য্যুদস্ত, দুর্ভিক্ষে যখন জনসাধারণ পীড়িত, তখন এই সর্বব্যাপী দুর্যোগের সুযোগে এই ধরণের সাম্প্রদায়িক আইনের প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের জোরে 'পাশ' করিয়ে নেবার চেষ্টা যথার্থই দুর্বলতার লক্ষণ—স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, এর পশ্চাতে যথার্থ শক্তির ও আত্মিক বলের সমর্থন নেই। নইলে এমন সময়ে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল এই ধরণের আইন উপস্থিত করবেন কেন, এবং তা নিয়ে এত তাড়াহুড়োই বা করবেন কেন? শিক্ষা সংক্রান্ত এইরূপ মূলগত আদর্শ নিয়ে ছেলেখেলার সময় কি এই? দেশের সবচেয়ে যখন বড় প্রয়োজন দেশরক্ষা, দেশের জনসাধারণকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচানো, গৃহহীন ও বস্ত্রহীনের গৃহ ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, তখন কিনা তাঁরা এনে উপস্থিত করছেন এই ধরণের এক প্রগতিবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী শিক্ষা-আইন, যা' জাতি হিসাবে আমাদের আরো পঙ্গু করতে বাধ্য।

তা'ছাড়া, যুদ্ধের পর দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে পুনর্গঠিত হ'বে তা নিয়ে ভারত সরকারের শিক্ষাবিদ্ কর্মচারীরা এবং দেশের অন্যান্য অনেক মনীষী নানা চিন্তা করছেন, নানা পরিকল্পনা রচনা করছেন। ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা সর্বোচ্চ কর্মচারী জন্ সার্জেণ্ট ইতিমধ্যেই একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রকাশও করেছেন। সেই পরিকল্পনা ভারত সরকার ও দেশের মনীষীদের সমর্থন লাভ করেছে। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় বর্তমান বাংলার সরকারী মন্ত্রীমণ্ডলের যে

পরিকল্পনা এই প্রস্তাবিত আইনে প্রকাশ পেয়েছে, তা সর্বপ্রকারে সার্জেণ্ট পরিকল্পনার প্রগতি ও প্রসারমূলক আদর্শের বিরোধী ও পরিপন্থী।

আমরা এখনও আশা রাখি, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল অবিলম্বে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন, এত তাড়াহুড়ো করে একে বিধিবদ্ধ করতে চেষ্টা করে দেশের শিক্ষার কণ্ঠরোধ করবেন না। যদি এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হয়, তাহলে সমস্ত দেশে যে তুমুল বিপর্য্যয় দেখা দেবে, যে বিদ্বেষ বিষ ছড়িয়ে পড়বে, তার ফল কখনও কল্যাণকর হ'তে পারে না।

জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় *

আমার বয়স ৭৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে : জানিনা দেহকে কে সর্বপ্রথম যষ্টির সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। আমি দেখিতেছি, আমার দেহখানিকেই যথার্থ যষ্টির সহিত তুলনা করা চলে—ইহা পুরানো হইয়া গিয়াছে এবং জরার প্রকোপে হয়ত ঘুণেও ধরিয়াছে, যে কোনও দিন একটা সামান্য কারণেই হয়ত মট করিয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে। এরূপ শরীর লইয়া টাঙ্গাইলের ন্যায় দুরধিগম্য স্থানে ওঠ্ বলিতেই দৌড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে যে শুধু কষ্টকর এবং দুঃসাধ্য, তাহা নহে অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তারপর রোগীর পথ্যের ন্যায় আমার খাবার দাবারের তুক্‌তাক্ এবং গাঁধালের ঝোলের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া উদ্যোক্তাদিগকে অনেক সময় নাজেহাল হইতে হয়, এবং হয়ত এমন ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় যে, তাহাতে আমি নিজেই বড় অপ্রস্তুত বোধ করি।

এই সকল সাতপাঁচ ভাবিয়া এবার টাঙ্গাইলে পূর্ববঙ্গ সম্মিলনীর ব্রহ্মোৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য যখন এই উৎসবের উদ্যোক্তাগণ আমার আযৌবন বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে পুরোভাগে লইয়া আমার আস্তানায় আসিয়া হানা দিলেন, তখন আমি দৃঢ়তার সহিত "না" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছিলাম এবং ইহাও জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, সাঁওতালের

* টাঙ্গাইল পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ—১৯৩৬।

"বুলির" মত এ "না" আর "হাঁ" হইবে না। কিন্তু তখন মনে হয় নাই যে, বাঘের চেয়ে বাঘ-চ্যাসার প্রতাপ এবং প্রভাব এত বেশী! বন্ধু কৃষ্ণকুমারকে এড়াইলাম, কিন্তু তাঁহার জামাতা—সুতরাং আমারও জামাতা—শ্রীমান্ শচীন্দ্রপ্রসাদ ছিনে-জোঁকের মত এমন করিয়া আমার গায়ে লাগিয়া গেল যে, তাহার অনুরোধ রক্ষার জন্য আমি তখন টাঙ্গাইল কেন, কামস্কাটকাতেও যাইতে রাজীনামা লিখিয়া দিয়া অব্যাহতি পাইলাম।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার যাবার সময় হইয়া আসিয়াছে। জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে; একটি চোখ হারাইয়াছি, এই শেষযাত্রামুখে অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান রশ্মিতে আমার এই দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে যে বিষাদের ছবি দেখিতেছি, এবং চারিদিকে দেশব্যাপী যে মর্ম্মভেদী হাহাকার শুনিতেছি, তাহাতে আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। যে ব্যথা এবং দুঃখের আগ্নেয়গিরি আমার প্রাণের মধ্যে হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার জ্বালায় পাগল হইয়া আমি—যে দেশে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"-এর ব্যবস্থা ছিল, সেই দেশে জন্মিয়াও আজ কাশী, কাঞ্চী, কাল মাদ্রাজ, পরশু বাঙ্গালোর, তারপর করাচী, লাহোর, ঢাকা-আত্রাই প্রভৃতি স্থানে এই বয়সে উল্কাপিণ্ডের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এবং দেশের যুবকদিগকে শান্ত সমাহিত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছি।

আমি সারা জীবন রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং গবেষণা লইয়াই কাটাইয়াছি; এ ব্রতের মূলসূত্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান—খাঁটী, নিছক্ ষোল আনা সত্যের অনুসন্ধান এবং তাহার প্রয়োগ;—এখানে পাই পয়সারও ভেজাল চলে না, এবং মিথ্যার সহিত এতটুকু সন্ধি করা যায় না। চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় সত্যস্বরূপের উপাসনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং এই দীর্ঘকাল সেই সত্যস্বরূপের ধ্যান, ধারণা এবং উপাসনাকেই এবং "তস্মিন প্রীতিস্তস্যপ্রিয়কার্য্যসাধনম্চ তদুপাসনমেব"-কেই জীবনের ধ্রুবতারারূপে লক্ষ্য রাখিয়া পথ চলিয়াছি।

লোকে অনুযোগ করিয়া আমাকে বলেন যে সারাজীবন test tube নাড়াচাড়া করিয়াই ত জীবন কাটাইলেন—কিন্তু এই বয়সে আবার খদ্দর, সঙ্কটত্রাণ, দেশী কলকারখানা স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন, এবং বাঙালী ছেলেদের মাথায় ডাঙ্গশ মারিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার বাতিক চাগাইল কেন?

এ কেনর উত্তর দিলেই আমার অত্রকার অভিভাষণের বক্তব্য বলা হইবে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছি, এবং সেই উপলক্ষ্যে কত হাজার হাজার ছাত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, সূর্য্য এবং চন্দ্রগ্রহণ রাহু নামক কোনও রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সূর্য্য এবং চন্দ্রকে গলাধঃকরণের ফলে সংঘটিত হয় না, এবং শেষে মর্ত্ত্যবাসীদের কাঁসর ঘণ্টা, ঝাঁজর এবং খোল করতালের সহযোগে পূজা অর্চ্চনার ফলে রাক্ষসাধিপতি রাহু তৃপ্ত এবং তুষ্ট হইয়া কবলিত চন্দ্রসূর্য্যকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি সংঘটিত হয় না। এই যে সকল জনশ্রুতি, ইহা নিছক মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত।

পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য্য আপন আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রাম্যমান অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্র অথবা সূর্য্যের উপর পড়িলেই উহার অংশবিশেষ ছায়ায় ঢাকা পড়ে এবং যে পরিমাণ ঢাকা পড়ে, তাহাই আংশিক বা পূর্ণগ্রহণরূপে পৃথিবীতে দেখা যায়। ইহাই চন্দ্র এবং সূর্য্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,—ইহাদের মধ্যে রাহুর আক্রমণ এবং তাহার মুখগহ্বর হইতে চন্দ্রসূর্য্যের নিষ্কৃতি ও মুক্তির যে মিথ্যা এবং কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা আগাগোড়াই ঝুঠা।

আজ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ছাত্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া আসিলাম, তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মানিয়া লইল ; কিন্তু গ্রহণের দিন যেই ঘরে ঘরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং খোল করতাল সহযোগে দলে দলে কীর্ত্তনীয়ারা রাস্তায় মিছিল বাহির করে, অমনি এই সকল সত্যের পূজারীরাও সকল শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়া দলে ভিড়িতে আরম্ভ করে, এবং ঘরে অশৌচান্তের মত হাঁড়িকুঁড়ি ফেলার ধুম লাগিয়া যায়।

সেই হইতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাবের ঘরে এত লুকোচুরি চলে, তাহাদের মুক্তি সুদূরপরাহত। আমি অশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর লোকদের কথা বলিতেছি না ; কারণ জনশ্রুতি, দেশাচার এবং লোকাচারই তাহাদের নিকট ধর্ম—যুক্তির দ্বারা সত্যমিথ্যা বাছিয়া অথবা বিচার করিয়া লইবার মত শিক্ষা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্য কি তাহা জানে এবং বোঝে, কিন্তু জীবনে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে,—মনের গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের নিকট লজ্জায় মস্তক অনবত করিতেছে,—অথচ বাহিরে জনসমাজে এবং সভার মাঝারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই—সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকট সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

এক শতাব্দীরও পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম সত্যের পূজা প্রবর্ত্তন করেন। সে কি অন্ধকার যুগের তিমির রাত্রি আমরা দেখিয়াছি। ধর্মের নামে রোরুদ্যমান জননীর বক্ষ হইতে নবজাত শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া পিতাই নিজ ঔরসজাত পুত্রকে সমুদ্রগর্ভে হাঙ্গরের মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে কালী মন্দির স্থাপন করিয়া কোনো হতভাগ্য পরিবারের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়া ধর্মের নামে নরবলি দিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিলাম ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে! স্বামীর জলন্ত চিতায় স্ত্রীকে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া লইয়া, বাঁশ চাপা দিয়া, জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়া ভাবিতেছে ইহাই সতীধর্ম পালনের পারাকাষ্ঠা হইল! গুরুবাদ, কর্ত্তাভজা এবং বামাচারাদি বহু দুর্নীতি-মূলক অনুষ্ঠানের প্রচলন করিয়া গার্হস্থ্য এবং সামাজিক জীবনে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া ধর্মের নামে সমাজে জীবন্ত নরকের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিতেছে।

সেই তিমির রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া যে মহাপুরুষ এদেশে এক নব উষার নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই প্রচারিত ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া সেই নবযুগের বার্ত্তাবাহী মহর্ষি রাজা রামমোহন রায়কে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি, যাঁহার বাণীকে কবি তাঁহার অমর কণ্ঠে ভাষা দিয়া গাহিয়াছেন—

মোরা সত্যের পরে মন, আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা পুজিব সত্য, বুঝিব সত্য, খুঁজিব সত্য ধন,
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাহি ভয় নাহি ভয়,
জয় জয় সত্যের জয়॥

মহাত্মা রাজা রামমোহন বাঙলার সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, দেশাচার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করলেন, এবং তাহার ফলেই এ দেশ সর্ব্বপ্রথম মুক্তির আস্বাদ পাইল। রামমোহনই

সর্ব্বপ্রথম এ দেশের বুকের উপর হইতে দেশাচার এবং লোকাচারের জগদ্দল পাথর ঠেলিয়া ফেলিলেন, এবং মৃতপ্রায় জাতিকে অমৃতের বাণী শুনাইলেন। তারপর Pilgrim Father-দিগের ন্যায় কত মনীষী এবং কত মহাপুরুষ রামমোহনের পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বজ্রনির্ঘোষে সত্যের বাণীসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতাধ্যুষিত দেশে, ষষ্ঠী, মাকাল, ঘেঁটু ও মনসা পূজায় মগ্ন, মরণোন্মুখ জাতি, সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠ হইতে ঋষি-যুগের প্রচারিত উপনিষদের সেই অমরবাণী শুনিয়া স্তম্ভিত হইল—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥'

রূপবিবর্জ্জিত অরূপকে যাহারা আপনাপন কল্পনানুযায়ী রূপ না দিলে দেখিতেই পাইত না, এবং ভূমা অসীমকে যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না করিতে পারিলে সেই বিরাট অনাদি পুরুষের সত্তাই উপলব্ধি করিতে পারিত না, তাহারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মপূজার বাণী শ্রবণ করিল—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

তাহারা মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় শুনিল সাধু ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মপূজকগণ উদ্গতচিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও! অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও! মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও!

প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর পূর্ব্বেকার বাঙলা দেশের সামাজিক বেষ্টনী এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া নানারূপ দেশাচার এবং অন্ধসংস্কারের বজ্রবাঁধুনীর মধ্যে বদ্ধিত হইয়া যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম,

তখন ব্রাহ্মসমাজের সেই অগ্নিযুগের ক্ষুরধার যুক্তির মুখে পড়িয়া, সকল মিথ্যার আবরণ এবং বজ্রবন্ধন কাটিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আমি যেন এক নবজীবন এবং মুক্তির আস্বাদ পাইলাম। সেই হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকেই আমি আমার জীবনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমি মার্কামারা, তিলকধারী ব্রাহ্ম নই এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমি একটা hidebound, creedbound, লোহার ছাঁচে ঢালা হাত পা বাঁধা dogmatic religion বলিয়া কোনও দিন বুঝি নাই এবং গ্রহণও করি নাই।

জগতের সকল ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর সম্মুখে ইহা বিশ্বজনীন এবং সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের এমন এক বিশাল, বিরাট আদর্শ স্থাপন করিয়াছে যে, ইহার স্বরূপ যতই উপলব্ধি করিতে যা'ই, ততই ইহার বিশালতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে থাকি, এবং এই বিশ্বরূপের চিন্তা করিতে করিতে বিস্মিত ও মুগ্ধ এবং হতবুদ্ধি হইয়া যাই। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম everwakeful, ever-progressive and everexpanding.

মনুষ্যজাতি এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ চিরগতিশীল এবং চিরচলিষ্ণু—সময় এবং জলস্রোতের ন্যায় অবিরাম, অবিশ্রাম গতিতে চলিতেছে,—এই অনন্ত চলার পথে, কত সময় তাহাকে হয়ত পঙ্কিল কর্দ্দমাক্ত বদ্ধজলাশয়ের পাঁকের মধ্যে পড়িয়া চারিদিকে পূতিগন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে হইতেছে; কিন্তু ইহার গতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দুর্ব্বার শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহারই তেজে এবং প্রভাবে সকল বাধা বিঘ্ন কাটিয়া, পথের কাঁটা দলিয়া, মথিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া সে আবার নূতন তেজে নিজের পথ নিজেই কাটিয়া বাহির হয়—জনপদ এবং জগতের কল্যাণকারীরূপে পূজিত ও আদৃত হয়।

মানব জীবনে এবং মনুষ্য সমাজে ব্রাহ্মধর্ম এইরূপ দুর্নিবার শক্তি সঞ্চয়ের এক বিরাট storage battery. এইখানে যদি শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে ইহার গতি আর বিনাশ নাই।

'কালোহ্যয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী,—

পৃথিবী বিশাল এবং বিপুল, কালও অনন্ত। এই অনন্ত পথে চলিতে চলিতে কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত পঙ্কিল আবর্জ্জনা আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু ঐ storage battery-তে যদি শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে মাভৈঃ! মাভৈঃ!!

বিগতভী হইয়া সব বাধা বিঘ্ন দলিত মথিত করিয়া তবে পথ চলিতে পারিবে।

"যদি দেখ পথে ভয়ের সঞ্চার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সেপথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে !"

ভক্ত সাধক মিথ্যা এই গান করেন নাই। মানব জীবনের শত পাপ প্রলোভন এবং দুর্ব্বলতার মধ্যে পড়িয়া যদি কোন দিন হাবুডুবু খাইয়া থাক এবং "সব গেল" "সব গেল" বলিয়া তাহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাহু তুলিয়া যদি সেই রাজার দোহাই দিতে পার, তবে নিশ্চয়ই জেন, ঐ storage battery হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সব পাপ প্রলোভন পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আবার বলি—ব্রাহ্মধর্ম মানব জীবনের এই storage battery.

শৈশবকালে কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মধর্মের পতাকাবাহীদের মুখে এই সকল অগ্নিবাণী শুনিতাম, আর জীবনে নূতন সঙ্কল্প সকল গ্রহণ করিতাম। সেই ছাত্রাবস্থাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির স্থাপনের ফণ্ডে ২০৲ টাকা দিয়াছিলাম। একথা আমার মনে ছিল না; কিন্তু সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের এক বিদুষী কন্যা, শাস্ত্রী শকুন্তলা রাও, এম, এ, বি, লিট, (অক্সন) সেদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, পুরাতন নথী-পত্রাদি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মাণের সাহায্যকারীদের লিষ্টের মধ্যে আমার এবং আমার বন্ধু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নাম দেখিলেন।

আমি এই কথাটির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, সে যুগে ছাত্রদের মধ্যে সত্যানুসন্ধানের এবং সত্যসন্ধী হইবার কি বিপুল আগ্রহ ছিল, আর আজ সেখানে মেসে মেসে গ্রেটা গার্ব্বো, মেরী পিক্‌ফোর্ড, কাননবালা এবং চন্দ্রাবতী প্রভৃতি সিনেমা ষ্টারদের রূপের চর্চ্চা ও ধ্যান ধারণা চলিতেছে, এবং বাকি সময়টুকু ক্রিকেট ও ফুটবলের মাঠে ভিড় জমাইয়া জটলা হইতেছে, আর কার kick কেমন হইল তাহা লইয়া হাতাহাতি মারামারি চলিতেছে।

হায়, আর সে সব Pilgrim Father-দের জ্বলন্ত বাণী শুনিব না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, দার্শনিক নগেন্দ্রনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, পণ্ডিত শিবনাথ আজ তোমরা কোথায়! যে সকল কণ্ঠের বাণী শুনিবার জন্য হাজার হাজার নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ব্রাহ্মমন্দিরে বসিয়া থাকিত—আজ সে সকল কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছে—কেবল তাহার ঝঙ্কার থাকিয়া থাকিয়া মন প্রাণ আলোড়িত করিয়া তুলে। সে সকল কণ্ঠ নীরব হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সেই জ্বলন্ত জাগ্রত বাণী নিভিয়া যায় নাই। মানুষের প্রাণকে তাহা দিকে দিকে এমন ভাবে দোলা দিতেছে যে, একবার

তাহার আঘাত প্রাণে লাগিলে উহাতে যে তরঙ্গ উঠে তাহাতে মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। মহাপুরুষেরা চলিয়া যান, তাঁহাদের কণ্ঠও সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের বাণী মরে না। অমর কবি Tennyson গাহিয়াছেন—

"Our echoes roll from Soul to Soul
And live for ever, and for ever."

মহাপুরুষেরা এই ব্রাহ্মধর্মকে জীবনে এবং জনসমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহার পূজারীদিগকে একত্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজও গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। আজ শতাব্দী হইতে না হইতে সে দীপ কেন হীন এবং নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে চিন্তা করিতে বলি। ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মধর্ম যখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় চারিদিকে তাহার দীপ্তি ও কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিল, তখন বাঙলা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। আজ সে সকল মন্দিরের দরজা খুলিবারই লোক নাই, এবং মন্দিরগুলিও ধ্বংসোন্মুখ! ব্রাহ্মসমাজের লোকদের মধ্যে অনেককে আচারে ব্যবহারে আর ব্রাহ্ম বলিয়া চেনা যায় না বলিয়াই বুঝি তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন।

দার্শনিক এমারসন সত্যই বলিয়াছিলেন—

"An institution is the lengthened shadow of one man. A Man Christ was born and we have Christianity. Fox was born and we have Quakerism. John Wesley was born and we have the Methodists"

ব্রাহ্মসমাজও এখন যেন lengthened shadow of the founders of the Church হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া জগতের একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনের একটা বিরাট ক্ষেত্র রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, এবং মানবজীবনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই রোগ শোক দুঃখ এবং আধিব্যাধি প্রপীড়িত পৃথিবীতেই এক নূতন স্বর্গরাজ্য রচনার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—

"জগতে আমরা করেছি ঘোষণা
ঘুচাব ধরার কলুষ বাসনা
গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।"

তাঁহারা একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছেন; মাত্র মুষ্টিমেয় জন কয়েক

অশীতিপর, বৃদ্ধ শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় এখনও ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছেন। এই স্তিমিতপ্রায় প্রদীপ কয়টির আলোকে ব্রাহ্মসমাজের চারিদিকে যে গভীর অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে তাহারই নিবিড়তা যেন আরও ফুটিয়া উঠিতেছে। তবুও এই সকল অশীতিপর বৃদ্ধের মনে এবং প্রাণে যৌবনের যে তেজ এবং আশা দেখিতে পাই, হায়, হায়! যদি তাহার এক সহস্রাংশও যুবকদের মধ্যে দেখিতে পাইতাম, তবে আমার এই জন্মভূমির মুখশ্রী ফিরিয়া যাইত। আর কি এদেশে কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শিবনাথ প্রভৃতির ন্যায় দেশকাল-লোকাতীত মহামানব সকলের জন্ম হইবে না?

চারিদিক হইতে মাঝে মাঝে একটা রব শুনিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজ এখন তাহার কাজ গুটাইতে পারে, কারণ হিন্দুসমাজ এখন তাহার অনেক মত গ্রহণ করিয়াছে। যদি তাহাই হইত তবে সে কি সুখের দিন হইত! মহাত্মা রামমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতাম—হে নরোত্তম মহামানব! ব্রাহ্মধর্মের জন্য তোমার যথাসর্বস্ব ত্যাগ—শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও ধিক্কার মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া নেওয়া সার্থক হইয়াছে!

ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে যাহারা বলে তাহাদিগকে আজ জিজ্ঞাসা করিতেছি—

১। দেশ হইতে পাপ, দুর্নীতি এবং ব্যভিচার কি দূর হইয়া গিয়াছে?

২। যাহারা পরস্ত্রী অপহারক, মদ্যপ এবং ব্যভিচারী, যাহারা নানা দুষ্ক্রিয়ার দ্বারা সমাজকে কলুষিত এবং দেশের নৈতিক হাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় আমরা কি তাহাদিগকে বর্জন করিয়া সমাজ-দেহকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি? না তাহাদিগকে আবার নৈবেদ্যের সন্দেশের মত সকল সভা-সমিতি এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের মাথায় বসাইয়া মোড়লী করিতে দিয়া মানব-জীবনের উচ্চ আদর্শকে ধূলায় টানিয়া নামাইয়াছি, এবং জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছি।

৩। জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং "বার সেপাহীর তের হাঁড়ী" কি আমাদের মধ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে? সেদিন কোনও Nationalist বা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—Wanted for a non-Sandilya Barendra Brahmin, fair complexioned and educated bride for a double M. Sc. settled in life, young bachelor Srotriya! বিজ্ঞানে double M Sc. পাশ করিয়াও এই young bachelor-এর মন

হইতে জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং শ্রেণীভেদের মোহ কাটে নাই, এবং বিজ্ঞাপন দিয়া bride সংগ্রহের উপরও ঘৃণা জন্মে নাই। বিবাহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমের মূলে পরস্পরের হৃদয় বিনিময়, সে ধারণাও ইহার মনে জাগে নাই। এই আদর্শ কি দেশ গ্রহণ করিয়াছে ?

৪। অস্পৃশ্য এবং জলাচরণীয় জাতিদিগকে এতকাল ধরিয়া আমরা মানব-জীবনের সকল আশা, আনন্দ এবং উত্থানের সুযোগ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে যে পশু করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ এত আন্দোলনের পরেও আমরা কি তাহাদিগকে সকলকে মনে প্রাণে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইবার কোনও আয়োজন করিয়াছি ?

মহাত্মা গান্ধী অতি আক্ষেপেই এক স্থলে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে তিনি যেন অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞাত জাতির ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। যাহাতে তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের প্রাপ্য সকল অবজ্ঞা ও অনাদরের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। মহাত্মার এই অদ্ভুত ইচ্ছার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর সশ্রদ্ধ উক্তির কথা মনে পড়িল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, বোধিসত্ত্বের স্তরে পৌঁছান অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু উহা একেবারে অনধিগম্য নহে। একবার মহাত্মা গান্ধীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।" সত্য সত্যই মানবসেবাই এখন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছে।

৫। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং সমস্ত মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের (Father-hood of God and brother-hood of man) যে মহান্ এবং উচ্চ আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন, এ দেশের লোক কি তাহা গ্রহণ করিয়াছে ?

৬। এদেশে ছত্রিশ রকমের পরস্পরবিরোধী, বিভিন্ন মতাবলম্বী বিবদমান জাতির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ –

"এক দেশ, এক ভগবান
এক জাতি, এক মন প্রাণ"

রূপ যে মহা সাধনার সূচনা করিয়াছেন, ব্রাহ্মেতর সম্প্রদায়সমূহ কি সেই সাধনা গ্রহণ করিয়াছেন ?

৭। মন্দির মসজিদ এবং দেউল নির্মাণ করিয়া ভগবানকে একটা চৌহদ্দীর মধ্যে পুরিয়া মানুষ শুধু সেই জায়গাটাকেই পবিত্র মনে করিত, এবং পাপাচরণের

অতীত করিয়া রাখিত ; কিন্তু তাহার বাহিরে সব জায়গায় শয়তানের লীলা রচনা করিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করিত না। এই অন্ধ বিশ্বাস ভাঙিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন—ভগবানের মন্দির কোনও চৌহদ্দী আঁটা ক্ষুদ্র স্থানে সীমাবদ্ধ নহে—

"সুবিশালমিদং বিশ্বং, পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরম সাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥"

এই বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় সারা পৃথিবীটাই ব্রহ্মের মন্দির ; এবং যাহা শাশ্বত, অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্য তাহাই শাস্ত্র। ব্রহ্ম নাই এমন কোনও স্থান নাই। যদি কোন মন্দিরের মধ্যেই ভগবান থাকেন, এই বিশ্বাসে মন্দিরের মধ্যে কোনও পাপ ও মিথ্যাচরণ করিতে ভীত এবং সঙ্কুচিত হও, তবে সুবিশাল এই পৃথিবীই ত সেই ব্রহ্মমন্দির—এ মন্দির থুথু ফেলিয়া নোংরা করিবে কি করিয়া ? দেশবাসী সকলে ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ কি গ্রহণ করিয়াছে ?

৮। শুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মসমাজ আপন দেহকেই ভাগবানের মন্দির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের মন এই মন্দিরের পূজারী। Temple of God is within you. যে দেহ ভগবানের মন্দির, তাহাকে কেমন করিয়া পাপে মলিন এবং কলঙ্কিত করিবে ? যে মন ভগবানের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিবার জন্য সাধনা করিতেছে, পাপ চিন্তার দ্বারা কেমন করিয়া তাহাকে কলুষিত করিবে ? মানবজীবনেই ভগবানের দেউল গঠন করিয়া তাহাকে সকল মন প্রাণ দিয়া "হৃদা মনীষা মনসাভিঃ ক্লিপ্ত" হইয়া, এই যে এক অভিনব পূজার পদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজ প্রচলিত করিয়াছেন, দেশের লোক ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন এই প্রাণময় পূজা-পদ্ধতি কি গ্রহণ করিয়াছেন ?

৯। সমাজে, সাহিত্য এবং ছায়াচিত্রে প্রতিনিয়ত স্বল্পবসনা নর-নারীদিগের যে সকল লজ্জাকর ছবি বাহির হইতেছে—কাব্যে কবিতায় এবং গল্পে যেরূপ জঘন্য ঘৃণাকরজনক গরলোদ্গারী রচনা বাহির হইতেছে—দেশের সর্ব্বত্র যে দারুণ দুর্নীতির প্লাবন দেখা যাইতেছে—যাহার স্রোতে পড়িয়া মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ, স্মরণীয় এবং বরণীয় আদর্শগুলি একে একে ভাসিয়া যাইতে সুরু হইয়াছে—কই, তাহার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনসমাজ, মণিহারা দলিত ফণীর ন্যায় গভীর গর্জ্জনে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে কি ? দেশের যুবকগণ যৌবনের অমিত তেজ

এবং শক্তি লইয়া কচুরী পানার ন্যায় জনপদ-ধ্বংসকারী এই দূষিত বন্যাপ্রবাহের মুখ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে কি?

১০। সর্ব্বোপরি সমগ্র দেশ কি একেশ্বরবাদী হইয়াছে, এবং পরব্রহ্মকেই একমাত্র উপাস্য এবং আরাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে?

এ সব যদি না হইয়া থাকে, তবে বলি যে, ব্রাহ্মসমাজ তুমি বাঁচিয়া থাক—তোমার কাজ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

তবে হাঁ, দেশের লোক বলিতে পারে যে, তোমরা ত খুব বড় বড় আদর্শের কথা বলিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের শিষ্য সন্তানেরা কে কেমন হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা একবার চাহিয়া দেখ কি? লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া এই সকল অভিযোগ স্বীকার করিতেছি। শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় শেষ জীবনে নিজের গাল নিজে চড়াইতেন, আর বলিতেন—হায়, হায়! আমাদেরই দোষে বুঝি ইহারা আদর্শচ্যুত হইয়া যাইতেছে!

আমার মতে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিমালয় শিখরের ন্যায় উচ্চ এবং মহান। স্মরণাতীত কাল হইতে কোটি কোটি ধর্ম্মপিপাসু নরনারী ঐ সুবর্ণ শিখরে পৌছিবার জন্য হিমালয়ের পাদমূল হইতে পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিয়াছে—কেহ লছমন ঝোলা হইতেই ফিরিয়া আসিযাছে, কেহ বা বদরিকাশ্রম দেখিয়া নামিয়া আসিয়াছে, আবার কেহ কেদার-বদরী পৌছিয়াই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—আবার কোনও ভাগ্যবান,—কাঞ্চনজঙ্ঘার ওই সুবর্ণ শীর্ষকে কিছুতেই লক্ষ্যহারা করে নাই—সে কেবল ঊর্দ্ধলোকেই চাহিয়া আছে, আর ধাপ হইতে ধাপে কেবল উঠিয়াই চলিয়াছে,—তাহার দৃষ্টি, সেই জ্যোতির দিকে অপলক নয়নে নিবদ্ধ হইয়া আছে—দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে কোথাও আর তাহার দৃষ্টি নাই—সে কেবল উঠিয়াই চলিয়াছে—তাহার কাণে কেবল সেই দূরাগত সঙ্গীত বাজিতেছে—

"মোরে ডাকি লয়ে যাও
মুক্ত দ্বারে—তোমারি বিশ্বের সভাতে
মোরে ডাকি লয়ে যাও।
উদয় গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে,
তিমির লয় হ'ল দীপ্তি সাগরে
স্বার্থ হ'তে জাগ,
দৈন্য হ'তে জাগ,

সব জড়তা হ'তে
জাগ জাগরে
সতেজ উন্নত শোভাতে।
মোরে ডাকি ল'য়ে যাও—"

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এত উচ্চ, এত মহান এবং এত বিশাল, যে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ পালন এবং সাধন সকলের পক্ষে হয়ত সহজ এবং সম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া এই যে অবিরাম গতিতে চলা এবং সাধনা, ইহার মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভযাৎ"। সেই অমৃত সাগরের বিন্দুমাত্রও জল যদি আমরা পান করিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা কৃতার্থ হই। আমাদের মধ্যে অনেকেই লছমন্ ঝোলা হইতে ফিরিয়াছে, কিংবা পর্ব্বতারোহণ করার কষ্টকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে নাই বলিয়া হাসিতেছে।—আমি বলি আমরা যাহা পারি নাই, তোমরা আসিয়া তাহা সফল কর।

আদর্শের মধ্যে যদি কোনও গলদ না থাকে—মিথ্যাভাষণ, মিথ্যাচরণ যদি পাপ বলিয়া মনে কর—পরস্ত্রী হরণ, পরদার গমন এবং ব্যাভিচার যদি দূষণীয় বলিয়া মনে হয়—জাতিভেদ এবং বর্ণ বৈষম্য যদি জাতীয় উন্নতির বিষম পরিপন্থী বলিয়া স্বীকার কর—'ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং মধু'—ধর্ম্মই মানব জীবনের একমাত্র মধু, ইহা যদি বিশ্বাস কর—তাহা ছাড়া আরও যে সকল মূল সত্যের উপর (eternal verities) মানবজাতি এবং মনুষ্য সমাজ যুগ যুগান্ত ধরিয়া মহাকালের সকল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই সকল মূল সত্যের উপর যদি সত্য সত্যই আস্থা থাকে, তবে আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—দেশ কি এই সকল আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে?—কিম্বা অনুসরণ করিতেছে? যদি তাহা না করে, তবে বলি যে ব্রাহ্মসমাজ তোমার সম্মুখে বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আর আপনারা যাঁহারা টিট্‌কারী দিতেছেন তাঁহাদের বলি, আমরা যাহা পারি নাই, আপনারা আসিয়া তাহা আপনাদের জীবনে এবং জাতীয় জীবনে সফল করিয়া তুলুন—

"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা
বাঙালীর প্রাণে যত ভালবাসা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান !"

যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কাজ হিন্দুসমাজ অনেক গ্রহণ করিয়াছে, এইবার তাহারা পাততাড়ী গুটাইতে পারে, তাঁহাদিগকে বলি যে, তাঁহাদিগের একেবারে দৃষ্টিভ্রম এবং মতিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।

তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সেমিজ, সায়া এবং কোঁচাইয়া সাড়ী পরা লইয়াছেন সত্য, হারমোনিয়ম সহযোগে মেয়েদের আধুনিক গান গাওয়াও শিখাইতেছেন সত্য—এবং ব্রাহ্মসমাজের উপর আরও এক ধাপ চড়িয়া Oriental dance-এর নামে হিষ্টিরিয়া অথবা মৃগীরোগগ্রস্ত মানুষের ন্যায় হাত পা বেঁকাইয়া একরকম নৃত্য করিতে শিখাইতেছেন—ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের ন্যায় নিজেদের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষাও দিতেছেন, পাশ্চাত্য দেশের অতি আধুনিক মতসমূহও, যেমন Co-education, Birth-control, Nudist Colony স্থাপন ইত্যাদি অবাধে এবং অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রগতিপরায়ণা বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতেছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের যাহা খোসাভুষি,—সে সব, এবং তার চেয়েও অনেক কিছু দূষণীয় এবং ন্যক্কারজনক জিনিস গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু যাহা আসল এবং যাহা না পাইলে কিছুই পাওয়া হইল না, আমি বলিব ইহারা তাহার কণামাত্রও গ্রহণ করেন নাই।

ক্রাইষ্ট তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন—"What doth a man profit, if he gains the whole world but loses his own soul !"

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের "নেতি" "নেতি"র ব্যাখ্যা শুনিয়া দৃপ্ত তেজে বলিয়াছিলেন—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্
কিমহং তেন কুর্য্যাম্"।

যাহা দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা দিয়া আমি কি করিব ?

ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের আবরণ, খোসাভুষি, আঁঠি—ইহার চাল-চলন, পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব—এ সব একেবারেই বাহ্যিক, এ না নিলেও ক্ষতি নাই এবং নিলেও আসল জিনিসের এতটুকুও বাড়ে না। প্রকৃত মানুষ এবং প্রকৃত ব্রাহ্মের বিচার তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাহিরের জলুষের জন্য

নহে—তাঁহার অন্তরাত্মার এবং ভিতরকার মানুষটির সত্য পরিচয়ের উপরেই তাঁহার যথার্থ আদর, অনাদর নির্ভর করে।

ক্রাইষ্ট বলিয়াছেন—"In my Father's Home there is no distinction between a grey and green coat."

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে মনে এবং প্রাণে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, এবং তাহার সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকিলে, বাহিরের এই সকল রূপসজ্জা এবং আবরণ আপনি আপনিই ফুটিয়া উঠে। তখন তাহা আর ধার করা জিনিসের মত অনুকরণ করিয়া পরিতে হয় না।

"বিজ্ঞানঃ সারথির্যস্তু, মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।"

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি, এবং মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনিই সংসার পার, সংসার অতীত, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হন। জ্ঞান, প্রেম এবং ভক্তিকে বনিয়াদ করিয়া, বিশ্বাস, বৈরাগ্য এবং সেবার অনুশীলনের দ্বারা যিনি আপনার জীবনকে পুণ্য এবং পবিত্রতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর বাহিরের পোষাকের দরকার হয় না। আর যাহাদের বাহিরের আবরণই একমাত্র সম্বল, ভিতরে কিছু নাই, তাহাদের পাওয়া ঠিক গেরুয়ার আলখেল্লা পরা বৈরাগীর ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ানোর ন্যায়। বৈরাগ্যের প্রতীক-স্বরূপ যে গেরুয়ার আলখেল্লা পরিয়াছে, তাহার আবার ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরা কেন? এ ঠিক যেন—

"মন না রাঙায়ে কি ভুল করিয়ে
কাপড় রাঙাল যোগী
মন্দির তলে আসন পাতিল
শিলাপূজনের লাগি।
দুর্গম বনে গিরি শিরে,
বহুক্লেশে মরিল সে ফিরে;
কৃচ্ছে তাঁরে নাহি মিলে
বলে দেবে কোন্ অনুরাগী।"

ধর্ম্মের আদর্শ দূরে থাকুক, ব্রাহ্মসমাজের উচ্চাদর্শগুলির মধ্যে যাহা জাতি গঠন এবং মানুষ গড়িবার প্রধান উপাদান তাহাও হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে নাই; যদি করিত তবে আজ Communal Award-এর প্রশ্নই উঠিত না, এবং

Depressed class-এর স্বার্থরক্ষার অজুহাত সৃষ্টি করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে ভাঙ্গন ঢুকাইবার সুযোগও জুটিত না।

আজ মহাত্মা গান্ধী হরিজন আন্দোলনের ঢেউ তুলিয়াছেন, এবং তাহাতে পলিটিক্‌সের রং ধরিয়াছে বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষে হরিজন আন্দোলনের একটা ঢেউ উঠিয়াছে—এই আন্দোলনের মূল উৎস কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক; যেহেতু মুসলমানেরা সংখ্যাধিক্যে এবং অন্যান্য কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব এবং প্রাধান্যলাভ করিতেছে, এবং অবনত সম্প্রদায়ের লোকেরাও হিন্দুদিগের অত্যাচারে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী করিয়া তাহা পাইয়াছে, সুতরাং আর উহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখা চলে না—এইবার মিতালী করার প্রযোজন।

এই উদ্দেশ্যমূলক হরিজন আন্দোলনের সহিত স্বাধীনতার উপাসক আমেরিকান জাতির হরিজন আন্দোলনের একটা উদাহবণ আপনাদিগকে দিতেছি। মানবজাতির মুক্তির সংগ্রামে এবং স্বাধীনতালাভেব প্রচেষ্টার ইতিহাসে ইহার তুলনা নেই।

আজ প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যে গৃহযুদ্ধ (Civil War) হয়, তাহার কথা সকলেই হয় পড়িযাছেন, না হয় শুনিয়াছেন; যুদ্ধটির প্রধান কারণও বোধ হয় অনেকে জানেন। আমেবিকা আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপীযগণ আরব দাসব্যবসাযীদিগের নিকট হইতে আফ্রিকাবাসী কাফ্রীদিগকে গরু ছাগলের মত কিনিয়া আনিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া নিজেদের দেশে আনিত, এবং তাহাদিগের দ্বারা ক্ষেত্রে এবং খনিতে কাজ করাইয়া লইত। গরু-বাছুর যেমন কেনা-বেচা হয়, আফ্রিকা ও আমেবিকাব বাজারে তেমনি এই সকল কাফ্রী নরনারীদিগের কেনা-বেচা চলিত। জর্জ্জিযা, কেরোলিনা, ভার্জ্জিনিয়া প্রভৃতি স্থানের তামাক, তুলা ও ভুটার ক্ষেত্রে চামড়ার হাণ্টার হাতে লইয়া এই সকল দাসব্যবসায়ীরা ঠিক গরু-ঘোড়ার ন্যায় চাবকাইয়া ইহাদিগকে উদয়াস্ত খাটাইয়া লইত। এই সকল ক্রীতদাস-দাসীর জীবন কাহিনী মিসেস ষ্টো (Mrs. Henry Bucher Stowe) তাঁহার Uncle Tom's Cabin-নামক গ্রন্থে হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এই যুগান্তকারী গ্রন্থ পাঠ করিয়া মানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী ইংলণ্ড এবং আমেরিকার নরনারীদের প্রাণে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাহারা বুঝিল Fatherhood of God and Brotherhood of Man, ক্রাইষ্টের এই যে অমর বাণী ইহা তাহারা তাহাদিগের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানবজীবনে এবং জগতে ব্যর্থ করিয়া

দিতেছে। "সকল মানবই এক বিধাতার সন্তান এবং এক অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ" এই স্থূল সত্য স্বীকার করিলে তাহাকে কেমন করিয়া গরু ঘোড়ার মত চাবকাইয়া দলিয়া পিষিয়া নীচে ফেলিয়া রাখিব। আমেরিকাবাসীদের অনেকের মনে কে যেন ধাক্কা দিয়া বলিতে লাগিল, দাসত্ব প্রথা অন্যায় এবং অধর্ম্ম—ইহাকে তুলিয়া দাও।

আমেরিকারও তাহাই হইল। যাহাদের প্রাণ ছিল, তাহারা এই বাণী শুনিয়া দাসত্ব-প্রথা উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল; কিন্তু অপর দিকে, এই ব্যবসা হইতে যাহাদের প্রচুর লাভ হইত, এবং বিনাব্যয়ে যাহাদের বিরাট কৃষিক্ষেত্র সমূহের চাষবাস হইত, তাহারা নিজেদের সমূহ স্বার্থহানির ভয়ে ঘোরতর আপত্তি তুলিল। সমস্ত দেশে এই বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল; দেশে দুই দল হইল; একদল দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবেই, অপর দল প্রথা বজায় রাখিবেই— শেষে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল, এবং চারি বৎসর কাল ধরিয়া এই civil war চলিল। পৃথিবীতে এমন ভীষণ গৃহযুদ্ধ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। ৪০ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে যোগদান করে, এবং আমেরিকায় প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একজন বা দুইজন লোক এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। বহু লক্ষ লোক এই যুদ্ধে হতাহত হয়। শেষে ধর্ম্মেরই জয় হইল। আমেরিকা হইতে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গেল। যাহারা এই দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছিল, সমগ্র জাতি তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য নিজেদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া অকাতরে অর্থদান করিয়া তাহাদিগকে আর্থিক সঙ্কট হইতে রক্ষা করিল।

কথাটা আপনাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। জগতে যত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূলে হয় রাজ্যলোভ, না হয় স্বার্থসিদ্ধি, আর না হয় "সম্রাট" হইবার দুর্ব্বার অহঙ্কার ও আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান আছে দেখা যায়। কিন্তু এই American Civil War-এর কারণ কি-না কতকগুলি নিকষ-কালো কাফ্রী ক্রীতদাসের দাসত্ব মোচন, এবং মানব মাত্রেই যে সর্ব্বপ্রকার মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের অধিকারী এই আদর্শের প্রচার। দাসত্ব-প্রথা নীতিবিগর্হিত, মানুষ হইয়া মানুষকে দলিয়া পিষিয়া চিরকাল পশুর পর্য্যায়ে অবনমিত এবং অবজ্ঞাত করিয়া রাখা মহাপাপ। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি এ অন্যায়, এ অধর্ম্ম, এ পাপ দেশ হইতে দূর করিতেই হইবে। American Civil War-এর ইহাই মূল কারণ। ইহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোনও রকমের

স্বার্থসিদ্ধির ভাব ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান হরিজন আন্দোলনে এই প্রচ্ছন্ন ভাবটাই নানা দিক দিয়া নানা আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গান্ধীজীর জন্মেরও বহুপূর্ব্বে, শতবৎসর আগে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজ এ দেশের অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত এবং অবনত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টানিয়া তুলিয়া মানুষ করিবার জন্য, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজ হিন্দুসমাজ হরিজন আন্দোলনে যেরূপ সাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এক শতাব্দী না হউক, অন্ততঃ ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও যদি ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন, তবে আজ Communal award-এর প্রশ্নই উঠিত না, এবং দেশেরও আজ এই দুরবস্থা হইত না।

আজ হিন্দুসমাজ পৌর এবং রাষ্ট্র সভায় নারীকে সমান অধিকার দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, এবং বিগত গান্ধী আন্দোলনে হাজার হাজার নারী পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছায় কারাবরণ এবং নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ দেশের সর্ব্বত্র এই বাণী প্রচার করিয়াছেন—

"নরনারী সকলের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাই জাত বিচার।"

হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শের বিরুদ্ধেও প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছেন। তাহা না হইলে এই একশত বৎসরে নারীজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ নূতন রূপ গ্রহণ করিত।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের জুবিলী উপলক্ষ্যে আমি যখন প্রথম টাঙ্গাইলে আসি, তখন আমার নিকট মাইঠ্যাল এবং মালী সম্প্রদায়ের একদল লোক আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিল যে, তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইলেও হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। দেশের ধোপা নাপিতরা, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টানের কাপড় কাচে এবং ক্ষৌর কার্য্য করে, তাতে হিন্দু সমাজের কোন আপত্তি হয় না; কিন্তু আমরা হিন্দুদের নিকট এমনই অস্পৃশ্য যে, আমাদিগের ধোপা নাপিত সবই বন্ধ। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে অভিযোগ শুনিয়া গিয়াছিলাম, আজ বিশ বৎসর পরেও সেই অভিযোগের কারণ একেবারে দূর ত হয়ই নি, আংশিক দূর হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক পরলোকগত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়

একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি তাঁহার উক্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে যশোহর খুলনার একশ্রেণীর হিন্দুর উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ঐ দুই জেলার লোক "মেঘো কায়েৎ" এবং "মেঘো বামুন" বলিয়া পরিচয় দেয়। এই শ্রেণীর হিন্দুরা মগদুষ্ট এবং মগপরিবাদগ্রস্ত বলিয়াই উহাদিগকে ঐরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

মোগল রাজত্বের অবসান এবং ইংরাজ প্রভুত্বের অভ্যাদয় কালে সমগ্র দেশ অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় মগেরা বড় বড় ছিপে করিয়া জোয়ারের মুখে নিম্ন বঙ্গের নদী দিয়া গ্রামে ঢুকিয়া গ্রামবাসীদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া যাইত, এবং মেয়েদের উপরেও নানারূপ অত্যাচার করিত। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা পলাইতে পারিত না কিংবা পলাইতে গিয়া ধরা পড়িত, তাহাদের উপর মগেরা নানারূপ অত্যাচার করিত। তারপর মগেরা লুঠতরাজ করিয়া চলিয়া গেলে গ্রামবাসীরা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই সকল মগধর্ষিত এবং মগদুষ্ট পরিবারকে সমাজচ্যুত এবং একঘরে করিত।

যাহারা কাপুরুষের ন্যায় আপন স্ত্রী ও ভগিনীকে দস্যুর কবলে ফেলিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলায়ন করে, এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকেই আবার কলঙ্কের দাগ দিয়া তাড়াইয়া দেয়, সেই সকল নির্লজ্জ কাপুরুষকে গালি দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। যে দেশের ব্রাহ্মণ উপদেষ্টারা জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন,—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি," অর্থাৎ নিজের জান্-প্রাণ সর্ব্বাগ্রে বাঁচাইবে—তা' সে টাকাকড়ি দিয়াই হউক আর তাতে না হইলে ঘরের স্ত্রী দিয়াই হউক—সে দেশের লোকের পক্ষে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করা বাতুলের প্রলাপ নহে কি?—যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দুসমাজ তাহার আপনার লোককে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং ছুতা পাইলেই বর্জ্জন করিতে জানে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইতে পারে না।

জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা সম্বন্ধে গত ৩০ বৎসর ধরিয়া আমি যে বক্তৃতা করিয়াছি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু মনে হয়, সব অরণ্যে রোদন হইয়াছে। কেহ কেহ আবার উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলেন—তাই বলিয়া কি মশাই তিলি তাম্বুলীর সঙ্গে আদান প্রদান করিব নাকি?

উত্তরে আমি বলি, তিলি, তাম্বুলি, সুবর্ণ বণিক ও বৈশ্য সাহা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, চেহারা, শীলতা এবং সংস্কৃতিতে এমন সকল লোক

রহিয়াছেন যাঁহারা, আভিজাত্য গর্ব্বিত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের চেয়ে কোনও অংশে কম নহেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বিখ্যাত দার্শনিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ব্যবহারজীবী ডাক্তার শরচ্চন্দ্র বসাক, রাসায়নিক পণ্ডিত আমার প্রিয় শিষ্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা, একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রস্বরূপ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, সত্যচরণ লাহা, বিমলাচরণ লাহা, প্রভৃতি আপন আপন ক্ষেত্রে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইযা সমগ্র দেশের মুখোজ্জল করেন নাই কি?

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা, প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং
নিষ্ঠা, বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।"

কুলীন কায়স্থদিগের এই যে নয়টি গুণ বর্ণিত হইয়াছে, এং মাপকাঠি দ্বারা তুলনা মূলক বিচারে ইঁহারা বর্ণহিন্দুদিগের অপেক্ষা কিসে কম?

জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদরূপ মহাপাপ যতদিন হিন্দু সমাজকে জর্জ্জরিত করিবে, এবং মানুষে মানুষেব মধ্যে নানারূপ বিধিনিষেধ ও গণ্ডী টানিয়া কেবল দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও ভেদবুদ্ধির বিষ ছড়াইতে থাকিবে, ততদিন এ জাতির মুক্তির আশা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বনা মাত্র।

১৮৬৮ সালে জাপান যখন নব জাগরণের সাড়া পাইয়া মোহনিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিল তখন সর্ব্বপ্রথমেই তাহারা বুঝিল, জাপানেব নিম্ন শ্রেণীস্থ অগণিত নরনারীকে সামুরাই বা ক্ষত্রিয়গণ যে ভাবে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দলিত এবং অবনত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে জাপানের মাথা তুলিবার আর কোনও আশা নাই। যেমন এই সত্য উপলব্ধি করা, অমনি সামুরাইগণ নিজেদের সকল আভিজাত্য গৌরব চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাপানকে ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত এবং উন্নীত করিয়া লইল। জীবন্ত জাতির লক্ষণই এই। যাহা সত্য, মঙ্গল এবং করণীয় তাহা সেই মুহূর্ত্তেই গ্রহণ করিতে হইবে।

জাতিভেদের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥
যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে, আড়ালে ঢাকিছ যারে,
তোমার মঙ্গল ঢাকি, গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

* * *

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করনা নমস্কার!
তবু নত করি আঁখি, দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা, তোরে, সবার সমান ॥'

ভগবানের সত্ত্বা খুঁজিতে যাইয়া বিশ্বকবি তাঁহাকে এই সকল ধূলি-ধূসরিত অবনত জাতির মধ্যে ধূলা কাদা মাখা অবস্থায় দেখিয়া চমকিয়া গিয়াছেন। দীন দুঃখীর উপর অত্যাচারী রাজার কষাঘাত যেমন ভক্তের ভগবানের পৃষ্ঠে রক্তরঞ্জিত চাবুকের রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল, তেমনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের হস্তে অবনত জাতির এই লাঞ্ছনার সহিত ভগবান নিজেকে লাঞ্ছিত মনে করিয়া তাঁহাদের চক্ষুদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন—

"অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে,
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে?
নয়ন মেলে দেখ্‌ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে ॥
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বার মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,

তাঁর মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে।
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
তোর দেবতা নাই ঘরে ॥"

শুনিতে পাই বাঙলার যুবকরা বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই সামাজিক এই সকল দুঃখ দুর্গতি আর থাকিবে না। এইজন্য কত নেতা ও উপনেতা যে যুবকদিগের অপথে কুপথে চালিত করিয়া অকালবোধন করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যাহাদিগের দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনয়ন করিবে, তাহারা কি তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়—না কোনও দিন দিবে, সে আশা করিতে পার? তোমরা যাহারা পূর্ণ স্বরাজ চাও কিংবা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস (Dominion Status)-এর ভিখারী, তোমাদের কথা বা ভাষা এই সকল কোটি কোটি নিরক্ষর, অশিক্ষিত এবং অবনত জাতি কি বুঝিতে পারে?

বিগত সেন্সাসের বিবরণ হইতে জানা যায়, বাঙলা দেশের শতকরা মাত্র ৬ জন লোক ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে, বাকি ৯৪ জন একেবারে অক্ষর জ্ঞানবর্জ্জিত। শতকরা ৬ জন লোক পূর্ণ স্বরাজ এবং Dominion Status-এর পার্থক্য লইয়া মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়া মরিতেছে, আর ৯৪ জন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে— ইহারা বলে কি? ইহাদের ভাষা ত আমরা বুঝি না।

সুতরাং পরলোকগত দেশবন্ধু দাস যখন তাঁহার নন্‌-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী হাঁকিলেন, "Hands off," তখন গভর্ণমেণ্টের মেশিনারী হইতে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র হাত গুটাইল বটে, কিন্তু আর বাকী কোটি কোটি অগণিত লোক, যে যেমন কাজে লাগিয়াছিল, সেইখানে তেমনই লাগিয়া রহিল, কেহ সে ডাকে ভ্রুক্ষেপও করিল না—কারণ সে ডাকে সাড়া দিবার মত শিক্ষা দীক্ষা কি আমরা তাহাদের দিয়াছি—না কোনও দিন তাহাদের সুখে দুঃখে হৃদয় দিয়া মিলিয়া, তাহারা যে আমাদের এবং আমরাও যে তাহাদেরই একজন, এভাব জাগাইয়া তুলিয়াছি?

পাঠ্যাবস্থায় গ্রীস এবং রোমের ইতিহাসে জাতিগঠনের তিনটি প্রধান উপাদানের কথা পড়িয়াছিলাম—

Community of Blood,

Community of Religion and

Community of Interest.

বাঙলার যুবকদিগকে আজ সকল রকম ন্যাকামি ও কপটতা পরিত্যাগ করিয়া এই সত্যের সম্মুখীন হইতে বলিতেছি।

আজ একবার আত্মপরীক্ষা কর। মনকে জিজ্ঞাসা কর—জাতিগঠনের এই সকল উপাদান কি আমাদের মধ্যে আছে? যদি না থাকে তবে এই সকল উপাদান তৈরী করিবার কোনও আয়োজন কি আমরা করিয়াছি?

চোখ মেলিলেই দেখিতে পাই, আজ ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে কন্যা-কুমারী এবং বোম্বাই হইতে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সর্ব্বত্র, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, শুধু দ্বন্দ্ব কোলাহল নহে, রক্তারক্তি, মারামারি এবং কাটাকাটি আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে মুসলমান অভিযান আরম্ভ হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বেও হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘাতের কথা ভারতের প্রতি বৌদ্ধমন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তিতে এবং ভগ্ন দেউলে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আ'ছ। শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মধ্যে ধর্ম্মের আদর্শ এবং ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া মারামারি কাটাকাটির কথা বাঙলার ঘরে ঘরে জনশ্রুতি হইয়া আছে। হাড়ী ডোমের জল খায় না, ডোম মুচির অন্ন ছোঁয় না, মুচি মাইঠ্যালের সঙ্গে উঠা বসা করে না,—আবার কায়স্থ ইহাদের কাহারও ছোঁওয়া অন্ন-পানীয় গ্রহণ করে না, সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণ আবার কায়স্থকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। এমনি করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে মানুষে মানুষের মধ্যে জাতিবৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য এবং বিদ্বেষবুদ্ধিজাত ভেদ ও বিবাদের যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া এক দেশ এবং এক জাতি গঠন করিবার সকল শক্তিই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

বেদের আমল হইতে স্মৃতি ও সংহিতার যুগ পর্য্যন্ত এদেশে মুখ্যতঃ কেবলমাত্র দুইটি জাতির উল্লেখ দেখা যায়—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে একশত জন হিন্দুর মধ্যে মাত্র ৬ জন ব্রাহ্মণ এবং বাকী ৯৪ জন শূদ্র। শতকরা ৯৪ জনকে অন্ধ, খঞ্জ এবং পঙ্গু করিয়া রাখিয়া, মাত্র ৬ জন শিক্ষিত লোকের দ্বারা দেশে স্বরাজ অথবা স্বাধীনতা আনয়নের প্রয়াস যে বাতুলের কল্পনা, তাহা গত কয়েকবারের নিষ্ফল আন্দোলনে ভগবান আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

যুগ প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধারণের সহিত ভারতের

অবনত শ্রেণীর দুর্দ্দশার কথা তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধ প্রাণে এক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন,

—"আমাদের দেশে যদি কারুর নীচকুলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও আশা ভরসা নাই—সে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু?—একি অত্যাচার! আমেরিকায় সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, সুযোগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্ত হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেণ্ট হইবারও আশা রাখে। আর আমাদের দেশে?—Once a cobbler, ever and always a cobbler—মুচির ছেলে ছাপ্পান্ন পুরুষ ধরিয়া মুচিই থাকিবে, তাহার আর কোনও উচ্চ আশা নাই—থাকিতে পারে না। কারণ, এদেশে মুচির ছেলের আর শুচি হইবার উপায় নাই।"

পাঞ্জাবের ভাঙ্গী নামক এক নীচ শ্রেণীর নেতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—

হিন্দু পড়্ হে (১), পোঁথিয়া (২), মুছলমান কোর্'া (৩)
চুড়া (৪) নীচ্ (৫) নীচীয়া (৬) না জিমিন্ (৭) না আছ্ মাঁ (৮)।

হিন্দুর পুঁথি আছে, মুসলমানের কোরাণ আছে, কিন্তু হতভাগ্য চুড়াদের স্বর্গও নাই, মর্ত্ত্যও নাই—তাহারা পৃথিবীতে নীচ এবং অধম জীবন যাপন করিতে আসিয়াছে।

হায় আমরা কি মানুষ?—ঐ যে হাঁড়ী, ডোম, বাগদী, চামার, মালী, মাইঠ্যাল তোমার বাড়ীর আশে পাশে চারিদিকে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে এবং পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, উহাদের উন্নতির জন্য তোমরা এই যুগযুগান্ত ধরিয়া কি ক'রেছ ব'লতে পার? তোমরা তাহাদের ছোঁও না, কাছে আসতে দাও না—দূর দূর কর। জাপানী কুকুরটাকেও আদর করিয়া কোলে পিঠে নিয়া বেড়াও—আর সুশ্রী সবল হৃষ্টপুষ্ট নাদুস্ নুদুস মুচির ছেলেটী যদি ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে তবে জাত গেল, ধর্ম্ম গেল বলিয়া হুঙ্কার দিয়া ওঠ। ওই যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী এবং ত্রিপুণ্ড্রক কাটা উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র, পদদলিত গরীবদের জন্য এ যাবৎ কি ক'রেছেন, বলতে পার? খালি বলছেন, তোরা অন্ত্যজ, আমায় ছুঁসনে, আমায় ছুঁসনে।

---

(১) পড়ে (২) পুঁথি, ধর্ম্মগ্রন্থ (৩) কোরাণ (৪) নীচ জাতি বিশেষ (৫) নীচ (৬) অধম (৭) পৃথিবী (৮) স্বর্গ।

নিরক্ষর কৃষক তাহার খাজনার টাকার রসিদ বা দাখিলাখানি যদি পড়িবার চেষ্টা করিয়াছে, অমনি কাছারীর ফরাসে উপবিষ্ট ভদ্রলোকেরা চারিদিক হইতে টিটকারী দিয়া বলিয়াছেন, এঃ—চাষার পো আবার দাখিলা পড়া শিখেছে!

চামার যদি পেটের জ্বালায় একমুঠা অন্নের জন্য বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা তাহাকে হৃদয়হীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করি নাই সত্য, আমাদের পাতের উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জন তাহাকে দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাহাকে হাজার বার সমঝাইয়া দিয়াছি যে, তুই মুচি, তুই অস্পৃশ্য, এখান হইতে সরিয়া যা,—দূরে বাগানের কাছে গাছতলায় যাইয়া অপেক্ষা কর্; সকলের খাওয়া হ'লে পাত কুড়ানো সব পাবি।

এমনি করিয়া আমরা ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে যুগযুগান্ত ধরিয়া দলিয়া পিষিয়া রাখিয়াছি। আজ তোমার স্বরাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে সাড়া দিবে কে?—আগে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া তবে এই সকল সংস্কারে হাত দিবেন বলিয়া যাঁহারা কোমর বাঁধিতেছেন, তাঁহারা বহুবার আত্মপ্রতারিত হইয়াছেন এবং যতবার এইরূপ ছিন্নমূল গাছের গোড়া না বাঁধিয়া আগায় জল দিয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবেন, ততবারই সব পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে।

আগে মানুষ চাই, তবে ত ঈপ্সিত লাভের জন্য সংগ্রাম করিবার সৈন্য পাইবে। You can't make bricks without clay. মানুষ চাই—মানুষ চাই—Not quantity and number, but quality, শুধু সংখ্যা (Number) হইলেই যদি হইত তবে ত ভারতবর্ষকে আর পায় কে? পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস যে দেশে—যাহার আয়তন একটা মহাদেশের মত—যদি সংখ্যাই ভাগ্য-নিয়ামক হইত, তবে এই বিরাট দেশ এবং বিশাল জাতি কি মুষ্টিমেয় লোকের পদানত হইয়া থাকিত! কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে
হে মুগ্ধ জননি!
রেখেছ বাঙালী ক'রে
মানুষ করনি!"

আমি দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি মানুষ, কি জাতি, কিম্বা কি দেশ, কাহারও মাথা খাড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। দুই এবং দুইয়ে যোগ দিলে চার হইবেই হইবে; উহাকে পাঁচও করা যায় না, তিনও

করা যায় না। করিতে গেলে অঙ্ক মেলে না। জীবনভোর যদি এই মিথ্যা চেষ্টা কর, তবে চেষ্টা ব্যর্থ এবং জীবন বিফল হইয়া যাইবে। মিথ্যার উপর কোনও মহদনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না। আজ যাহারা সত্যাশ্রয়ী হইবার অভিনয় করিতেছে, তাহাদের পলিটিক্যাল চালবাজী এবং চালাকী লোকচক্ষু এবং জনমতের সম্মুখে পদে পদে ধরা পড়িয়া প্রতিহত হইতেছে। আজ চীৎকার করিয়া বলি, তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং বরণ কর। লোকচক্ষুর অন্তরালে নহে, কিম্বা মনের গোপন প্রকোষ্ঠের মধ্যে নহে—জগৎ সভায়, বিশ্বমানবের সম্মুখে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অকুতোভয়ে, বুক ফুলাইয়া, সতেজে, দীপ্ত অনুরাগের সহিত সত্যের জয় গান কর।

আমাদের দেশে "এ্যাও হয়, অও হয় করা", "রামরহিম ভজা" "ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু" নামক যে সকল সুবিধাবাদী আছে, তাহাদের দলপুষ্টি করার জন্য হিতোপদেশে বাল্যকালে এক উদ্ভট কবিতা পড়িয়াছিলাম—

"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, লোকের শ্রুতিসুখকর কথা বলিবে, কিন্তু সত্য কথা যদি লোকের মনোমত বা শ্রুতিসুখকর না হয় তবে তাহা কদাচ বলিবে না।

জাতিকে মিথ্যার পথে প্ররোচিত এবং পরিচালিত করার এরূপ হীন প্রচেষ্টার অভিযান আর কোথাও দেখি নাই। আজ এই হিতোপদেশকে উল্টাইয়া আপনারা দেশের মধ্যে প্রচার করুন—"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ব্রূয়াচ্চ সত্যমপ্রিয়ং"—সত্য কথা বল, হিত কথা বল, এবং সত্য কথা বলিলে যদি লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, তথাপি সেই সত্য কথা বল। যুবকদিগের জনে জনে ডাকিয়া বলুন—মিথ্যার উপর জাতিগঠন করিতে চাও? তা কি কখনও হয়? না জগতের ইতিহাসে কোথাও হইয়াছে? চোরা বালির ভিতের উপর স্বাধীনতার তাজমহল গড়া যায় না।

বাঙলার আশা ভরসাস্থল যুবকগণ! তোমরা আজ কোথায়? জাতিভেদের অত্যাচারে এবং সামাজিক নির্য্যাতনের হাত হইতে অগণিত নরনারীকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক নিষ্পেষণের ফলে যাহারা প্রায় পশু পদবীতে অবনত হইয়াছে, অথচ যাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের হস্ত পদ এবং মেরুদণ্ড তাহাদিগকে তুলিবার জন্য, মূর্খতা ও কুসংস্কারের মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তোমাদের যৌবনের তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাহু কি অগ্রসর হইবে না? এই

অগণিত নরনারী কি চিরকালই এইরূপ হীন ও অবজ্ঞাত জীবন যাপন করিবে? বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক, নব নব আবিষ্কারের কথা, কত আশা আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার বারতা কি তাহাদের নিরানন্দময় অন্ধকার কুটিরে কখনও পৌঁছিবে না? তাহাদের হৃদয়দ্বার কি চিরকালই এমনি রুদ্ধ থাকিবে?

এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কর্ম্মী! কে আছ বীর! উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও। দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে, বাটে, ঘাটে, বাজারে বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে ব্রাহ্মধর্মের এই মৃতসঞ্জীবনী বার্ত্তা লইয়া যাও; আর বল তোমাদের মহানিশার অবসান হইয়াছে।

বল—তোমরাও মানুষ মেদিপাতার বেড়া নহ, যে মালীর ইচ্ছামত তোমাদিগকে নিয়ত কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়াই রাখিবে; যেই নূতন ডাল গজাইয়া মাথাটা বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, অমনি মালীর সুতীক্ষ্ণ কাঁচিখানা কচাং করিয়া সেই ডালটিই ছাটিয়া ছোট করিয়া দিবে। না—না—তোমরা মানুষ, বাবুর বাগানের মেদীপাতার বেড়া নহ, কাষ্ঠ লোষ্ট্র নহ। আজ ভাঙ্গ তবে ওই জাতিভেদের পাষাণ স্তূপ—যাহা জগদ্দল পাথরের ন্যায় এই বিশাল জাতির বুকে বসিয়া তাহার শ্বাসরোধ এবং কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছে—চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেল ওই পাষাণ প্রাচীর, যাহা মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নানারূপ ভেদ ও বিদ্বেষবুদ্ধির ব্যবধান রচনা করিয়াছে—এবং ভাই ভাইকে চিনিতে দিতেছে না।

বাঙলার নিগৃহীত, এবং নিপীড়িত কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে আজ সঙ্গীত উঠুক—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়!
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমারি হাতে,
জীর্ণ আবেশ, কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক্ ক্ষয় তোমারি হউক জয়।"

আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। অভিভাষণ সুদীর্ঘ হইয়া গেল, আপনাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু মনে হইতেছে, কিছুই

আমার বলা হইল না। দুঃখ এত গভীর—বেদনা এত ব্যাপক এবং ব্যাধির মূল এত সুদূর-প্রবিষ্ট, যে

"লক্ষ রসনায়,
বলা যদি যায়,
তবু নাহি হয় শেষ কথায়"।

আমার শরীর ভগ্ন এবং জীর্ণ শীর্ণ—ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট ইহাই হয়ত আমার শেষ অভিভাষণ। যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতের আকাশে বাতাসে যে ব্রহ্মবাণী উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে—সত্যের কষ্টিপাথরে তাহাকে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়া জীবনে অনুশীলন করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমার শেষ অনুরোধ।

আর ব্রাহ্মসমাজ! তোমাকে বলি—হতাশ হইয়ো না, হাল ছাড়িয়া দিও না। তোমার আপনার লোকেরা আদর্শচ্যুত হইয়া অব্রাহ্মের জীবনযাপন করিতেছে দেখিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিও না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিমালয় যাত্রীর ন্যায় কত লোক পথ হইতে ফিরিয়া আসিবে—কত লোক পথে নামিতেই চাহিবে না—It is not Quantity but Quality that is the determining factor in every great issue.

তোমরা সংখ্যায় অল্প? জগতে যত আদর্শবাদী আসিয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় ত মুষ্টিমেয়ই ছিলেন। মহম্মদের চার ইয়ার, ঈশার দ্বাদশ শিষ্য, বুদ্ধের শ্রমণগণ, চৈতন্যের রূপ সনাতন—ইঁহারা ত সংখ্যায় সকলেই মুষ্টিমেয় ছিলেন—তথাপি ইঁহাদের প্রত্যেকেই সমগ্র দেশটাকে ভূমিকম্পের মত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের বাণী যদি যুগোপযোগী হয়, এবং ইহা যদি মানবজাতির মুক্তির বাণী হয়, তবে আজ হউক কাল হউক, ইহা মানুষের প্রাণে বিপ্লব উপস্থিত করিবেই—হিন্দুতে মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং জাতিতে জাতিতে, যদুবংশ ধ্বংসের ন্যায় যেরূপ আত্মঘাতী মহামৃত্যুর বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে, এবং দিকে দিকে এই বিদ্বেষবহ্নির ধূমায়মান শিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করতঃ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এবং ভারতের পশ্চিম ঘাটে আরব সমুদ্রের তীরে যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, ব্রাহ্মসমাজের চিরন্তন আদর্শ,—

"এক জাতি, এক ভগবান
এক দেশ, এক প্রাণ"

এই আদর্শ গ্রহণ না করিলে ভারতের মুক্তি শত শত বৎসরেও সম্ভব হইবে না। তাই বলিতেছিলাম—তোমরা শুধু বেয়ে যাও, আর গেয়ে যাও।

শত বর্ষাধিক পূর্ব্বে রামমোহন যে প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা নিভিতে দিও না—পথভ্রষ্ট দিশাহারা সন্তানের জন্য জননী যেমন প্রদীপটি জ্বালাইয়া সারা রাত ঘরের দুয়ারে বসিয়া থাকেন, কখন তাঁহার হারানো ছেলে ঘরে ফিরিবে, তেমনি তোমরা পথভ্রষ্ট, দিশাহারা, শ্রান্ত, ক্লান্ত ভাই-ভগিনীদিগের প্রত্যাগমন পথ চাহিয়া আলোটি জ্বালাইয়া বসিয়া থাক। উপলবহুল বন্ধুর পথে, অপথে বিপথে চলিতে চলিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে তাহারা একদিন না একদিন তোমার ওই ব্রহ্মবাণী মুখরিত মন্দির দ্বারে ফিরিয়া আসিবেই; তোমরা মন্দিরের আলোটি নিভাইয়া দিয়া তাহাদের ফিরিবার পথ বন্ধ করিয়া দিও না, মন্দিরের দুয়ারটি খুলিয়া রাখিয়া দিও।